পার্বত্য তথ্য কোষ

৪

১ গবেষণা পত্র
২ ইতিহাস
৩ রাজনীতি
৪ চুক্তি ও ভূমি সমস্যা
৫ শান্তি সূত্র
৬ প্রতিবেদন গুচ্ছ
৭ অনুসন্ধান
৮ নির্বাচিত রচনাবলী
৯ তথ্য উপাদান
১০ রচনা সমগ্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মরহুম আতিকুর রহমান লিখিত 'পার্বত্য তথ্যকোষ' ০১ সেট বই তাঁর ছেলে ফয়জুর রহমান ফয়েজ এর পক্ষ থেকে উপহার সরুপ।

প্রয়োজনে মোঃ ০১৬১২-২৮০৮০২

পার্বত্য তথ্য কোষ -৪

চুক্তি ও ভূমি সমস্যা

আতিকুর রহমান

নিবন্ধন পত্র

বই ঃ পার্বত্য তথ্য কোষ ১-১০

লেখক ঃ আতিকুর রহমান

প্রকাশক ঃ পর্বত প্রকাশনী
৪৮ সাধার পাড়া, উপশহর সিলেট

প্রকাশ কাল ঃ নভেম্বর ২০০৭ ইং

কম্পোজ ঃ বাবুল কম্পিউটার/ইমন কম্পিউটার ও সোলেমান খাঁ
২৬২/ক ২৬২ বাগিচা বাড়ী ফকিরাপুল ঢাকা-১০০০।

পেষ্টিং ঃ আবু তাহের ঐ

মুদ্রাকর ঃ বি.এস.প্রিন্টিং প্রেস ২ আর কে. মিশন রোড মতিঝিল
ঃ মোতালেব ম্যানসন ঢাকা-১২০৩।

প্রচ্ছদ ঃ শিল্পী আরিফুর রহমান ১৩১ ডিআইটি রোড ঢাকা।

পরিবেশক ঃ ১ রাঙ্গামাটি প্রকাশনী রিজার্ভ বাজার রাঙ্গামাটি
২. মল্লিক বই বিতান ঐ

সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঃ বাংলাদেশ রিসার্চ ফোরাম
৫/১৮, নূরজাহান রোড
মোহাম্মদপুর ঢাকা।

মূল্য ঃ খণ্ড-১, ৩ ও ৯ টাকা ১৩০/- খণ্ড-১০ টাকা ৫০০/-
অন্যান্য খণ্ড - টাকা ১০০/-

যোগাযোগে ঃ আতিকুর রহমান মোবাইল ঃ ০১১৯৬১২৭২৪৮

পাবর্ত্য তথ্য কোষ

খণ্ড-৪ ঃ পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি সমস্যা ও চুক্তি

বিষয়সূচী ঃ

সঙ্গীদেরসহ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ও হাসানাত আব্দুল্লাহ

ভূমিকা

কোন চুক্তি ও সুযোগ সুবিধাতেও উপজাতীয়রা সন্তুষ্ট নয়। তারা এ পর্যন্ত ৪ বার সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছে। শিশু বাংলাদেশকেও তারা রেহাই দেয় নি। তাদের এই অব্যাহত অবাধ্যতাকে আর অবহেলা করা যায় না। এরা বিহারীদের মত অবাধ্য দ্বিতীয় শরণার্থী বংশধর। গণহত্যা ও বিদ্রোহের কারণে এদের বৈরী ঘোষণা, নাগরিকত্ব বাতিল, বিচারে সোপর্দ ও ক্যাম্পে আটক করা আবশ্যক। একমাত্র তাতেই তারা নিজেদের অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হবে।

পার্বত্য চুক্তি ও তৎসৃষ্ট সুযোগ সুবিধা এই উপজাতীয় অপরাধীদের বাগে আনতে সক্ষম হয়নি। এখন আরো অধিক অপেক্ষা করা বৃথা।

সরকারের নমনীয় তোষামোদ মূলক পার্বত্য নীতির ভুল ও ব্যর্থতাকে অবশ্যই বুঝতে হবে। এই ভুরের মূল কথা হলো বিদ্রোহী উপজাতীয়রা আসলে স্থানীয় আদি বাসিন্দা নয়, তারা বহিরাঞ্চলীয় শরণার্থী বংশধর। হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েল ১৯০০/১ এর ৫২ ধারাতে তাদের অভিবাসন চিহ্নিত। ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ তাদেরকে ভোটাধিকার দান করেনি। সেহেতু ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ এর ভারত ব্যাপ্ত সাধারণ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের ভোটাধিকার ছিল না। এই বিদ্রোহী উপজাতিদের স্থানীয় আদি নাগরিক হওয়ার দাবী ভুল। দুনিয়াবাসীদের এই তথ্য জানতে দেয়া হচ্ছে না, এবং আমরা নিজেরাও তৎ সম্পর্কে অজ্ঞ। একমাত্র অস্থানীয় হওয়ার তথ্যই বিদ্রোহীদের দমিয়ে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

সরকার স্থানীয় ইতিহাস উদ্ধার ও প্রচারে মোটেও সক্রিয় নন। এই শূন্যতা পূরণে ব্যক্তি পর্যায়ে এই অধম কিছু ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছি। আমার লেখা প্রবন্ধ কলাম প্রতিবেদন বই পুস্তক সীমিত আকারে হলেও গত অর্ধ শতাব্দী কাল যাবৎ এই ধারণা দিয়ে যাচ্ছে যে, উপজাতীয় উচ্চাভিলাষীদের প্রচারিত রাজনৈতিক ভ্রান ধারণা ও প্রচলিত তথ্য উপাত্ত বিভ্রান্তিকর। স্থানীয় প্রকৃত তথ্য তা থেকে ভিন্ন, যা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী স্বার্থের অনুকুল।

আমি স্থানীয় ইতিহাস ও তথ্য প্রচারে কোন রূপ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পাইনি। অথচ এই ইতিহাসের প্রকৃত উপকার ভোগী আমি ব্যক্তি নই, বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি। আমার জীবনের সমুদয় সঞ্চয় ও উপার্জন এবং কর্মক্ষম সারাটি জীবন একাজে ব্যয় করেছি। এই শ্রমের আর্থিক মূল্য অবশ্যই বিরাট। আমার এই ত্যাগ ও দেশ প্রেম কর্তৃপক্ষীয় পর্যায়ে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। আমি নিজেও তাতে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর এক অপগন্ডে পরিণত। বিপরীতে বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ মোটা অংকের বেতন ভাতা দামী গাড়ী বাড়ী আর উঁচু পদমর্যাদা ভোগ করছেন। শান্তি তবু সদূর পরাহত।

আতিকুর রহমান
ডিএসবি কলোনী, রাঙ্গামাটি
লেখক, গবেষক ও কলামিষ্ট।

খণ্ড-৪ ঃ পার্বত্য চুক্তি ও ভূমি সমস্যা

(ক) পর্বতাঞ্চলের ভূমি সমস্যা।

(তাং-রোববার ৯ আশ্বিন ১৪০৭ বাংলা ২৪ সেপ্টেম্বর খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

বস্তুত ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা একটি বিরাট বিষয়। যার কিছুটা মানব সৃষ্ট, আর অধিকাংশ আইনী জটিলতার ফল। লোভী ও দুষ্ট লোকেরা সব সমাজেই থাকে এবং সংখ্যায় ও তারা কম নয়। তবে নির্লোভ সাধু লোকের সংখ্যাও শূণ্য বলা যায় না। বলতে গেলে মানবতা ও সভ্যতা সাধুদের কারণেই টিকে আছে। কোন সমাজকে নির্বিচারে দোষারোপ করা অন্যায়। অনেক সময় মূল্যায়ন ভুল হয়। তাতে মিত্র হয় শত্রু আর শত্রু হয় মিত্র। পার্বত্য অঞ্চলে পক্ষ বিপক্ষ নির্ণয়ে অনেকেই এই ভুলের শিকার।

ব্যহ্যত ঃ এখানে উপজাতীয় রাজনীতিকদের দ্বারা বাঙ্গালীরা ঢালাও ভাবে অভিযুক্ত। এ যেন সব দোষ নন্দ ঘোষ ধরণের কান্ড। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি আর আইনী জটিলতার কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হলে, এই বলির পাঠাদের কিছু হলেও রেহাই মিলতো। যা ঘটেছে আইনের বলে সরকারই তা ঘটিয়েছে। নেংটি বাঙ্গালীরা এখানে কিছুতেই ঘটক নয়। বাঙ্গালীরা পার্বত্য অঞ্চলের বিরাট এলাকা দখল করে আছে, এবং পাহাড়ীরা নিজ ভুমে ভূমিহীনে পরিণত, এটা যেমন কিছুটা সত্য, তেমনি সত্য হলোঃ পাহাড়ীদের পরিবেশ পরিস্থিতি অনুধাবনের অভাব, এবং মানিয়ে চলতে পারার অক্ষমতা। কেবল দাবী দাওয়া ক্ষোভ ও অস্থিরতা সমস্যার সমাধান করে না। ভিন্নভাবে বাঁচার ও টিকে থাকার পথ অবলম্বন করতে হয়। এটা বিবেচ্য যে, নব প্রজন্মদের আমরা পাশাপাশি সংস্থান করে দিচ্ছি। দিনে দিনে বর্ধিত হচ্ছে জনসংখ্যা। প্রতিনিয়ত ভাগ বাটোয়ারা হচ্ছে জায়গা জমি বাড়িঘর, আলো-বাতাস, বিদ্যুৎ-পানি, খাদ্য বস্ত্র ইত্যাদি। আমরা সহনশীল মনোভাবে এসব মেনে নিচ্ছি। তবে আগ্রাসন ও নিপীড়ণ এ থেকে ভিন্ন। যার প্রতি ক্ষুব্ধ ও মারমুখী হওয়া স্বাভাবিক। ঘটনা মাত্রকেই আগ্রাসন ও নিপীড়ণের পর্যায়ে ফেলা যায় না। পার্বত্য অঞ্চলের আনাচে-কানাচে বাঙ্গালীদের বসতি স্থাপন, উপজাতিদের ক্ষুব্ধ আর উত্যক্ত করলেও, এটা পরিস্থিতির অনিবার্য পরিণতি। এটা জাতিগত আগ্রাসন নয়।

পরিস্থিতি বাঙ্গালীদের অত্রাঞ্চলে টেনে এনেছে। এখন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাময় প্রাথমিক অবস্থা নেই। উভয় সমাজেরই ভাবা উচিতঃ উত্তাপ উত্তেজনা হিংসা ও বিদ্বেষের একাধিক দশক পেরিয়ে এখন উভয়কে প্রতিবেশী হয়ে থাকতে হচ্ছে। কারোরই উৎখাত উচ্ছেদ সম্ভব নয়। সুতরাং অযথাই হিংসা ও বিদ্বেষ। এখন পারস্পরিক মৈত্রী হোক সামনে চলার কৌশল।

উপজাতিরা ভূমিহীন উৎখাত ও ছন্নছাড়া হোক, এটা বাঙ্গালীদের কাম্য নয়। জাতিগত বিদ্বেষে ভূমি কাড়াকাড়ি শুরু হওয়াটা বাঞ্ছিত নয়। এখনো পর্বতাঞ্চলে ভূমির আকাল পড়েনি। সরকারীভাবে ভূমিহীনদের ভূমি দান সম্ভব। হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলই উপজাতীয়দের ভূমি স্বত্ব দেয়নি। সার্কেল আর মৌজা প্রধানদের দায়িত্বে নিযুক্ত তিন সার্কেল চীফ ও তিন শত তেহাত্তর জন হেডম্যান, সরকারের রাজস্ব এজেন্ট মাত্র, জমির মালিক জমিদার নন। তবে পাহাড়ী জনসাধারণের পক্ষে তাদের অধীন ভূমি মালিকানাহীন প্রজা হয়ে থাকা দুর্ভাগ্যজনক। এখানে বন্দোবস্তি মানে কেবল ভোগ দখলের অধিকার লাভ, জমির মালিক হওয়া নয় পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইন ধারা নং ৩৪ অনুযায়ী বন্দোবস্তি খরিদ বিক্রি দান হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি ও অনুমোদন সাপেক্ষ। এর মানে, জনসাধারণ তার অধীন বাধ্য ভোগ দখলকার প্রজা মাত্র। তৎকর্তৃক পরিচালিত বন্দোবস্তি ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া এতো দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ যে, ক্রেতা-বিক্রেতা, উত্তরাধিকারী, আর বন্দোবস্তি প্রার্থীদের বৃহদাংশ তাদের জীবন কালে বন্দোবস্তি ও নাম জারি দেখে যেতে পারেন না। এই দীর্ঘ সুত্রিতায় অনেকেই থেকে যান অবৈধ খরিদ্দার অনির্ধারিত উত্তরাধিকারী ও বেআইনী দখলদার। এই সুযোগে দুষ্ট অসাধু ব্যক্তিরা, এবং অনেক লোভী প্রভাবশালী মহল, অনিবন্ধনকৃত খরিদ বিক্রি অস্বীকার করেন, এবং গরীব নিরীহ লোকদের আবাদকৃত ও বন্দোবস্তি প্রার্থিত জায়গা জমি জবর দখল, অথবা টাকা ও প্রভাব জোরে, ঐ জমি নিজ নামে বন্দোবস্তি করে নেন। এ ঘটনাগুলো কেবল আন্ত সাম্প্রদায়িকই নয়, প্রতি সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেও বিদ্যমান। তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসকদের অধীন দেওয়ানী আদালতে এরূপ মামলা মোকদ্দমা স্তুপিকৃত হয়ে আছে। জেলা প্রশাসনের বন্দোবস্তি শাখা, হাজারো অমীমাংসিত বন্দোবস্তি মামলায় ভারাক্রান্ত। সারা দেশে মুহূর্তে খরিদ, বিক্রি, দলিল রেজিষ্ট্রেশন নাম জারি ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু এতদাঞ্চল এক আজব দেশ, যেখানে, জেলা প্রশাসকদের হাতে সব ভূমি আটক। তদুপরি এখানে ভূমি বন্দোবস্তি ও হস্তান্তর বহুদিন যাবৎ বন্ধ। এর উপর ফেখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের পুর্বানুমোদন আইন। যদ্দরুণ বেআইনী দখলদারী ছাড়া উপায় নেই। হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের ধারা নং ১৮(২)/ঘ ও ৩৪ এর পাশাপাশি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ধারা নং ৬৪ নতুন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এই আইন বলে সব খরিদ বিক্রি, হস্তান্তর নাম জারি ও বন্দোবস্তি. জেলা পরিষদের পুর্বানুমোদন সাপেক্ষ। এতে গোটা ভূমি প্রশাসনই পক্ষাঘাতগ্রস্ত। এতে ঘোষ দুর্নীতির ব্যাপক

বিস্তার ঘটেছে।

এই আইনের মূল লক্ষ্য ঃ অস্থানীয় তথা বাঙ্গালীদের ভূমি মালিকানা ঠেকানো, কিন্তু তাতে পাহাড়ীরাও ঠেকে যাচ্ছে। পাহাড়ী খরিদ্দার নেই, বাঙ্গালী খরিদ্দার ও বাধাগ্রস্ত। ফলে জমির মূল্যমান নিম্নমুখী। বৈধ খরিদ বিক্রি ও হস্তান্তর বাধাগ্রস্ত হওয়ায় প্রয়োজনে অবৈধ পন্থা অবলম্বিত হচ্ছে। আর সেটি হলো আনরেজিষ্টার্ড খরিদ বিক্রি ও হস্তান্তর। তাতে বিরোধ আর হাঙ্গামাও বাড়ছে। পার্বত্য অঞ্চলের অধিকাংশ ভূমি বিরোধ এই জটিলতার ফল। এ থেকে উদ্ধার লাভের উপায় হলো তাৎক্ষণিক দলিল রেজিষ্ট্রেশন ও সংশ্লিষ্ট আইনী প্রতিবন্ধকতার অবসান। তজ্জন্য প্রয়োজন হলো ঐ প্রতিবন্ধক আইনসমূহ বাতিল বা সংশোধন করা। প্রস্তাবিত ভূমি কমিশন অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী নন। কেবল লোকজনকে অপরাধী করে তাদের উচ্ছেদ বা শাস্তি দান করা সঠিক কাজ নয়। পুনরায় অনুরূপ অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

২।

(তাং-মঙ্গলবার ১১ আশ্বিন ১৪০৭ বাংলা ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

খরিদ বিক্রি হস্তান্তর ও বন্দোবস্তির জটিলতাই পার্বত্য ভূমি সমস্যার মূল কারণ হওয়ায়, তজ্জন্য লোকজনকে অপরাধী করে, ভূমি কমিশনের রায় দান নতুন জটিলতার সৃষ্টি করবে, এবং তাতে নতুন করে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধবে। এমন কি তজ্জন্য ভূমি কমিশন নিজেও নিরাপদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন কিনা সন্দেহ। যদি ভূমি কমিশন বিতর্কিত জায়গা জমির মালিকানা প্রশ্নে বন্দোবস্তি, হস্তান্তর ও খরিদ বিক্রির বৈধ দলিল পত্রকেই বিরোধ মীমাংসার একমাত্র সুত্র রূপে বিবেচনা করেন, তাহলে পাহাড়ী বাঙ্গালী অনেকের পক্ষেই তা দেখান সম্ভব হবে না। কেউ কেউ বিনা বন্দোবস্তিতে পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করছে, এমন জমি সরকারী রেকর্ডে খাস থাকার ভিত্তিতে অন্যকে বন্দোবস্তি দেয়াও হয়েছে। কেউ খরিদ সুত্রে মালিক হয়েছে, কিন্তু দাপ্তরিক দীর্ঘ সুত্রিতা ও আইনী প্রতিবন্ধকতার কারণে কবলা নিবন্ধন ও নাম জারি হয়নি। অথবা দুষ্ট, লোভী ও বেয়াড়া উত্তরাধিকারীরা, পূর্বের আনরেজিষ্টার্ড খরিদ বিক্রি ও হস্তান্তর মেনে নিতে অনীহ। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে কেবল বৈধ দলিল পত্রই ন্যায় বিচারের পক্ষে বিবেচ্য, এ ভাবা সঠিক হবে না।

প্রচলিত আইন রীতি ও পদ্ধতিকে কমিশনের মীমাংসা সুত্র রূপে গণ্য করা হয়েছে। অথচ প্রচলিত আইন হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল আর নতুনভাবে জারিকৃত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ভূমি সমস্যাকে জটিলতর করেছে। সুতরাং সমস্যা সমাধানে এই আইনগুলোকে অনুসরণ করা হলে জটিলতা আরো বাড়বে। রীতি পদ্ধতিগুলি ও ন্যায় বিচারের চাবিকাঠি হতে পারে না।

পার্বত্য অঞ্চলের মৌজা প্রধান ও সার্কেল চীফেরা, জেলা প্রশাসকদের রাজস্ব সহযোগী। জমি হস্তান্তর ও বন্দোবস্তি দরখাস্তে তাদের রিপোর্ট ও সুপারিশ চেয়ে জেলা প্রশাসকেরা তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, এটা একটি রীতি। এই অলিখিত রীতি বাধ্যতামূলক কিছু নয়। অনেক বন্দোবস্তি ও হস্তান্তর মামলা, হেডম্যান ও চীফের অবর্তমানে বা তাদের স্বার্থ ও বৈরীতা হেতু, তাদের রিপোর্ট ও সুপারিশ ছাড়াই, জেলা প্রশাসকেরা আমিন কানুনগোর রিপোর্টের ভিত্তিতে মীমাংসা করে থাকেন। হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের ধারা নং ১৮(২)/ঘ ও ৩৪ জেলা প্রশাসককে ভূমি নিয়ন্ত্রণের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দান করেছে। ধারা নং ৩৭,৩৮, ৩৯ ও ৪০ তাকে হেডম্যান ও চীফদের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। একমাত্র ধারা নং ৫০ পাহাড়ী লোকজনদের শহর বহির্ভূত এলাকায়, ঘর-বাড়ি সংস্থানের জন্য সর্বাধিক ৩০ শতাংশ জায়গা জমি বিনা বন্দোবস্তিতে বোগ দখলের অধিকার দিয়েছে। জুম চাষের জন্য সাময়িক কোন পাহাড় দখল করা ও তাতে অস্থায়ীভাবে বসবাস করাটাও পাহাড়ীদের একটি রীতি। আইনে জুমচাষ নিষিদ্ধ হলেও জুম খাজনা গ্রহণের মাধ্যমে সরকার তৎপ্রতি নীরবে সম্মত। তবে এগুলো অপরিহার্য বৈধ অধিকার নয়। জুমের প্রথাগত চর্চা ও আইনী বাধার অনুপস্থিতিতে, পাহাড় ও বনের উপর পাহাড়ীদের অবাধ অধিকার বার্তায় না। খাস জুম ভূমির মালিক রাষ্ট্র। এটি পাহাড়ীদের ব্যক্তিগত বা সামাজিক মালিকানাভুক্ত কোন সম্পত্তি নয়। বন্দোবস্তির বাহিরে কোন রূপ ভূমি মালিকানা, কোন কালেই পাক-ভারত-বাংলাদেশে প্রচলিত ছিলো না। ধারা নং ৩৪ ও ৫০ ই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, গৃহস্থালী প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমিজমার প্রয়োজন হলে, তা অবশ্যই বন্দোবস্তি করে নিতে হবে, এবং তা পাহাড়ী বাঙ্গালী সবার পক্ষে জরুরী।

মানুষের জীবন ও প্রয়োজন বাধা ও প্রতিবন্ধকতার কাছে আটক থাকে না। তাই আইনী ও দাপ্তরিক প্রতিবন্ধকতার বিপরীতে অনুষ্ঠিত প্রতিটি কাজকে ঐচ্ছিক অবাধ্যতা না ভাবাই সঙ্গত। মানুষ বৈধভাবেই নিজের প্রয়োজন মিটাতে চায়। দাপ্তরিক দীর্ঘসূত্রিতা ও আইনী প্রতিবন্ধকতা সে পথে বাধা হয়ে থাকে বলে সে তা অমান্য করে।

একজন মুমুর্ষ রোগীর জরুরী চিকিৎসা, একজন উচ্চ শিক্ষার্থী বা কর্মসংস্থান প্রার্থীর বিদেশে যাত্রা এবং একজন কন্যাদায়গ্রস্তের বয়স্কা কন্যা বিবাহ দান ইত্যাদি জরুরী কাজে গরীব জনসাধারণের তাৎক্ষণিক টাকার প্রয়োজন পড়ে। তাতে নিরূপায় অবস্থায় জায়গা জমি বিক্রয়ে বাধ্য হতে হয়। এই অবস্থায় পার্বত্য জেলা প্রশাসক ও জেলা পরিষদের তাৎক্ষণিক অনুমতি লাভ সম্ভব নয়। এটি অতি জটিল দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এটাই অত্রাঞ্চলে পালনীয় আইন। এমতাবস্থায় এই সময় সাপেক্ষ জমি খরিদ বিক্রি ও হস্তান্তরের বৈধ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে গেলে, চিকিৎসার অভাবে রোগী মারা যাবে, বিদেশগামী ছাত্রছাত্রী ও কর্মপ্রার্থীদের সময়মত যাত্রারম্ভ সম্ভব হবে না, কন্যা দায়গ্রস্তের বিবাহ দানও আটকে যাবে। সুতরাং মানুষ

বাধ্য হয়ে অবৈধ পন্থায় প্রয়োজন মিটায়। একটি সাদা কাগজে বায়না নামা লেখা, টাকার লেনদেন ও তার বিনিময়ে জমিজমা হস্তান্তরিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জেলা পরিষদও জেলা প্রশাসনের অনুমতি চেয়ে প্রয়োজনীয় আবেদন ও পেশ করা হয়ে থাকে, যার সুরাহা হতে একাধিক পুরুষ লাগে। প্রার্থীর জীবনকালে জমি খরিদ বিক্রি বন্দোবস্তি ও হস্তান্তরের বৈধ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া অতি বিরল ঘটনা। এমতাবস্থায় অবৈধ প্রক্রিয়া অবলম্বন ছাড়া উপায় কী? এই অবৈধতাকে অপরাধ সাব্যস্ত করে ভূমি কমিশন আদেশ জারি করলে তাও অমান্যই হবে এবং তাতে আহত ক্ষতিগ্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ নিজেদের অধিকার রক্ষায় মরিয়া হয়ে উঠবে। এটি সৃষ্টি করবে ব্যাপক ক্ষোভ অসন্তোষ ও দাঙ্গার। তখন নিজের অধিকার রক্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত একজন পাহাড়ী বা বাঙ্গালী প্রতিপক্ষকে স্বজাতি বা বিজাতিরূপে গণ্য করবে না।

পার্বত্য চুক্তির ভাষায় ও জনসংহতি সমিতির দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, বিষয়টি পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের মাঝে সাম্প্রদায়িক। কিন্তু বর্ণিত ভূমি সমস্যা শত শতাংশে অসাম্প্রদায়িক। ভূমি খোর লোক পাহাড়ী বাঙ্গালী উভয় সমাজে আছে। যাদেরকে বেআইনী সেটেলার বলা হয়, তারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত ভূমিখোর নয়। তারা সরকার কর্তৃক আনিত ও আবাসিত। তাদের আবাসনে মৌজা প্রধান হেডম্যান ও সার্কেল চীফদের অনুমোদন ও সুপারিশ না থাকা, আচরিত রীতি বিরুদ্ধ হলেও, তা সরকারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন। এই কাজটি হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের ধারা ১৮ (২)/ঘ ও ৩৪ বলেই বৈধতা সম্পন্ন। ধারা ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ হেডম্যান ও চীফদের জেলার নির্বাহী প্রধান জেলা প্রশাসকদের বাধ্য অনুগত করেছে। তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কাছে জেলা প্রশাসকদের বাধ্য করেনি।

৩

(তাং-রোববার ১৬ আশ্বিন ১৪০৭ বাংলা ১ অক্টোবর ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

সরকার বাঙ্গালী সেটেলারদের আনয়ন ও ভূমি দান করেছেন। প্রচলিত রীতি হলো ঃ ভূমিদানের প্রক্রিয়ায় জেলা প্রশাসক কর্তৃক হেডম্যান ও চীফদের রিপোর্ট তলব ও বিবেচনা করা হয়। এর কারণ হলো ঃ তারা স্থানীয় রাজস্ব এজেন্টরূপে, প্রার্থীত জমি খাস, দখলমুক্ত ও বন্দোববস্তিযোগ্য কিনা সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। এটা এ কারণেও জরুরী যে, জায়গাটি কারো বন্দোবস্তির প্রক্রিয়াধীন থাকতে পারে। জায়গাটি সামাজিক ও রাষ্ট্রের পক্ষে মূল্যবান বন ও খনিজ সম্পদ বা নদীনালা সড়ক গোরস্থান শ্মশান, খেলার মাঠ, প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপনা বা সামাজিক ব্যবহার উপযোগিতা সম্পন্ন কিছু হতে পারে, অথবা এটি কারো দীর্ঘ ভোগ দখলাধীন জমি। বাঙ্গালী সেটেলারদের পুনর্বাসনের সময় উপজাতিভুক্ত এই সব হেডম্যান ও চীফদের সুপালিশ ও রিপোর্ট এ কারণে নেয়া হয়নি যে, তারা তাতে বাধ সাধতে পারেন, এবং জনসংহতি সমিতির বিরোধিতাকে অনুসরণ করে, গোটা পরিকল্পনাটিকেই

বানচাল বা জটিলতায় আবদ্ধ করে দিতে পারেন। কার্যতঃ হেডম্যান ও চীফদের অনুমোদন ও রিপোর্ট লাভ আইনতঃ বাধ্যতামূলক ও নয়। তাদের রিপোর্ট ও অনুমোদনের সাথে দীর্ঘসুত্রিতা আর অনিশ্চয়তা ও জড়িত। সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা বলে সহজে ও ত্বরিতগতিতে কাজটি সম্পন্ন করার প্রয়োজন ছিল। তবু কাজটিতে প্রক্রিয়াগত কিছু ভুল ত্রুটি থেকেও গেছে। যদ্দরুণ সেটেলারদের সবাইকে বন্দোবস্তি দলিল পত্র দেয়া এখনো অনেক ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়নি। কিছু কিছু জায়গা জমিতে অংশতঃ পাহাড়ী দখলদার ছিলো। যাদের বন্দোবস্তি দলিলপত্র না থাকলেও আবাদী অধিকার স্বীকার্য। এটা এ কারণেও ঘটেছে যে, বিদ্রোহ উপদ্রুত ঐ সব জায়গায় আমিন কানুনগোদের সশরীরে উপস্থিতি ছিলো বিপজ্জনক। তাই তারা খাস রেকর্ডের ভিত্তিতেই জমি বরাদ্দ দিতে বাধ্য হয়েছেন। অধিকাংশ হেডম্যান কারবারী নিজেরাও নিরাপত্তার অভাবে সরেজমিনে অপস্থিত ছিলেন না বা নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং এগুলো জাতিগত বিদ্বেষ বা ইচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটি নয়। এই ভুল ত্রুটি হলো বিদ্রোহজনিত বিপন্ন পরিস্থিতির ফসল। এগুলোকে উদারদৃষ্টিতে বৈধতা প্রদানই সঙ্গত। তবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভূমিহীন পাহাড়ী লোকদের ভূমিদান ও পুনর্বাসন করে ক্ষতিপূরণ করা আবশ্যক। এ জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের খাস জমি বরাদ্দ করাই সমাধান।

অনিয়ম আর ত্রুটির জন্য শাস্তি বিধান করতে গেলে প্রধান ও প্রথম আসামী হোন সরকার। ভবিষ্যতে এরূপ ত্রুটি এড়াতে হলে আইন ও দাপ্তরিক জটিলতাকেও আগে সারাতে হবে। এখানেও সারা দেশের মত অভিন্ন ভূমি প্রশাসন আইন ও নীতি প্রচলন আবশ্যক, যাতে ভূমি রেজিষ্ট্রেশন ও মিউটেশনে দীর্ঘ সময় ক্ষেপণের অবসান হয়। জনসাধারণকে ভূমির স্বত্ব দিতে হবে। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা প্রশাসকের অনুমোদন সাপেক্ষ খরিদ বিক্রি ও মিউটেনশন আইন, প্রলম্বিত উপনিবেশবাদী ও সামন্তবাদী ব্যবস্থা। এটি মানুষের সহজ ভূমি অধিকারের পরিপন্থী ও পরাধীনতার বাহন। পার্বত্য অঞ্চল এখন পরাধীন উপনিবেশ নয়। এই আইনের দ্বারা বাঙ্গালী আগমন, বসবাস ও ভূমি মালিকানা লাভ আগেও ঠেকান যায়নি, এখনো ঠেকান যাবে না, বরং তদ্বারা বাঙ্গালী ও উপজাতীয় জনসাধারণ, অদৃশ্য বাধা নিষেধ ও প্রতিবন্ধকতায় আবদ্ধ হয়ে, কূপ মন্ডুকে পরিণত হয়েছে এবং হচ্ছে। আগে উপজাতীয় হেডম্যান ও চীফদের নিকট থেকে সুযোগ সন্ধানী বহিরাগতরা, অত্রাঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠার সনদপত্র চড়া দামে কিনে নিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখন ঐ তালিকায় জেলা চেয়ারম্যান পদবিধারীদের সংযোগ ঘটেছে। তাদেরও পক্ষ করে নিয়ে সুযোগ সন্ধানী বহিরাগতরা ঠিকই জায়গামত বসে যেতে পারছে এবং পারবে। স্থানীয় হওয়ার সদনপত্র হলো একটি মূল্যবান পণ্য। এটি হাত করা সুযোগ সন্ধানীদের পক্ষে কঠিন নয়। মাওলানা শাজাহান বরিশালবাসী। বিবাহসুত্রে স্থানীয় টাটগেঁয়ে জামাই। রাজনীতির মারপ্যাচে এখন পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সদস্য। এই তিনি হলেন এর উজ্জ্বল উদারণ। উপজাতীয়

জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা বাবু জ্যোতিরিন্দ্র রোধিপ্রিয় লারমা, বা অন্য কোন নেতা কি এই নিযুক্তি ঠেকাতে পেয়েছেন? শীর্ষ পদ, ক্ষমতা, নিযুক্তি ও ভুম্যাধিকারের উপজাতীয়করণ এভাবেই ধীরে ধীরে উবে যাবে, এ ধারণা অবশ্যই করা যায়। এই ধারাবাহিকতায় কোন বিদ্রোহী নেতাই, পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রী পদ, তিন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদ, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন টাক্স ফোর্স আর পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদটিও পাননি। ভবিষ্যতে পাবেন সে আশা কি করা যায়? তাদের একমাত্র সান্ত্বনা হলো ক্ষমতাহীন আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদটি সন্তু বাবুর ভাগে পড়েছে এবং পরিষদে তাঁর দলের কয়েক জন মাত্র সদস্য অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন। ভবিষ্যতে নির্বাচন হলে এই শীর্ষ পদগুলোতে আর তিন সংসদ সদস্য পদে বরিত হওয়া তাদের পক্ষে কী নিশ্চিত? জাতীয় নির্বাচনে গনেশ পাল্টে, বিরোধী দলীয়রা ক্ষমতাসীন। ভবিষ্যতে পার্বত্য চুক্তি, প্রচলিত ঔপনিবেশিক আইন, উপজাতীয় সামন্তবাদ, আর সদ্য প্রণীত পার্বত্য আইন সমুহকি যেমন আছে তেমন থাকবে? একটু ভিন্ন চিন্তা করে দেখা আবশ্যক। পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলাই বুদ্ধিমত্তার কাজ। পার্বত্য অঞ্চলকে বাঙ্গালীমুক্ত রাখা সম্ভব নয়। হতে পারে, ভূমি কমিশনই বাঙ্গালী ভূমি স্বত্বের প্রতি চূড়ান্ত অনুমোদনের সীলমোহর এঁটে দিবে। এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া কী সম্ভব?

৪

(তাং সোমবার ৭ আশ্বিন ১৪০৭ বাংলা ২ অক্টোবর ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

এখন ভেবে দেখা দরকার ঃ পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি কতটুকু সরকার নিয়ন্ত্রিত আর কতটুকু জেলা পরিযদ ও আঞ্চলিক পরিষদের আওতাধীন। এখানে শুভঙ্করের ফাঁকি নিহিত আছে। কথায় কথায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বলা হলেও, গোটা পর্বতাঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ পরিযদীয় প্রশাসনের হাতে অর্পিত হয়নি। খোদ জনসংহতি সমিতি তাদের দাবী থেকে নিম্নোক্ত এলাকাগুলো বাদ দিয়ে রেখেছেন, এবং চুক্তিও হয়েছে সরকারী অঞ্চলকে বাদ দিয়ে যথা ঃ দাবী নং ২ (৫/ক) ও ২ (৫/খ)

দাবী বহির্ভুত সরকারী অঞ্চল ঃ ক) কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা। এটা কেবল বাঁধ ও তার সংলগ্ন এলাকাভুক্ত স্থাপনা সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় এলাকা নয়, এর সাথে কেবল স্থাপনা অঞ্চল হওয়া বিতর্ক সাপেক্ষ। এই দাবীর শেষাংশে বর্ণিতঃ রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণ কৃত জমি হিসাবে হ্রদ এলাকা দাবী থেকে মুক্ত। এই দাবীমুক্ত হ্রদ এলাকার আয়তন হলো ২৫৬ বর্গমাইল) (খ) বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা ও (গ) রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা (বেতবুনিয়া, কাপ্তাই, শীলছড়ি, চন্দ্রঘোনা শিল্পাঞ্চলের আনুমানিক আয়তন প্রায় ১০ বর্গমাইল)। (ঘ) রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমি। (এর ভিতর কর্ণফুলী হ্রদ, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, প্রশাসনিক সদর দপ্তর এবং অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বন আর পাহাড় শ্রেণীও অন্তর্ভুক্ত)।

খাস পাহাড় বন নদী নালাকে দাবীমুক্ত ভাবার অবকাশ এ কারণে আছে যে, ১৮৬৫ সালে এক্ট নং ৭ ধারা নং ২ বলে পার্বত্য অঞ্চলের প্রায় গোটাটাই বন ঘোষণা করে, কলকাতা গেজেটের ১ ফেব্রুয়ারী ১৮৭১ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। এই কার্যক্রমই অধিগ্রহণ। সে থেকে ৯১ বছর পর ১৯৫৬ সালে কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন উপলক্ষে বাস্তুচ্যুত লোকদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনে কিছু অঞ্চল আনুষ্ঠানিকভাবে বন মুক্ত করা হয়েছে। তবে জেলা প্রশাসকেরা আনুষ্ঠানিক অবমুক্তি আদেশ ছাড়াই কিছু কিছু জমি ও পাহাড়ের বন্দোবস্তি ও ইজারা মঞ্জুর করেছেন, যা তাদের নির্বাহী ক্ষমতার আওতায়ধীন বিষয়। বর্ণিত দাবী মুক্ত অঞ্চলের পরিমাণ হলো ঃ

ক) সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঃ

(১) রাঙ্গামাটি উত্তর বন বিভাগ	= ৬১৭ বর্গমাইল
(২) রাঙ্গামাটি দক্ষিণ বন বিভাগ	= ৩১৫ বর্গমাইল
(৩) সাঙ্গু বন বিভাগ	= ১২৮.২৫ বর্গমাইল
(৪) মাতামুহুরী বন বিভাগ	= ১৬০.৭১ বর্গমাইল
খ) অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল	= ৩১৬৬.০০ বর্গমাইল

উপরোক্ত হিসাবের ভিত্তিতে সরকার নিয়ন্ত্রিত ভূমির সর্বমোট পরিমাণ হয় ৪৬৫২.৯৬ বর্গমাইল।

যদি গোটা পার্বত্য অঞ্চলের আয়তন থেকে ৪৬৫২.৯৬ বর্গমাইলকে দাবীমুক্ত সারকারী অঞ্চল রূপে মেনে নেয়া যায়, তা হলে দাবীভুক্ত অঞ্চলের পরিমাণ থাকে মাত্র ৪৪০.০৪ বর্গমাইল এবং তাও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ মিলে একত্রে। তবে জনসংহতি সমিতি স্বীয় দাবীনামার ব্যাখ্যায় আমার এই হিসাবের সাথে সামান্য দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন ঃ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল হলো ৪৪৬,০৪ বর্গমাইল। সান্ত্বনা হলো তারা ৫০৯৩ বা ৫০৮৯ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট গোটা পর্বতাঞ্চলকে, তাদের দাবীভুক্ত করেননি। এখন পার্বত্য চুক্তি ও আইনের মাধ্যমে এই দাবী মুক্তির দলিলটিতে সীলমোহর পড়ে গেছে। এখন এ দাবী করা যথার্থ নয় যে, গোটা পার্বত্য অঞ্চলই আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের এখতিয়ারাধীন এলাকা। চুক্তি অনুযায়ী এখন ৪৬৫২.৯৬ বর্গমাইল বিশিষ্ট সরকার এখতিয়ারাধীন পার্বত্য অঞ্চলে, জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ অচল। এই অঞ্চলের প্রশাসন ও ভূমি নিয়ন্ত্রণ এককভাবে জেলা প্রশাসকদের এখতিয়ারাধীন সরকারী। চেয়ারম্যান ও পরিষদ নির্বাচনে কেবল জেলা পরিষদ এখতিয়ারাধীন এলাকার জনসাধারণই ক্ষমতাবান। সরকারী এরাকার জনসাধারণ পরিষদমুক্ত। এখন থেকে সরকারী এলাকায় অবস্থিত জায়গা জমি আবাসন ও জনপ্রতিনিধিত্ব উপজাতীয় আপত্তি থেকে সম্পুর্ণ অবমুক্ত। ৪৪০.০৪ বর্গমাইল বিশিষ্ট পরিষদীয়

অঞ্চল ও তার অধিবাসীরা মাত্র, গঠিতব্য ভূমি কমিশনের এখতিয়ারাদীন। এখন প্রথম দায়িত্ব হলো, জেলা ভিত্তিতে পরিষদীয় এলাকা নির্ধারণ। জনসংহতি সমিতির দাবী নং ২/৫ ক ও খ এবং চুক্তিভুক্ত দফা নং খ/২৬ ও ৬৪ নং জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী তাই তাদের বুঝিয়ে দেয়া আবশ্যক।

এখন এ কথা বলা বাগাড়ম্বর যে, গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামই আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন জেলা পরিষদভুক্ত এলাকা। গোটা অঞ্চলটি তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসনের এখতিয়ারধীন হওয়া মানে, তার অখন্ডভাবে পরিষদীয় অঞ্চলে পরিণত হওয়া। খোদ জনসংহতি সমিতি স্বীয় দাবী নং ২/৫-ক ও খ তে পরিষদীয় অঞ্চলকে সংকুচিত করে মাত্র ৪৪০.০৪ বা ৪৪৬.০৬ বর্গমাইলে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, এবং চুক্তি ও জেলা পরিষদ আইনের মাধ্যমে এর উপর সীলমোহর পড়ে গেছে। এখন গোটা পার্বত্য অঞ্চলে পরিষদীয় এখতিয়ার ও আইন কানুন জারির অবকাশ নেই। ৪৬৫২.৯৬ বর্গমাইল বিশিষ্ট জাতীয় অঞ্চল ও তার জনসাধারণ পরিষদমুক্ত। ভূমি কমিশনের এখতিয়ার ও এ হিসাবে সংকুচিত। ৫০৯৩ বা ৫০৮৯ বর্গমাইল বিশিষ্ট গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ভূমি কমিশনের এখতিয়ারাধীন নয়। এখন উচিতঃ পরিষদীয় এলাকাকে ৪৪০.০৪/৪৪৬.০৪ বর্গ মাইলে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে, সরকারী প্রশাসনকে নিজ অঞ্চলে দ্বিধাহীনভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সর্বাত্মক সহায়তা দান করা। জেলার খন্ডিত অংশ নিয়ে আইনতঃ জেলা পরিষদও গঠিত হয় না। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৫৯ তা অনুমোদন করে না। একটি অখন্ডিত একক প্রশাসনিক অঞ্চল নিয়েই পরিষদ গঠিত হবে, খন্ডিত অঞ্চল নিয়ে নয়।

৫

(তাং-রোববার ২৩ আশ্বিন ১৪০৭ বাংলা ৮ অক্টোবর ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

এটা দুঃখজনক বিভ্রান্তি যে, সরকারী বেসরকারী উভয় পক্ষেরই ধারণা ঃ চুক্তিভুক্ত অঞ্চল হলো গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং এ কারণেই গোটা পার্বত্য অঞ্চলকে নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত। এই অখন্ডতাকে অবলম্বন করেই জন সংহতি সমিতি পার্বত্য বাঙ্গালীদের ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে আপত্তি উথাপনের সুযোগ পাচ্ছে। তিন জেলা পরিষদ এ হেতু সমুদয় জমিজমা, আর্থিক ও শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধা এবং কর্ম সংস্থানের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের দ্বারা, সরকারী জেলা প্রশাসনকে, নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। জেলা পরিষদের ছাড়পত্র ছাড়া ভূমি বন্দোবস্তি হস্তান্তর ও মিউটেশন নিশ্চল হয়ে আছে। সুতরাং সর্বাগ্রে এ বিভ্রান্তি দূর করা দরকার যে, আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষ কি অখন্ড পার্বত্য জেলা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে গঠিত এবং তাদের এখতিয়ার কি সারা অঞ্চল ব্যাপ্ত সার্বিক?

এই প্রশ্নটির মীমাংসা পেতে হলে প্রথমেই জানতে হবে, জনংসহিত সমিতির এ সংক্রান্ত দাবী ও তার ব্যাখ্যাটি কী ? এবং সঙ্গে সঙ্গে এটা ও বিবেচ্য হবে যে, পার্বত্য চুক্তি ও পরিষদীয় আইনের মূল ভিত্তি হলো ৫ দফা দাবী নামা। দাবী নং ২/৫-ক-তে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

'কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা, বেতনুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীর জমি পাহাড় ও কাপ্তাই হ্রদ এলাকা এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলসহ অন্যান্য সকল বনাঞ্চল, পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।'

এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে এটা পরিষ্কার যে, নিম্নোক্ত অঞ্চলগুলো দাবীমুক্ত যথা ঃ

ক) কর্ণফুলী জন বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা,
খ) বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা,
গ) রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা,
ঘ) রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত অঞ্চল,

এই তালিকার (ঘ)তে বর্ণিত অঞ্চলের ভিতর, কর্ণফুলী হ্রদ এলাকা, সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনভূমি পাহাড় ও নদীনালা পড়ে। দাবীটির প্রথমার্ধের এই ছাড়কে দ্বিতীয়ার্ধে এসে বিভ্রান্তিমূলকভাবে বলা হয়েছে, কর্ণফুলী হ্রদ এলাকা সংরক্ষিত বনাঞ্চলসহ সমূদয় বন পাহাড় ও সকল শ্রেণীর জমি পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে। এটা স্ববিরোধী বক্তব্য।

১৮৬৫ সালের এক্ট নং ৭ ধারা নং ২ এবং কলকাতা গেজেটের ১ ফেব্রুয়ারী ১৮৭১ তারিখের বিজ্ঞপ্তি মূলে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫৬৭০ বর্গমাইল এলাকাকে বন ঘোষণা করেন। তখন কক্সবাজার ও দেমাগ্রীর কিছু অঞ্চলসহ পার্বত্য অঞ্চলের মোট আয়তন ছিলো ৬৮৮২ বর্গমাইল। ১৯২৭ সালে আরেক বন আইন জারির মাধ্যমে সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে তা থেকে পৃথক করা হয়। ১৯৫৬ সালে কর্ণফুলী হ্রদ এলাকাভুক্ত সমুদয় জায়গা জমি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়। বন্দোবস্তি প্রদত্ত বা খাস জমি বিশেষ প্রয়োজনে সরকারী খাতে বরাদ্দ বা অর্পণ করা অধিগ্রহণের পযার্য়ভুক্ত। ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সম্পত্তির হুকুম দখল বা অধিগ্রহণের সাথে ক্ষতিপূরণ জড়িত। স্বীয় দাবীর ব্যাখ্যা ক্রমে জনসংহতি সমিতি মতামত দিয়েছে স্থানীয় সরকার পরিষদের আইনের বিধি অনুসারে মাত্র ৪৪৬.০৪ বর্গমাইল এলাকাই স্থানীয় সরকার পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ও বাকি ৪৬৪২.৯৬ বর্গমাইল এলাকা বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হয়েছে।

এই আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পার্বত্য চুক্তিতে এর কোন সমাধান দেয়া হয়নি। সুতরাং এ ধারণা সঠিক নয় যে, গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামই পরিষদীয় অঞ্চল।

দাবী নং (২/৫-ক)ই বলে দেয়, সার্বিকভাবে গোটা পর্বতাঞ্চল জনসংহতি সমিতির দাবীভুক্ত এলাকা নয়। তাতে কিছু ছাড় আছে এবং চুক্তির মূল ভিত্তি এটাই। এই বক্তব্যকে সমর্থন করে তাদের পরবর্তী দাবী যথা ঃ

দাবী নং ২/৫-খঃ কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা, বেতনুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমির সীমানা নির্ধারণ করা।

এখানে স্মর্তব্য যে, এই ২/৫-খ-তে ২/৫-ক এর দ্বিতীয়াংশের ব্যক্তব্যটি নেই। সুতরাং অধিগ্রহণভুক্ত বন পাহাড় নদী নালা ও কর্ণফুলী হ্রদ দাবীমুক্ত।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় ঃ এখন পার্বত্য চুক্তি ও পরিষদীয় আইনের ভিত্তিতে দুই পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্তিত্ব ভাস্বর হয়ে উঠেছে। একটি হলো পরিষদীয় অঞ্চল, আর অপরটি হলো জাতীয় অঞ্চল। পরিষদীয় অঞ্চলের আয়তন ৪৪০.০৬ বা ৪৪৬.০৬ বর্গমাইল, আর জাতীয় অঞ্চলের আয়তন হলো ৪৬৫২.৯৬ বা ৪৬৪২.৯৬ বর্গমাইল। এ হিসাবে আঞ্চলিক পরিযদ জেলা পরিষদ ও ভূমি কমিশনের এখতিয়ার সংকুচিত। এখন তাদের এখতিয়ার থেকে বহির্ভূত অঞ্চল ভুক্ত জনসাধারণের রাজনৈতিক ও বৈষয়িক বিষয়াদিও হবে ভিন্ন এখতেয়ারাধীন। এই দাবী ও চুক্তি অনুযায়ী তিন জেলা ভিত্তিক পরিষদীয় আর জাতীয় অঞ্চলের সীমানাও আয়তনের ভাগ বাটোয়ারা সম্পন্ন হলে, প্রশাসন ও পরিযদ উভয়ই হস্তক্ষেপ ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত পরিবেশ লাভ করবে। এ ছাড়া এখন সবাই বিভ্রান্ত। প্রশাসন ও পরিষদ সমূহ সবাই সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্সে আক্রান্ত। এই পরিস্থিতি অস্বস্তিকর। পার্বত্য চুক্তি বহুবিধ বাঁধার সৃষ্টি করেছে। এর অনেক কিছুই বিভ্রান্তিকর। আসলে পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন স্বায়ত্তশাসিত বা প্রশাসনিক ইউনিট নয়। দেশ হলো সাংবিধানিকভাবে একটি বিশুদ্ধ ইউনিটারী রাষ্ট্র। প্রশাসনিক ইউনিট ছাড়া এর অন্য কোন বৈধ অঙ্গ সংগঠন নেই। আঞ্চলিক পরিযদেকে বৈধ ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ বানাতে হলে, আগে এর ভিত্তিমূল পার্বত্য চট্টগ্রামকে রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ইউনিটে পরিণত করতে হবে। জনসংহতি সমিতির ৫ দফা দাবী নামার ১ নং দফায় এই আইনী শূণ্যতা নিরসনের কথা ছিলো। কিন্তু চুক্তির সময় তারা আত্মহারা আনন্দে ভুলে গেছেন যে, তাদের সাফল্য শূণ্য স্থিতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটির স্থায়ীত্ব লাভ সন্দেহজনক। সাংবিধানিক শূণ্যতা এর জন্য মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে।

৬

(তাং-২৫ আশ্বিন ১৪০৭ বাংলা ১০ অক্টোবর ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ নিজেদের ত্রুটি স্বীকারের পরিবর্তে যুক্তি দেখাতে

পারেন যে, সরকার সামগ্রিক অর্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়েই চুক্তি করেছেন। তাতে পরিষদীয় অঞ্চল আর জাতীয় অঞ্চলের কোন ভাগ বিভক্তি নেই। চুক্তি কার্যকর করাকালে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ গঠন এবং দায়িত্ব দেয়া কালে ও গোটা পর্বতাঞ্চলকে পরিষদ সমূহের এখতিয়ারভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৮৯ সালে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠনকালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনটিও সামগ্রিক ভিত্তিতে হয়েছে। এখন জাতীয় অঞ্চল আর পরিষদীয় অঞ্চলের প্রশ্ন উত্থাপন অবান্তর।

কিন্তু না, চুক্তি ভিত্তিক প্রণীত জেলা পরিষদ আইনের ৬৪ নং ধারায় জাতীয় অঞ্চল ও পরিষদীয় অঞ্চলের বিভক্তি স্পষ্ট করে বর্ণিত হয়েছে, যথা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতনবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প কারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডকৃত জমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।

বর্ণিত ছাড়ের তৎপর্য ব্যাপক। রক্ষিত চনাঞ্চল মানে সংরক্ষিত আর রাষ্ট্রীয় বনের একত্রিত সংস্থান। রাষ্ট্রীয় বনের বৃহদাংশ ডেপুটি কমিশনারদের নিয়ন্ত্রণাধীন রেকর্ডকৃত সরকারী সম্পত্তি, এবং অবশিষ্টাংশ, জুম নিয়ন্ত্রণ, পাল্প উড, ও ইউ এস এফ নামীয় বন বিভাগের নামে রেকর্ডকৃত। এই ব্যাখ্যা জনসংহতি সমিতির কাছে মনোপুত না হতেও পারে। তবু এটি অপ্রিয় সত্য।

জনসংহতি সমিতি স্বীয় দাবী নং ২/৫-ক-তে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছে ঃ

সকল শ্রেণীর জমি পাহাড় ও কাপ্তাই হ্রদ এলাকা, এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলসহ অন্যান্য সকল বনাঞ্চল পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতায়ধীন করা। কিন্তু চুক্তিতে তা মানা হয়নি। এর বিপরীতে প্রণীত আইনী বক্তব্য হলো ঃ ধারা নং ৬৪। জমি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান। (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন (ক) রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্ত যোগ্য খাস জমি সহ যে কোন জায়গা জমি পরিষদের পুর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, ইজারা প্রদান, বন্দোবস্ত, ক্রয় বিক্রয় বা অন্যবিধ ভাবে হস্তান্তর করা যাবে না। এর অর্থ হলো মূল বন্দোবস্তি ক্ষমতা জেলা প্রশাসকদেরই হাতে ন্যস্ত আছে।

এই আইনে সুনির্দিষ্টভাবে সকল শ্রেণীর জমি পাহাড়, সংরক্ষিত আর অন্যান্য বনাঞ্চল জেলা পরিষদের বন্দোবস্তি ও হস্তান্তরের পূর্বানুমোদন আওতাধীন করা হয়নি। সুনির্দিষ্ট না হলে ঢালাও সামগ্রিক ক্ষমতা, প্রয়োগযোগ্য হয় না। সুতরাং বলা যায় ঃ চুক্তি ও আইনে চাওয়ার চেয়ে অধিক দেয়া হলেও, বাস্তবে এই দান সুনির্দিষ্ট নয়। এখানে সংবিধানের আওতায় হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল ও পড়ে, যা বাস্তবে কার্যকর আছে। এই আইন জেলা পরিষদ আইনের সমান্তরাল কার্যকর থাকায়, এ বলা

প্রহসন যে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাক না কেন, এই ৬৪ নং বিশেষ বিধানটি অবশ্যই কার্যকর হবে। তবু বাস্তব হলো, হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের অগ্রমান্যতা স্থগিত হয় নি। ফলে পরিষদে আর প্রশাসনে নীরব লড়াই চলছে। মাঝখানে স্থগিত আছে ভূমি সংক্রান্ত সব কার্যক্রম। এ ক্ষেত্রে নিরীহ জনসাধারণ হলো বলির পাঠা।

যদি রাজনীতির লক্ষ্য হয় জনসাধারণ স্বজাতি ও স্বঅঞ্চলের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি ও কল্যাণ সাধন, তা হলে বলবো এই ভূমি নিয়ন্ত্রণ আইন সর্বনাশ করেছে। পাহাড়ী বাঙ্গালী উভয় সমাজই সম্পত্তির অধিকার ও লেনদেনের ব্যাপারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। বিধি নিষেধ কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষ এতো ব্যাপক যে, তাতে জনসাধারণ ব্যাপকভাবে উত্যক্ত ও হয়রানীর শিকার। হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল সৃষ্টি করেছে তিন চীফ, তিনশত তেহাত্তর জন হেডম্যান ও শতাধিক বাজার চৌধুরীর এক সুবিধাবদী শ্রেণী। তার পাশাপাশি বর্তমান পরিষদ ব্যবস্থা জন্ম দিয়েছে শতাধিক অভিজাত চেয়ারম্যান সদস্য মন্ত্রী ও উপদেষ্টা পদাধিকারীদের ও যারা পতাকা গাড়ি বাড়ি উচ্চ বেতন ভাতা ও মর্যাদায় অভিষিক্ত। এর বিপরীতে জনসাধারণকে টোল টেক্স চাঁদা ও সন্ত্রাস চেপে ধরেছে। সাধারণ কৃষিপণ্য, সে এক ছড়া কলা বা একটি মোরগ ছানা হোক, বিক্রির আগে পরে কয়েকবার টোল টেক্স ও চাঁদা দিতে হয়। এক খন্ড জমি বন্দোবস্তি খরিদ বিক্রি বা হস্তান্তরের প্রয়োজন হলেও চেয়ারম্যান, মেম্বার, হেডম্যান, কারবারী, বাজার চৌধুরী, আমিন কানুনগো রেভিনিউ কালেক্টর, পিওন, কেরানী, বড় কর্তা ইত্যাদির কাছে ধরণা হাটাহাটি পারিতোষিক দিতে দিতে জীবন কেটে যায়, তবু শেষ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পুরুষাধিক সময় লাগে। এখন পারিতোষিকের পরিমাণ শতের কোটা ছেড়ে, হাজারের কোটার উপরের দিকে উঠে গেছে। গরীবের পক্ষে এখন জমির মালিক হওয়া দুঃসাধ্য। অবস্থা দাঁড়িয়েছে এমন ঃ 'ঢালো কড়ি, মাখো তেল'।

জনগণের নামে সংগঠিত হয় রাজনীতি আন্দোলন সংগ্রাম আর প্রতিনিধিত্ব। রাষ্ট্রের পরিচয়টাও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। কিন্তু বাস্তবে জনসাধারণ পতিত নিঃস্ব অসহায়। তারা নামে স্বাধীন নাগরিক, কিন্তু বাস্তবে বিত্তবান ও ক্ষতাবানদের দাস ও প্রজা। পার্বত্য চট্টগ্রামে এই গণ দুর্ভোগ সীমাহীন। যদি জায়গা জমি শস্য উৎপাদনে কার্পণ্য করতো, আর আবহাওয়া বিরূপ হয়ে যেতো, এবং প্রকৃতি ও চাওয়া পাওয়া খোশামোদ তোযামোদ পারিতোষিক আর কুর্নিশ লাভ শিখতো তা হলে এতদাঞ্চল হতো একটি দোজখ।

আসলে সরকার চাওয়ার চেয়ে বেশি দিয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু পাওয়ার বেলায় বাস্তবে ধরা দিয়েছে শূণ্য। এটি হলো এক হাতে দেয়া, আরেক হাতে নেয়া, তথা দেয়া না দেয়ার খেলা। খেলাই বটে। জনসংহতি সমিতি কথিত শান্তিচুক্তি যথাযথ বাস্তবায়িত না হওয়ায় ক্ষুব্ধ, অথবা এ ক্ষোভ হলো তার ভক্ত সমর্থকদের প্রবোধ

দানের কৌশল। সে তো জানেই, চুক্তি কী হয়েছে ও সরকার তাকে কী দিয়েছে। এখন সে কথা বলে দিলে তো, ব্যর্থ জনসংহতি সমিতির উপর লোকেরা ক্ষেপে যাবে। নিরাপদে পদ আর পতাকা ধরে রাখা যাবে না। তাই সরকারের সাথে সমঝোতায়ই বোধ হয গরম বক্তৃতা ঝাড়া হয়। সাম্প্রদায়িক খলা গরম করতে বলা হচ্ছে ঃ সেটেলার বাঙ্গালীদের আভ্যন্তরীন উদ্বাস্তুর সুযোগ দেয়া যাবে না। তাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি বাতিল করতে হবে। ফিরিয়ে নিতে হবে তাদের ইত্যাদি।

সরকার কিন্তু এসব দাবী দাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চুপ। তাইতো মনে হয় এটা আপোষ রফার বাদানুবাদ। সরকার কৌশলে অধিকাংশ ভূমি যে নিজ দখলে রেখে দিয়েছেন তার প্রমাণ হলো, পরিষদ আইনের ৬৪ ধারার শেষ অংশটি তাতে জেলার খাস পাহাড় বন ও কর্ণফুলী হ্রদ এলাকাটি জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয়া হয়নি। বলা হয়েছে ঃ প্রয়োজনে তা মূল বাস্তুচ্যুত মালিকদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে যথা ঃ

(৩) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্তি দেয়া হবে।

এখানে পেন্ডুরার বাক্সের শেষ খেলাটি হলো এই যে, পরিষদ নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার জায়গা জমিতে বন্দোবস্তির কর্তৃত্ব লাভ করেনি, কেবল পুর্নবানুমোদন দানের অধিকারই লাভ করেছে। এখানেও চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ সরকার। এটা আরেক হেডম্যানী ব্যবস্থা বা বাণিজ্য বেসাতি। জেলা পরিষদের অনুমোদন ছাড়া বন্দোবস্তিও বেচা কেনা হবে না এ নিশ্চিয়তা কি আছে? বাজার ফান্ডের এডমিনিষ্ট্রেটার হয়ে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানরা স্বচ্ছতার সাথে বন্দোবস্তির দায়িত্ব পালন করছেন বলে তো শোনা যায় না। ভুক্তভোগীরা জানেন, পারিতোষিকের খেলায় অক্ষমদের মামলার কোন সুরাহা হয় না, তবে লাভবান হয় ধনী ও ক্ষমতাবানেরা।

৭

(তাং-মঙ্গলবার ৯ কার্তিক ১৫০৭ বাংলা ২৪ অক্টোবর ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

একথা সঠিকভাবে কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে, পর্বতাঞ্চলের জরিপ ভিত্তিক আয়তন কত। কেউ বলেন, ৫০৯৩ বর্গমাইল, আর কেউ বলেন ৫০৮৯ বর্গমাইল। তৃতীয় বা চতর্থ কোন পরিমান নিয়ে কেউ যদি দাবী করেন, না এসবই ভুল, আসলে পরিমাপ আরো কম বা বেশী, তাহলেও চ্যালেঞ্জ করার উপায় নেই। অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশের যোগ বিয়োগ ও পূরণ ভাগই এখন পর্যন্ত পরিমাপের সুত্র। সীমান্তের বহুবর্গ কিলোমিটার এলাকা যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয়ের দখলে চলে যায়নি সে তো সৌভাগ্য।

এ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে সামগ্রিক কোন জরিপ কাজ সম্পাদিত হয়েছে বলে

আমাদের জানা নেই। কেবল বিশেষ প্রযোজনে কিছু খন্ডিত কাজ হয়েছে, যা সার্বিক ভূমি চিত্র প্রদর্শন ও প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম। এমতাবস্থায় পাহাড় নদী , বন সমতল, আবাদী খাস আর বন্দোবস্তি ভুক্ত জমির সঠিক পরিমান ও বর্ণনা পাওয়া কঠিন। যা আছে তার সবই খসড়া ও অনুমান ভিত্তিক যোগ বিয়োগ সাধিত হিসাব। এই বিভ্রান্তিকে কাটিয়ে ওঠার একমাত্র উপায় সার্বিক ও সরেজমিন জরিপ সম্পাদন। একমাত্র তাতেই সঠিকভাবে বলা সম্ভব হবে, পার্বত্য অঞ্চলের সামগ্রিক আয়তন কত, রাষ্ট্রীয় ভূমি প্রতিবেশীদের দ্বারা বেদখল হয়েছে কিনা, বৈধ বন্দোবস্তি ভুক্ত জমি পরিমান কতো, কারো মালিকানাধীন জমিতে অপর কারো অনুপ্রবেশ বা জবর দখল ঘটেছে কিনা, খাস জমির বেহাত হওয়ার পরিমাণ কতো, বন্দোবস্তি বহির্ভুত আবাদি জমির পরিমান কী, ভোগদখলকার কারা, দখল বহির্ভুত খাস জমি পাহাড় বন ও নদী নালার পরিমান ও হাল অবস্থা কী, সংরক্ষিত আর রাষ্ট্রীয় বন কোথায় কী পরিমানে সংরক্ষিত ও দখল মুক্ত আছে, আবাদ যোগ্য জমি ও পাহাড় কোথায় কী পরিমানে ব্যবহার যোগ্য, খাসজমি ও পাহাড়ের ব্যবহার উপযোগিতাই বা কী ইত্যাদি। এই সার্বিক জরিপ চিত্র ছাড়া ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার নির্ণয় অসম্ভব। এই জরিপ নির্ভর শূণ্যতাকে ঘিরে অনেক মামলা মোকদ্দমা ও দাবীর উদ্ভব ঘটেছে, যা পরিমানে বিপুল ও রাজনৈতিক গুরুত্বে বিব্রতকর। এর সাথে যুক্ত আছে সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা ও বিবাদ। এই সমস্যাটি তাই শুধুই বৈষয়িক ঠেলাঠেলি নয়।

ভূমি কমিশন নিরপেক্ষ ও ন্যায্য ভূমিকা রাখতে তখনই সক্ষম হবেন, যখন তার হাতে ভূমি সংক্রান্ত পরিপূর্ণ জরিপী তথ্যাদি সন্নিবেসিত হবে এবং কমিশন প্রধান সহ অন্যান্য সদস্যরা, এতদাঞ্চলীয় ভূমি সংক্রান্ত স্বার্থ থেকে পরিপুর্ণ মুক্ত হবেন। কিন্তু বাস্তব হলো ঃ কমিশনের জন্য জরুরী জরিপী ভূমি রেকর্ড প্রস্তুত নেই। কমিশনের উপজাতীয় সদস্যরা স্থানীয় ভূমি স্বার্থের সাথে জড়িত। তারা উপজাতীয় দাবীদার ও ফরিয়াদীদের সপক্ষ ও বটে। এবং মোট কমিশন সদস্যদের ৫ জনের ৩ জনই অর্থাৎ গরিষ্ঠ সংখ্যাক তারা। সুতরাং ভূমিগত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের পক্ষে তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকা হবে সন্দেহজনক। তাই কমিশনের কার্যক্রম যে নির্দোষ ও নিরপেক্ষ হবে, সে ভাবার অবকাশই নেই। অধিকন্তু কমিশন প্রধানের পক্ষে গরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্যের অভিমত অগ্রাহ্য করার ও নিজ অভিমতে চূড়ান্ত রায় দানের ক্ষমতা থাকার বিষয়টি অনিশ্চিত। প্রধানতঃ দুই সরকারী সদস্য উপজাতীয় সদস্যদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে নিজেদের চাকুরী স্বার্থ ও কমিশনকে বিতর্কিত আর বিপন্ন করবেন বলেও মনে হয় না। সুতরাং ভূমি কমিশনের হাতে বাঙ্গালী স্বার্থ অরক্ষিত থাকার স্বন্দেহ একে বারে ফেলনা বলা যায় না। এটা ও অসম্ভব নয় যে, স্বার্থের বিনিময়ে দু'একজন সদস্য প্রভাবিত হবেন না। তাদের দ্বারা গরীব ফরিয়াদীরা পারিতোষিক দানের অক্ষমতার কারণে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হবেন, সে সম্ভাবনা ও আছে। কুলিন ক্ষমতাধর উপজাতীয় নেতারাই পরিতোষিক ও

সরকারী আশীর্বাদ লাভের বিনিময়ে অতীতে পর্বতাঞ্চলে বাঙ্গালীদের বসিয়েছেন। ১৯৭৮ সালের পরবর্তী বাঙ্গালী বসতি স্থাপন সরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত। প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে এর সূচনা হলেও উপজাতীয় উপদেষ্টা বাবু সুবিমল দেওয়ান তাতে মদদ যুগিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে এর গতি ধীর হলেও বন্ধ ছিলো না। বরং তার আমলে উপদেষ্টা ছিলেন শক্তিশান চাকমা নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা ও বিনয় কুমার দেওয়ান। সুতরাং বাঙ্গালীরা হাওয়ায় ভর করে আপনাতেই উড়ে এসে জুড়ে বসে নি। সরকারও একক ক্ষমতা বলে বাঙ্গালী বসতি স্থাপনে এক রোখা নীতি গ্রহণ করেনি। আগে পরে সব হেডম্যান, চীফ ও রাজনৈতিক নেতাই আর্থিক সুবিধা ও সরকারী আশীর্বাদের বিনিময়ে বাঙ্গালীদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে মদদ যুগিয়েছেন। তাতে আইনী প্রতিবন্ধকতা, বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। আর্থিক সুবিধা ও আর্শীর্বাদের টোপ এক অব্যর্থ অস্ত্র, তাতে ভবিষ্যতেও বাঙ্গালীরা বসবাস ও ভূমির মালিকানার সুযোগ জয় করে নিবে তা অবধারিত। তাই বাধাবাধি কোন স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা নয় এটি পয়সা কড়ি কামানো আর আশীর্বাদ লাভের পসরা পাতা ব্যবস্থা। যদ্বারা নেতা ও অভিজাতেরা উপকৃত হবেন। সাধারণ উপজাতীয়দের তাতে কোন লাভ ক্ষতি হবে না। তারা চিরকাল নিরীহ গরীব প্রজা হয়ে আছে এবং থাকবে। ভূমি আইনে তাদের কোন কল্যাণ নিহিত নেই। বাঙ্গালীদের বঞ্চিত রেখে সাধারণ পাহাড়ীদের সহজ ভূমি স্বত্ব লাভের কোন পদ্ধতি, না হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েলে আছে, না জেলা পরিষদ আইনে। জেলা প্রশাসকদের ভূমি দানের ক্ষমতা এখন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের হাতে বন্দি। এই আইনে পাহাড়ী-বাঙ্গালী সবাই ভেদাভেদহীন ভাবে সমান ভুক্তভোগী। আগে জেলা প্রশাসকদের ভূমিদান ক্ষমতা ছিল বাধাহীন। তিনি বা তারা ইচ্ছা করলে যে কাউকে মুহুর্তে ভূমির মালিক করে দিতে পারতেন। এখনো মূল বন্দোবস্তি ও নামজারীর ক্ষমতা তার বা তাদের হাতেই নিহিত। তবে প্রতিবন্ধকতা হলো জেলা পরিষদ আইন নং ৬৪, যা পরিষদ চেয়ারম্যানের পুর্বানুমোদনকে জরুরী করে দিয়েছে। তাতে ভূমি বন্দোবস্তি ও হস্তান্তর দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। এই অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চুক্তিভুক্ত দফা নং খ/৩ হলো একটি হাস্যম্পদ সিদ্ধান্ত। সরকার ভূমিহীন বা দু'একরের কম জমির মালিক উপজাতীয়দের পরিবার প্রতি অন্ততঃ দু'একর জমি বা টিলা জমির মালিকানা নিশ্চিত করবেন। জেলা পরিষদ আইন নং ৬৪ তে, জেলা প্রশাসকদের ভূমিদান ক্ষমতা অচল করার পর, এই ভূমি দানের আশ্বাস বা অঙ্গিকার কি পরিহাস্য নয়? চেয়ারম্যানেরা, স্বতস্ফুর্ত দয়ালু উদার ও পাহাড়ী দরদী হওয়ার কোন নজির তো তাদের কর্মকান্ড ও বন্দোবস্তি খাত বাজার ফান্ডের বেলায় কখনো প্রদর্শন করেননি। ভূমি অনুমোদনের বেলায় ও তারা স্বার্থে পরিচালিত হবেন, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

৮

(তাং-বুধবার ১০ কার্তিক ১৪০৭ বাংলা ২৫ অক্টোবর ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি খুঁজে পাচ্ছি না, এতদাঞ্চলে আমরা কি বৃটিশ আমলে আছি, না বাংলাদেশ আমলে? এটা সঠিক যে, এখনকার প্রশাসন ও প্রশাসকরা বাংলাদেশী। তবে তাদের পদ পদবি ও প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং স্থানীয় প্রশাসনিক ইউনিট, যা কখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম, আর কখনো তিন পার্বত্য জেলা তথা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়িও বান্দরবন নামে অভিহিত, তা এখনো বিভ্রান্তি মুক্ত নয়। হিল ট্রাক্টস ইউনিট ও রেগুলেশন নং ১/১৯০০ এর অধীন রচিত পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইন বজায় থেকে থাকলে, এতদাঞ্চল এখনো একটি জেলা এবং এটিকে নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন হবে যথার্থ। এর বিপরীতে তিন পার্বত্য জেলা মান্য নয়। এই পরিস্থিতিতে একক পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনই হতে পারে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা ও সাংগঠনিক ভিত্তি এবং নামে আঞ্চলিক পরিষদ হলেও তা হবে বাস্তবে জেলা পরিষদ। এর বিপরীতে তিন জেলা প্রশাসন ও তিন পরিষদ গঠন আর তা পরিচালনা বিভ্রান্তিকর। আরো বিভ্রান্তি হলো ঃ এখানে পালনীয় সর্বোচ্চ আইন কোনটি? রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বোচ্চ আইন হলো ঃ বাংলাদেশ সংবিধান। কোন ক্ষুদ্র অঞ্চল বা কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেউই এর আওতামুক্ত নয়। প্রচলিত আইন আর নতুন প্রণীত স্থানীয় আইন সমূহের পাশাপাশি বাংলাদেশ সংবিধানের সর্বোচ্চ মর্যাদায় কার্যকরী হওয়া কি সাংঘর্তিক নয়? তখন সংবিধানের কি অমর্যাদা হবে না?
পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬২/৬৪ সহ কিছু ধারায় বলা হচ্ছে ঃ
'আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন' এ বলার অর্থ পরিষ্কার যে সংশ্লিষ্ট আইনের মর্যাদা সর্বোচ্চ। অথচ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হলো সংবিধান। অধিকন্তু এতদাঞ্চলের জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপুর্ণ এবং প্রচলিত আইন হলো, রেগুলেশন নং ১/১৯০০ এর অধীন রচিত হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল। এটি রহিত করে ১৯৮৯ সালে সংসদীয় একটি আইন প্রণীত হলেও তার কার্যকরতা দেয়া হয়নি। বরং উদ্ভুত বিভ্রান্তি কাটিয়ে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে নিম্নোক্ত আদেশ জারি করা হয়েছে, যথা ঃ

'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়,
আইন শাখা, নং ২১৫ আইন, তারিখ ৩-৫-৮৯ইং।

বিষয় ঃ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক ঘোষণার আলোকে বর্তমানে তিনটি পার্বত্য জেলায় (রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি) সিভিল মামলা ও সেসন মামলার বিচার সম্পর্কে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশিত হইয়া উপরোক্ত বিষয় আপনার ২৯-৪-৮৯ তারিখের স্মারক নং সাঃ/২-৮৭-৩৫২ এর আলোকে জানাইতেছি যে, রেগুলেশন নং ১/১৯০০ বাতিল করা হয় নাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত নতুন আইনটি এখনো কার্যকরী করা

হয় নাই। ফলে পুরাতন অবস্থা এখনও বলবৎ আছে।

স্মারক নং সাঃ/২-৭-৮৭-৩৯০ স্বাক্ষর মোঃ মুজিবুর রহমান সহকারী সচিব'

এখানে উল্লেখ্য যে, বিষয়টি কেবল সিভিল ও সেসন মামলার ভিতর সীমাবদ্ধ নেই। এটা গোটা রেগুলেশন নং ১/১৯০০ এর কার্যকর থাকার কর্তৃপক্ষীয় দলিলও বটে। সুতরাং অবিভক্ত হিল ট্রাক্টস জেলা ইউনিট, তিন বিভক্ত পার্বত্য জেলা ইউনিট এবং চার পরিষদের অস্তিত্ব পারস্পরিকভাবে বিভ্রান্তিতে আবদ্ধ। কোনটি মান্য, না একাধারে সবটি? এটাই বিভ্রান্তির বিষয়। রেগুলেশন নং ১/১৯০০ বহাল ধরা হলে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ইউনিট একটি একক অখন্ড জেলা রূপে বিদ্যমান। তবে তার কোন জেলা প্রশাসক ও প্রশাসন নেই। এই একক ভিত্তিতে জেলা পরিষদ আইন প্রনীত হয়নি, এবং জেলা পরিষদও এরূপ সার্বিক নয়। তিন জেলা প্রশাসন বর্ণিত রেগুলেশনের দ্বারা সমর্থিত নয়, এবং সে অনুযায়ী রেগুলেশন সংশোধন ও করা হয়নি। তবে কি তিন জেলা বেনামীতে সাবেক তিন মহকুমা ? তা হলে তো তিন জেলা পরিষদ আসলে মহকুমা পরিষদ। এ হিসাবে জেলা পরিষদের মর্যাদাটি আঞ্চলিক পরিষদেরই প্রাপ্য। এ না হলে আঞ্চলিক পরিষদের কোন মর্যাদাই প্রাপ্য হয় না। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৫৯ অনুযায়ী জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় শাসন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার ভিত্তি হবে কোন প্রশাসনিক ইউনিট। এতে প্রশ্ন ঃ আঞ্চলিক পরিষদ আসলে কোন প্রশাসনিক ইউনিট নিয়ে গঠিত? সুতরাং এটা পরিষ্কার হতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি প্রশাসনিক ইউনিট অথবা নয়, এবং রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন তিন জেলা পরিষদ কিংবা মহকুমা পরিষদ। সারা বাংলাদেশে মহকুমা বিভাগ বিলুপ্ত। কোথাও পূর্বাবস্থা নেই। তবে ব্যতিক্রম হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম। এখানে রেগুলেশন নং ১/১৯০০ বহাল রাখায় এর দ্বারা পুর্বাবস্থা বিদ্যমান। এই আইনে তিন জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ আর স্বতন্ত্র আইনের কোন সংস্থান নেই।

এটাও বিভ্রান্তিকর যে, এখানে বাংলাদেশ সংবিধান, হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল ও পরিষদ আইন এই তিনের একটা খিচুড়ি সংস্থান চলছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১, দেশটিকে একটি বিশুদ্ধ ইউনিটারী ও স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে ঘোষণা করে এবং ৭ নং অনুচ্ছেদ ঘোষণা করে সংবিধানই দেশের পালনীয় সর্বোচ্চ আইন। যে আইন এর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় তা বাতিল হবে। পুনরায় অনুচ্ছেদ নং ২৬ (২)-এ বলা হয়েছে ঃ রাষ্ট্র এই ভাগের (মৌলিক অধিকার) কোন বিধানের সাথে অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করবেন না। অথচ আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপন হলো অঘোষিত ফেডারেল ব্যবস্থা। অনুচ্ছেদ ৫৯ মতে কোন প্রশাসনিক ইউনিট ছাড়া স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সুতরাং আঞ্চলিক পরিষদ কোন স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ নয়। হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলটিও সংবিধানের সাথে অসংগতিশীল। এবং জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনদ্বয় বিভিন্নভাবে সংবিধানের সাথে

অসমঞ্জস। এমতাবস্থায় প্রচলিত, আর হালে প্রণীত এবং অধুনা প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য আইন ও পরিষদ সমুহ মোটেও বিতর্ক মুক্ত নয়। এই বৈধতার বিতর্ককে এড়িয়ে প্রস্তাবিত ভূমি কমিশন, প্রতিষ্ঠিত আর পরিচালিত হতে পারে না, এবং তার এখতিয়ারভুক্ত এলাকাও সুনির্দিষ্ট হয় না। অধিকন্তু এটাওমান্য হতে পারে না যে, ভূমি কমিশনের রায় আপত্তিযোগ্য নয় এবং চূড়ান্ত। আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন প্রশাসনিক অঞ্চল কিনা তার ফয়সালা হোক। তারপর তিন জেলা পরিষদের এখতিয়ার ও এলাকা সুনির্দিষ্ট হোক এবং এও সুনিশ্চিত হোক যে সরকারের প্রশাসনিক এখতিয়ার ও এলাকার যে পরীধি চুক্তি ও জেলা পরিষদ আইনে আছে তা কি ভূমি কমিশনের এখতিয়ারকে সুনির্দিষ্ট করে না?

৯

(তাং-বৃহস্পতিবার ১৮ কার্তিক ১৪০৭ বাংলা ২ নভেম্বর ২০০০ খ্রীঃ /দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

রেগুলেশন নং ১/১৯০০ এর অধীন রচিত পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইনের ধারা নং ৭ বলে গোটা পর্বতাঞ্চলের ফৌজদারী, দেওয়ানী রাজস্ব ও সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়াদির দায়িত্ব, জেলা প্রশাসক বা প্রশাসকদের উপর ন্যস্ত, এবং তিনি/তারা জেলা হাকিম ও বটে। ধারা ৫/৬ অনুযায়ী তিনি/তারা জেলা প্রশাসক নিযুক্ত হোন। ধারা ১৮ এর অধীন রচিত উপধারা সমূহ তার বা তাদের ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করেছে। এই সাথে ধারা ১৮ (২) ঘ এর অধীন রচিত পার্বত্য শাসন বিধি নং ৩৪ এবং তার উপধারা সমূহ, পর্বতাঞ্চলের সমুদয় বন্দোবস্তি, হস্তান্তর, নাম জারি, ও তত্ত্বাবধানের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা জেলা প্রশাসকদের দান করেছে। তিনি বা তারা এই ক্ষমতা প্রয়োগের সহায়ক রূপে ধারা ৪৮ বলে মৌজা প্রধান হেডম্যান নিযুক্ত করে থাকেন। ধারা ৪৭ বলে, তিন সার্কেল প্রধান বা চীফ, নিজেদের আবাস ক্ষেত্রাধীন সদর মৌজার হেডম্যান নিযুক্ত হোন। হেডম্যানদের নিযুক্তি ও বরখাস্তের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা জেলা প্রমসকদের হাতে ন্যস্ত। তারা প্রশাসনের ব্যাপারে চীফদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কাছে বাধ্য নন। ধারা ৩৮ বলে চীফ ও হেডম্যানদের দায়িত্ব হলো ঃ জেলা প্রশাসকদের পক্ষে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের তথ্য দান, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, জেলা প্রশাসকদের আদেশ নিষেধ জনসাধারনের মাঝে ত্বরিতগতিতে কার্যকর করা, রাজস্ব আদায়, শিক্ষা বিস্তার জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও বৈষয়িক উন্নয়নে প্রভাব খাটান এবং জেলা প্রশাসকদের আদেশ পালন করা। গ্রামাঞ্চল ও জনসাধারণের মাঝে কোনরূপ পরিবর্তন বা চাষাবাদ সংক্রান্ত বিরূপতা দেখা দিলে তা জেলা প্রশাসকদের অবহিতকরণ। তারা নিজ নিজ এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় ও নিয়োজিত হন এবং উপজাতীয়দের সামাজিক বিচার সম্পাদন করাও তাদের দায়িত্ব (যথা ঃ ধারা নং ৪০) তবে এই সামাজিক বিচারেও পুনর্বিচারের ক্ষমতা জেলা প্রশাসকদের হাতে ন্যস্ত। এই আইনগত প্রাধান্যের কারণে জেলা প্রশাসকেরাই তিন পার্বত্য জেলার প্রধান কর্তৃপক্ষ। প্রশাসকরূপী আমলা হওয়ার পাশাপাশি তারা জেলা দেওয়ানী আদালতের

বিচারক ও সরকার নিযুক্ত প্রতিনিধিও বটে। তাদের দেওয়ানী ক্ষমতা, তিন পার্বত্য জেলার সমুদয় জায়গা জমি সম্পদ সম্পত্তি ও রাজস্ব বিষয়াদির উপর ন্যস্ত। তারা এতদাঞ্চলীয় সমুদয় বৈষয়িক বিরোধ বিসম্বাদ নিজেদের বিচারাধীন করে নিতে পারেন। তখন ভুমি কমিশনের কিছুই করনীয় থাকবে না। এটি তাদের সুয়োমটো বা স্বপ্রণোদিত ক্ষমতা।

জেলা পরিষদ আইনের ধারা নং ৬৪ স্বঘোষিত প্রধান আইন। তাতে বলা হয়েছে ঃ 'অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন-' এই বক্তব্য হাস্যকর। ভূমি কমিশন সংক্রান্ত চুক্তির বক্তব্যেও বলা হয়েছে ঃ 'এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল করা যাইবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।' এতে বলা যায়, বাংলাদেশ সংবিধানের বিপরীতে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিপরীতে পার্বত্য ভূমি কমিশনের প্রাধান্য থাকা, পাগলামী ছাড়া কিছু নয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৭ (২) এর বক্তব্য হলোঃ

জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসমাঞ্জস্যপুর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।

অনুরূপভাবে সুপ্রীম কোর্টের সুপ্রিমেসি নিয়ে ও সংবিধানিক বক্তব্য হলো ঃ

অনুচ্ছেদ নং ৯৪ (১) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ লইয়া তাহা গঠিত হইবে।

অনুচ্ছেদ নং ১০২। (১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের (মৌলিক অধিকার) দ্বারা অর্পিত অধিকার সমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাই কোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন।

সুতরাং পার্বত্য পরিষদ আইনকে সর্বোচ্চ আইনের মর্যাদা প্রদান এবং ভূমি কমিশনকে সর্বোচ্চ স্বাধীন আদালতের ক্ষমতা দান, হাস্যস্পদ ব্যাপার। বাস্তবে এসব হলো ঠুনকো নিম্নস্তরের আইন, এবং ভূমি কমিশনটিও স্বাধীন সর্বোচ্চ স্থায়ী আদালত নয়। সুপ্রীম কোর্টে ভূমি কমিশনের রোয়েদাদ অবশ্যই আপিল যোগ্য। এর গঠন ভিত্তি, পার্বত্য চুক্তি, আর পরিষদীয় আইনগুলোর দোষ ত্রুটিও চ্যালেঞ্জযোগ্য। উপজাতিদের পক্ষে প্রবোধমূলক পক্ষপাতিত্ব ও বক্তব্য, বর্ণিত চুক্তি ও আইন সমূহে

ঠাসা, যা সাধারণ অউপজাতীয় লোকদের পক্ষে ক্ষোভ ও উদ্বেগের কারণ, এবং এটি অবশ্যই হাইকোর্টে রীট আবেদনের উদ্ভব ঘটাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালী বসতি স্থাপন সরকারেরই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফল। খাস জমিতেই সরকারীভাবে ভূমি দানের ঘটনা ঘটেছে। এখন তাতে উপজাতীয় অধিকারের উদ্ভব ঘটা রহস্যজনক। যদি কোন উপজাতীয় লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে সরকারীভাবে ভুলক্রমে বাঙ্গালী আবাসন ঘটে থাকে, তা হবে বিচ্ছিন্ন সরকারী ভুল ও অপরাধ। তজ্জন্য আবাসিত বাঙ্গালী পক্ষকে দায়ী করা ভুল।
গোটা পার্বত্য অঞ্চলকে পরিষদভুক্ত করে চুক্তি ও আইন রচিত হয়নি। জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবী নামায়, গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম অন্তর্ভুক্ত নয়। জেলা পরিষদ আইনের ৬৪ ধারাতে গোটা পার্বত্য অঞ্চলকে তিন জেলা পরিষদের এখতিয়ারভুক্ত করা হয়নি। আবাসিত বাঙ্গালীদের বৃহদাংশ পরিষদের আওতা মুক্ত, জাতীয় এলাকার বাসিন্দা। জনসংহতি সমিতি নিজেও দাবী করেছে ঃ সরকারী বা জাতীয় এলাকা এবং পরিষদভুক্ত এলাকার ভাগ বাটোয়ারা সম্পন্ন করা হোক যথা দাবী নং ২ (৫) খ । তাতে এই বিভ্রান্তি মিটে যাবে যে, উল্লেখযোগ্য এলাকা ও বাঙ্গালী বাসিন্দারা বাস্তবে পরিষদ থেকে মুক্ত এবং জেলা পরিষদের ভূমি সংক্রান্ত পুর্বানুমোদন এবং উপজাতীয় অগ্রাধিকার সর্বত্র প্রযোজ্য নয়।

চুক্তি হয়েছে। এখন এখতিয়ার ভূক্ত এলাকার নির্দিষ্ট করণ সহ তার বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। এখন আর লাভ ক্ষতির কথা চিন্তা করে পিছু হটা বা বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নয়। চুক্তি বাস্তবায়ন পর্যায়ে ক্ষোভ অসন্তোষ প্রদর্শনের সুযোগ নেই। এখতিয়ারের সীমা সরহদ আর পাওয়ার ক্ষেত্র সুখকর কি না তা নিয়েই বাবা অথবা ভাবতে দেয়া উচিত। প্রকৃত হিসাবে সরকারের পক্ষেই পাল্লা ভারি। এখানে একথা ভাবার সুযোগ নেই যে, প্রশাসনিক এলাকার খন্ডিতাংশ নিয়ে জেলা পরিষদ স্থাপিত হলে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৫৯ লঙ্ঘিত হয়। তা হলে পরিষদীয় বিধানটাই অসাংবিধানিক হয়ে যায়।

পরিষদের ভূমি এলাকা বাস্তবে গোটা পর্বত্যাঞ্চলের এক দশমাংশের বেশি নয়। চুক্তিতে বলা হয়েছেঃ

'তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূউপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত জমির ক্ষেত্রে এই (পূর্বানুমোদন) বিধান প্রযোজ্য হইবে না। (সূত্র ঃ জেলা পরিষদ আইন ধারা নং-৬৪)
এখানে উল্লেখিত বাক্যাংশঃ সরকারের নামে রেকর্ডকৃত জমির অর্থ ব্যাপক। এর ভিতর কণফুলী হ্রদ এলাকা, প্রশাসনিক দপ্তর এলাকা রিজার্ভ ফরেস্ট ও আন ক্লাসড স্টেট ফরেষ্ট এলাকাও পড়ে। সুতরাং ৯০% পার্বত্যাঞ্চল সরকারী বা জেলা

প্রশাসকদের এখতিয়ারে নিশ্চিত ভাবেই থাকে। পরিষদ অঞ্চল ১০% এর বেশি হয় না।

১০
(তাং-সোমবার ২২ কার্তিক ১৪০৭ বাংলা ৬ নভেম্বর ২০০০ খ্রী/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

পর্বতাঞ্চল নিয়ে সরকারের রাখ ঢাক বেদনা দায়ক। সন্তু বাবুদের হুমকি ধমকি এক টানা বর্ষিত হচ্ছে, তবু কর্তারা চুপ। এর কারণ কি এটাই যে, সন্তু বাবুরা জং জেহাদে ঝাপিয়ে পড়ে আবার দেশটাকে উৎসন্নে নিক্ষেপ করবেন সে ভয়। অথবা কারণ এটাই যে, চুক্তিতে মাত্রাতিরিক্ত ছাড় দেয়া হয়েছে, যা বাস্তবে মস্ত বড় ভুল, সুতরাং পিছু টান। প্রকাশ্যে ভুল স্বীকার করা ও যায় না, চুক্তি বাস্তবায়নটাও ঠেকান বিব্রতকর। এই উভয় সংকটে সরকার দোটানায় অস্থির। তাই কখনো চুপ, কখনো ক্ষীণ কণ্ঠে সরব। হ্যাঁ চুক্তি বাস্তবায়ন হবে, হচ্ছে, এবং ৮০% বাস্তবায়ন তো হয়েই গেছে। এ সব দুর্বল অভিব্যক্তি। আসলে চুক্তি ও আইনে উপজাতীয় পক্ষ যে কোণঠাসা সে রহস্য উদ্ঘাটনে তারা অক্ষম।

এ কথাও প্রকাশ্যে জোর গলায় বলে দেয়া উচিতঃ চুক্তিতে তত্ব ও অথ্যগত অনেক ভুল হয়ে গেছে, যে জন্য উভয় পক্ষ দায়ী। এহেতু উভয় পক্ষকে পুনরায় সংশোধিত চুক্তিতে উপনীত হতে হবে। ভুলগুলো হচ্ছে ঃ

ক) প্রকাসনিক ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন ইউনিট নয়। সুতরাং হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল ও সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে, স্থানীয় শাসনের ক্ষমতায় আঞ্চলিক পরিষদ গঠন বেআইনী।

খ) বাংলাদেশ ইউনিটারী ষ্টেট। এটি রাজনৈতিক বিভাগ মুক্ত। আঞ্চলিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দান বা স্বায়ত্তশান ক্ষমতা দান, যুক্তরাষ্ট্রীয় বা ফেডারেল ব্যবস্থাধীন বিষয়। সুতরাং সংবিধানের ১ ও ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুসারেও আঞ্চলিক পরিষদ গঠন বে-আইনী। হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলে তিন পার্বত্য জেলার স্বীকৃতি নেই, সুতরাং জেলা পরিষদও আইনসঙ্গত নয়।

যেহেতু সশস্ত্র সংঘাতের অবসান ও শান্তি কাম্য, তাই সরকার জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দের দাবী গুলোকে নমনীয় ভাবে বিবেচনা করেছেন এবং এটাও বিবেচনাধীন ছিলো যে, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ, বাস্তবতার আলোকে দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন করবেন, এবং তত্ব তথ্য ও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে রাজী হবেন। সরকারের এই আশাবাদের পক্ষে যুক্তি হলো ঃ চুক্তিকালে বিদ্রোহী পক্ষ তাদের পাঁচ দফা দাবী নামার প্রথম দফায় ব্যক্ত, সংবিধান সংশোধন পূর্বক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবীটি, হুবহু অর্জনের প্রতি অনড় ছিলেন না। কারণ তাদের জানা ছিলো ঃ সংবিধান সংশোধনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংসদীয় সংখ্যা

গরিষ্ঠতা সরকারের নেই। সুতরাং এ দাবীতে অনড় থাকা মানে চুক্তি না হওয়া। তবু আঞ্চলিক পরিষদ গঠন একটি মুখরক্ষা মূলক ব্যবস্থা। সম্ভাব্য রিট মামলায় সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা বাতিল হওয়ার আগে, উভয় পক্ষকে আবার এই মুখ রক্ষার চুক্তিতে উপনীত হতে হবে যে, চুক্তি থেকে আঞ্চলিক পরিষদ ব্যবস্থা বাদ দেয়া হলো।
এ কথাও প্রকাশ্যে বলে ভূল স্বীকার করতে হবে যে, গোটা পার্বত্য এলাকা বিরোধীর অঞ্চল নয়। পার্বত্য জেলা পরিষদের এখতিয়ার জাতীয় অঞ্চলের উপর প্রযোজ্য নয়। এ হিসেবে ভূমি কমিশনের এখতিয়ার থেকেও জাতীয় এলাকা মুক্ত। জরিপের মাধ্যমে জাতীয় আর পরিষদীয় এলাকার সীমা নির্ধারণ হওয়া ছাড়া, ঢালাও বাঙ্গালখেদা আন্দোলন আর উপজাতীয় অধিকার প্রয়োগ বেআইনী। সুতরাং চুক্তি ও আইনে নিম্নোক্ত সংশোধনী আনা প্রয়োজন।
ক) জরিপের মাধ্যম জাতীয় ও পরিষদীয় এলাকা নির্ধারন ও নির্দিষ্ট করা হবে। নির্দিষ্ট নিজস্ব এলাকা নিয়েই পরিষদ গঠিত ও পরিচালিত হবে। ভূমি কমিশনও তাতে সীমাবদ্ধ থাকবে, এবং পরিষদীয় এলাকা নিয়ে পৃথক প্রশাসনিক জেলা ইউনিট গঠিত হবে।

খ) সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিধানাবলী যথাযথ পালিত হবে। জেলা পরিষদ আইনকে তার সাথে সামঞ্জস্য শীল করা হবে।
গ) জেলা পরিষদ বহির্ভূত জাতীয় অঞ্চল হবে, সার্বজনীন মুক্তাঞ্চল ও সর্বতঃভাবে উপজাতীয় হস্তক্ষেপ মুক্ত। তাতে কারো কোন অগ্রাধিকার কোটা ও পদ সংরক্ষণ প্রযোজ্য হবে না। নির্বাচনে মনোনয়ন মান্য হবে।
ঘ) সাম্প্রদায়িক মিশ্র জনবসতি অক্ষুণ্ন থাকবে।
ঙ) জন প্রতিনিধিত্ব হবে বাধা হীন অবাধ ও সংরক্ষণ মুক্ত। অবাধ গণতন্ত্রই হবে চর্চনীয় ও ক্ষমতা লাভের মাধ্যম।

এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দ, পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তুলছেন। সর্বত্র চাঁদাবাজি, অপহরণ, খুন ও উৎপীড়ণ চলছে। সন্তু বাবু চুক্তি বহির্ভূত বিষয় বাঙ্গালী প্রত্যাহারের জেদ ও তাদের ভোটাধিকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ অব্যাহত রেখেছেন। এতে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা ও হিংসা পূর্ণ মনোবৃত্তিরই প্রকাশ ঘটছে।

গোটা পর্বতাঞ্চল উপজাতীয় জমিদারী নয়। এটি বাঙ্গালীর ও স্বদেশ ভূমি। এখানে উভয় জনগোষ্ঠী আছে ও থাকবে। কেউ কারো করুনার পাত্র বা অধীনস্থ প্রজা এ ধারণা ভুল। সন্তু বাবুদের উগ্র কথা বার্তায় কৌতুকই জাগে। এটি শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানের সুলক্ষণ নয়।
বাস্তবতাকে সন্তু বাবুরা অবহেলা করছেন। বাঙ্গালীদের আরাকান ও আসাম থেকে বিতাড়ন সম্ভব হয়নি। স্বদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে তাদের বিতাড়ন করা যাবে, এ কথা কেবল অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি মাত্র আশা করতে পারে।

হিসাব অনুসারে পার্বত্য অঞ্চলের ৪৬৫২.৯৬ বর্গ মাইল এলাকা জাতীয় সম্পত্তি। তাতে বনায়ন, বসতি স্থাপন, বন্দোবস্তি ও ইজারাদান শিল্প স্থাপন ইত্যাদি কাজে সরকারের অবাধ অধিকার বিদ্যমান। এতে কারো আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। আপত্তি কারীদের তাতে কোন ভূম্যাধিকারও নেই। এ কথাটি পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতে বাধা নেই। তা না করাতে সন্দেহ হয় ঃ সরকার সম্ভবতঃ নিজ ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে গভীরভাবে সন্দিহান, অথবা পর্বতাঞ্চল ও চুক্তিসম্বন্ধে অজ্ঞ।

সরকার আগে পার্বত্য বিষয়াদি ও চুক্তি তলিয়ে দেখুন। চুক্তির সীমারেখা অধিকার ও ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হোন। সমস্যা সমাধানে অক্ষমতায় পার্বত্য বিষয়াদি কোল্ড ষ্টোরেজে চিরদিনের জন্য ভরে রাখা সমীচীন নয়।

সন্তু বাবু তো বলেই দিয়েছেন ঃ পুরাতন কর্মসূচীতে ফিরে যাবেন। এই হুমকির পাশাপাশি সরকারের প্রতিমন্ত্রীর পদ মর্যাদাও সুযোগ-সুবিধা ভোগ এই বিদ্রোহী ব্যক্তির পক্ষে বেমানান। তবু এই পদে তাকে রাখা ও গালি খাওয়া নিরেট তোয়াজ। সরকার এমন গো বেচারা, ভাবতে বিস্ময় লাগে। তাকে চুক্তির অর্থ বোঝান আবশ্যক।

১১

(তাং-বুধবার ১ অগ্রাহায়ন ১৪০৭ বাংলা, ১৫ নভেম্বর ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

এটা বিস্ময়কর যে,উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ গোটা পর্বতাঞ্চলেই নিজেদের ভুম্যাধিকার দাবী করছেন। অথচ বৈধ ভুম্যাধিকারের পক্ষে লীজ ও বন্দোবস্তি থাকা প্রয়োজন, যা তাদের অধিকাংশের নেই। অধিকন্তু বাঙ্গালীদের বন্দোবস্তিকেও তারা অবৈধ বলে দাবী করছেন। হেডম্যানদের প্রাথমিক পত্তন দান তখনই বৈধ হয়, যখন তা জেলা প্রশাসক থেকে বন্দোবস্তি বা ইজারা নেয়া হয়। খাজনা সালামী প্রদান ছাড়া, বন্দোবস্তি আর ইজারার বৈধতা স্থায়ী হয় না। কোন লা-খেরাজ বা নিষ্কর সম্পত্তির পক্ষেও বন্দোবস্তি দলিল থাকা জরুরী। পর্বতাঞ্চলে প্রতি মৌজায় সার্ভিস ল্যান্ড বা সেবা সম্পত্তিরূপে পঞ্চাশ একর জমি নির্দিষ্ট আছে যা হেডম্যানদের নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। হেডম্যানরা খাস জমি ও বন পাহাড়ের তত্ত্বাবধায়ক। চীফ. হেডম্যান কারবারী ও বাজার চৌধুরীরা মাসোহারাভোগী গ্রাম্য কর্মকর্তা ধরণের সরকারী রাজস্ব এজেন্ট। তারা সরকারী কর্মকর্তা বা জমিদার নন। তাই সার্কেল মৌজা ও বাজার সমূহ তাদের জমিদারী সম্পত্তি নয়। তারা প্রধানতঃ জুম খাজনা ও বাজার রাজস্ব উশোল ও জমাদানের ক্ষমতা প্রাপ্ত, কমিশন ও মাসোহারা ভোগী বেসরকারী কর্মকর্তা। কমিশনের ভিত্তিতে ভূমি রাজস্ব আদায়, জমাদান ও উপজাতীয় সামাজিক বিচার সালিশ করা ও তাদের দায়িত্ব। জুম খাজনা ভূমি রাজস্ব নয়। আসলে জুম চাষ অবৈধ। এবং জুমভূমি বিশুদ্ধ সরকারী সম্পত্তি। জুম চাষের জন্য সংশ্লিষ্ট চাষী খাস পাহাড় ও বনকে ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচন করে, এবং ঐ বেআইনী কাজটির জন্য সে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। সে ঐ জুম ভূমির জন্য কোন খাজনা দেয় না। তার

পরিশোধিত জুম কর পারিবারিক দায়। জুম ভূমিটিও নির্দিষ্ট হয় না, এবং তা ভোগকারী চাষীর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও জুম চাষে বাধা দান, এবং তজ্জন্য কাউকে অভিযুক্ত ও করা হয় না। কারণ বিপুল সংখ্যক উপজাতীয় গরীব লোক তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য এ পেশার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। তারা লাঙ্গল চাষ, মজুরী ও ব্যবসায়িক কাজেও অভ্যস্ত নয়। সরকার তাদের এই অসহায়তার প্রতি সহানুভূতিশীল। সুতরাং অবৈধ জুম চাষ করতে দেয়া একটি উদারতা। এটি সম্পদ ও পরিবেশ ধ্বংসকারী গুরুতর অপরাধের কাজ বলে তবুও গণ্য।

এই উদারতাকে পুঁজি করে এখন দাবী করা হচ্ছে, জুম ভূমি উপজাতিদের দখলাধীন সামাজিক সম্পত্তি। হোক খাস, তবু তা উপজাতিদের জন্য নির্দিষ্ট । বিনা বন্দোবস্তিতে উপজাতিরা চিরকাল তা ভোগ দখল করে আসছে এবং তাতেই তাদের উক্ত জমিজমার উপর অবাধ অধিকার বর্তেছে। এটা এক অলজ্ঘনীয় ঐতিহ্য। এর কোন ভিন্নতা হতে পারে না। কোন ভিন্ন সম্প্রদায়কে তা বন্দোবস্তি বা ইজারা দান বা অন্য কোন ভিন্ন উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার, পাহাড়ীদের জীবন ও জীবিকার উপর হস্তক্ষেপের শামিল। অন্য কারো দ্বারা বন করা, বাগান করা, শিল্প গড়া, বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার পাহাড়ী স্বার্থের বিরোধী। এ হল একদল সংখ্যালঘু উপজাতীয় লোকের সম্মিলিতভাবে আইন অমান্য ও একগোয়ে আচরণ করার পক্ষে যুক্তি। বিষয়টি স্পর্শকাতর ও জটিল।

গোটা কয়েক ব্যতিক্রম বাদে বাজার, মৌজা ও সার্কেলগুলো উপজাতীয় বাজার চৌধুরী, কারবারী, হেডম্যান ও চীফদের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত। এ হলো প্রচলিত আইন হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল সৃষ্ট ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা। যদিও মূল ভূমি প্রশাসন ডেপুটি কমিশনারদের দায়িত্ব এবং তাঁদের পক্ষে চীফ, হেডম্যান, কারবারী ও বাজার চৌধুরীরা মাসোহারা ও কমিশন ভোগীএজেন্ট মাত্র। তবু এই ঠুনকো ক্ষমতার বলে চীফ হেডম্যান, কারবার্রী ও বাজার চৌধুরীরা আপনা আপনি সর্বেসর্বা কর্তা । এ কারণেই পাহাড়ীদের ধারণাঃ পার্বত্য অঞ্চলের জায়গা জমিতে তাদের অধিকার ও কর্তৃত্ব ঐতিহ্য ভিত্তিক।

ভূমি প্রশাসনকে এই কোটারীর কবল থেকে মুক্ত করা না হলে, সরকারী কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপিত হবে না, এবং তার একমাত্র উপায় হলো পরিপূর্ণ সরকারী তহসিলদারী ব্যবস্থার প্রবর্তন। তজ্জন্য প্রযোজন ঃ হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের দ্বারা প্রবর্তিত চীফ শীপ ও হেডম্যান প্রথার অবসান। ভূমি প্রশাসন দায়িত্বে তহসিলদার ও খরিদ বিক্রিতে রেজিষ্টার নিযুক্ত করা হলে, গোটা পার্বত্য ভূমি নিয়ন্ত্রণ নিরুপদ্রব হবে। পার্বত্য শাসন আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায়, প্রয়োজনীয় সংশোধনি এনে তা সহজেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এমনি এই আইনে বহু সংশোধনি এসেছে। রহিত করন আইন প্রণয়ন করেও পার্বত্য শাসন আইনটি বহাল রাখা হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় আইনটি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে তাকে

যুগোপযোগী ও প্রয়োজনীয় লক্ষ্য সম্পন্ন করা হোক।

পাকিস্তান আমলের শুরুতে পঞ্চাশের দশকে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের চীফ শীপ ও হেডম্যান প্রথা জমিদারী না হলেও অবশ্যই তদ্রুপ সামন্তীয় ব্যবস্থা। এখানে জমির মালিক সরকার, তবে তার খাজনার একাংশের ভাগিদার হলেন চীফ হেডম্যান, বাজার চৌধুরী ও কারবারীরা। জুম করের ৮০%ই তাদের প্রাপ্য, যা সামন্ত ব্যবস্থা। এটা বজায় রাখা মানে উপজাতীয় অভিজাত শ্রেণীকে ভূমির সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাখা, এবং জুমিয়াদের তাদের প্রজায় পরিণত করা। এটা স্বাধীনতার পরিপন্থী

চীফ ও হেডম্যানেরা খাস জমি জমাকে বেসরকারীভাবে পত্তন দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তার বদলা ব্যক্তিগত নজরানা ও সালামী আদায় করে থাকেন, যার অংশ বিশেষ ও সরকারী তহবিলে জমা হয় না। খাস জমি বন ও পাহাড়ে উৎপাদিত প্রাকৃতিক পণ্যাদি আহরণ ও খরিদ বিক্রির খবরদারীতে ও তাদের বিস্তর অবৈধ আয় রোজগার হয়ে থাকে। সামাজিক বিচারে আরোপিত নগদ জরিমানায় ও তাদের ভাগ প্রাপ্য। এ হলো আইনের মাধ্যমে আরোপিত অন্যায় সুযোগ-সুবিধা লাভের উদাহরণ। স্বাধীন দেশে এগুলো অচল।

(তাং-শুক্রবার ১০ অগ্রহায়ন ১৪০৭ বাংলা, ২৪ নভেম্বর ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

সামগ্রিকভাবে পর্বতাঞ্চলের ভূমি জরিপ না হলেও, বন্দোবস্তি সুত্রে কিছু জায়গা জমি, কর্ণফুলী হ্রদের দ্বারা প্লাবিত এলাকা, এবং ১৯৬৪ সালে কানাডার ফরেস্টল ফরেষ্টরী এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারনেশনেল লিমিটেড কর্তৃক অনুষ্ঠিত আংশিক জরিপের মাধ্যমে, কিছু তথ্য লাভ করা গেছে। দেখা যায় ফুর্ণফুলী হ্রদের প্রভাবিত অঞ্চল হলো ২৫৬ বর্গমাইল বা ১৬৩৮৪০ একর। তন্মধ্যে ৫৪০০০ একর কৃষি জমিও অন্তর্ভুক্ত। বলা হয়ে থাকে ঐ নিমজ্জিত কৃষি জমি হলো গোটা পার্বত্য কৃষি জমির ৪০% এবং এ জমির মালিকও ভোগ দখলকার কৃষক পরিবার সংখ্যায় ১০,০০০ এবং তধোতিরিক্ত ক্ষতিগ্রস্ত জুমিয়া পরিবার ৮০০০।

গত পঞ্চাশের দশকে গোটা পার্বত্য অঞ্চলে বন্দোবস্তিভুক্ত মোট জমির পরিমাণ ছিলো ৪০০০ একর মাত্র এবং তারও ২০০০ একর একা মাং সর্দারের বন্দোবস্তিভুক্ত নিজস্ব জমি। এটা প্লেনিং বোর্ডের পদত্ত হিসাব, যা প্রফেসার পিয়ের বেসানেত লিখিত পুস্তক ট্রাইবস ম্যান ওফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস-এ লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং অবশিষ্ট দু'হাজার একর বন্দেবাস্তিভুক্ত জমি মাত্র ব্যক্তিগত বৈধ সম্পত্তির পর্যায়ে পড়ে। আবার প্রকৃত লাঙ্গল চাষী হওয়ার সুত্রে অধিকাংশ সমতল কৃষি জমি বাঙ্গালীদের চাষাধীন ছিলো, এবং তারা ছিলো বৈধ বন্দোবস্তিধারী, অথবা পাহাড়ী মালিকের বর্গাদার চাষী। কারণ অধিকাংশ পাহাড়ী লাঙ্গল চাষে অভ্যস্ত ছিলো না।

প্রশাসনিক রাজনৈতিক ও সংখ্যাগত আধিপত্যের কারণে পাহাড়ীরা স্থানীয় জায়গা জমির উপর বন্দোবস্তি হীন দখলাধিকার বিস্তার করে ছিলেন। সার্কেল প্রধান, মৌজা প্রধান, পাড়া প্রধান ও বাজার চৌধুরীদের ৯৯% পাহাড়ী হওয়া, এবং তাদের হাতে প্রাথমিক ভুমি প্রশাসন ন্যস্ত থাকায় পাহাড়ীরা পছন্দসই জায়গাজমিতে বন্দোবস্তি বহির্ভুত দখলাধিকার বিস্তারের সুযোগ পেয়েছেন। সরকার ও এ কারণে হেডম্যানদের প্রাথমিক পত্তন দানের ক্ষমতা দান করেন যে, সহজে জমি পেলে জুমিয়ারা ক্ষতিকর জুম পেশার বিকল্প রূপে হাল কৃষিতে উৎসাহিত হবে। কিন্তু সরকারের এই শুভেচ্ছা এ কারণে ব্যর্থ হয় যে, হেডম্যান কার্বারী ও চীফদের আয় রোজগার ও ক্ষমতার উৎস হলো জুম কৃষি। তাই তারা তৎ প্রতি অধিক উৎসাহী ছিলেন। ফলে একই সাথে জুম চাষ ও সমতল কৃষি জমি দখলের প্রক্রিয়া চলেছে। যেহেতু হেডম্যান পত্তন দিয়েছেন এবং জমির উপর বাধাহীন ভোগাধিকার বর্তে গেছে, তাই জেলা বা মহকুমা প্রশাসন থেকে চূড়ান্ত বন্দোবস্তি গ্রহণকে কেউই জুরুরী মনে করেনি। বন্দোবস্তি হীন ও খাজনা সালামী পরিশোধবিহীন এরূপ জমিতে তবু আইনানুগ ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং কার্যতঃ ঐ জমি সরকারের খাস সম্পত্তির অন্তর্ভুক্তই থেকে গেছে। এসব জায়গা জমি অঘোষিতভাবে পাহাড়ীদের লাখেরাজ বা নিস্কর সম্পত্তিও নয়। অতীতের সেই সরকারী উদারতারই পরিণাম ফল হলো পাহাড়ীদের এ দাবীঃ গোটা পার্বত্য অঞ্চলই জুম্ম জাতির নিজস্ব সম্পত্তি। এর বিপরীতে সরকার কখনো বলেনি যে, আসলে এটি খাস ও বন আইনে ঘোষিত রাষ্ট্রীয় বন, মৌখিক আখ্যায়িত সরকারী সম্পত্তি মাত্র নয়। ১৮৬৫ সালের এক্ট নং ৭ ধারা নং ২ বলে বৈধভাবে ঘোষিত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলটি কঠোরভাবে সংরক্ষিত হয়নি, এবং এর প্রশাসন বন বিভাগের হাতে হস্তান্তরিত না হয়ে, সাধারণ প্রশাসনের হাতেই রাখা হয়। ফলে এটি শিথিলভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ডেপুটি কমিশনাররা দীর্ঘকাল এই অঞ্চলের বনজ সম্পদ আহরণের পারমিট ও জায়গা জমির লীজ ও বন্দোবস্তি প্রদান করে এসেছেন, এবং বাধা না দেয়ায় জুমিয়ারাও তাতে অবাধে জুম চাষ করেছে। যেহেতু সংরক্ষিত আর রাষ্ট্রীয় বনের বাহিরে অতিরিক্ত কোন আবাদযোগ্য জমি অবশিষ্ট ছিলো না, সেহেতু ভূমিহীন পাহাড়ীদের বাড়ি ঘরের প্রয়োজন মেটাতে তাদের দ্বারা তিরিশ শতক গ্রাম্য খাস জমি বিনা বন্দোবস্তিতে ভোগ দখলের ছাড় মঞ্জুর করা হয়। এই শৈথিল্যের ফলে রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলের অনাবাদ-যোগ্যতা কঠোরভাবে মানা হয়নি। এহেতু এখন কাগজে কলমেই মাত্র রাষ্ট্রীয় বনের অস্তিত্ব বিদ্যমান। অধিকন্তু বনাভ্যন্তরের অধিকাংশ আবাদী অঞ্চল আনুষ্ঠানিকভাবে বন থেকে অবমুক্ত হয়নি। তা করতে হলে ১৮৬৫ সালের এক্ট নং ৭ এর ধারা নং ২ এর উপর সংশোধনী আনতে হবে। এটি প্রচলিত আইন হিসাবে এখনো কার্যকর আছে বলে, ভিন্ন কোন উপায়ে পত্তনকৃত গ্রামাঞ্চলকে রাষ্ট্রীয় বন থেকে অবমুক্ত করা সম্ভব নয়। যারা জুম ভূমির দাবীতে গোটা পর্বতাঞ্চলকে জুমিয়াদের জাতীয় ভূমি বলে দাবী করেন, তারা এ কথাটি অবহেলা করেন যে, আসলে জুম চাষটাই বে আইনী। সে স্থলে জুম ভূমির সংস্থানই আইনসঙ্গত নয়। হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের অনেক

অপ্রয়োজনীয় ধারাই বাতিল ও রহিত হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি জুম নিয়ন্ত্রণ মূলক ধারা নং ৪১ ও ৪১ (এ) কার্যকর আছে এবং তা আমলযোগ্য।

কর্ণফুলী হ্রদের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনে পঞ্চাশের দশকে মাত্র ৪৫৯.০৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা বনমুক্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট আবাদী অঞ্চল এখনো কাগজে পত্রে বন হয়ে আছে। বন থেকে অবমুক্তির আদেশ ছাড়াই সমুদয় গ্রামাঞ্চল অনানুষ্ঠানিক বনমুক্ত এলাকা। এর বাসিন্দাদের মাঝে যাদের লীজ বা বন্দোবস্তি দলিল আছে, একমাত্র তারাই বৈধ বাসিন্দা। বাদ বাকি সবাই অবৈধ দখলদার। এই দখল পুরুষানুক্রমিক হলেও তা বৈধ বলে স্বীকার্য নয়। সুতরাং জুমিয়াদের তো বটেই, অন্য অনেকেরও সরকারী খাস বনভুক্ত বাড়িঘর জায়গা জমি বাগান ও খামার ইত্যাদিতে মালিকানার দাবী ভিত্তিহীন। এরা সবাই জবর দখলদার বাসিন্দা আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য।

১৩

(তাং-রোববার ১২ অগ্রহায়ন ১৪০৭ বাংলা/২৬ নভেম্বর ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

এটা ভুল কথা যে কর্ণফুলী হ্রদের দ্বারা পার্বত্য অঞ্চলের মোট কৃষি ভূমির ৪০% ডুবে গেছে, যার পরিমান ৫৪০০০ একর। এই বেদনাদায়ক তথ্যটির উদৃতি অহরহ সর্বত্র দেয়া হয়। কিন্তু এটা আরো অধিক বেদনাদায়ক যে, গুণীজনেরা এর সারবত্তা খুঁজে দেখেন না।

ভূমির প্রকৃতি অনুযায়ী কৃষি পদ্ধতি অবলম্বিন হয়। যে জমি সমতল তাতে হাল কৃষির মাধ্যমে ধান রবিশস্য ও তরিতরকারী ফলান হয়। টিলা জমিতে ফল মূলের বাগান, বনায়ন, পশু পাখী পালন, তরিতরকারী উৎপাদন ইত্যাদি কৃষি কাজ হয়। খাড়া পাহাড়ের উপযোগী চাষ হলো, বনায়ন, পশু পালন এবং খাদে বাঁধের সাহায্যে পানি আটকিয়ে মৎস্য চাষ। সুতরাং কেবল সমতল ধান্য জমিটাই কৃষি জমি নয়। পাহাড় ও সমতল নির্বিশেষে সব জমিকেই কৃষি জমি বলা সঙ্গত। আজকাল পাহাড়ে ধাপ কেটে ধান চাষ করা হচ্ছে। এবং এই পার্বত্য অঞ্চলেও অবলম্বিত অন্যতম চাষ পদ্ধতি এটি। পাহাড় সমতল টিলাও খাদ মিলে লক্ষ লক্ষ একর জমি এতদাঞ্চলে বিদ্যমান। কেবল সমতল ধান্য জমিকেই কৃষি জমি বলা ভুল।

এটা হতে পারে যে ঐ পঞ্চাশের দশকে মোট আবাদকৃত জমির ৪০% সমতল ভূমি যা পরিমানে ৫৪০০০ একর, কর্ণফুলী হ্রদে নিমজ্জিত হয়েছে, এবং তখন কৃষি কাজ ছিলো সমতলে কেবল ধান ও রবি শস্য চাষেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং এ বলা অতিশয়োক্তি যে, ৪০% পার্বত্য কৃষি জমি কর্ণফুলী হ্রদে নিমজ্জিত হয়েছে, এবং সাথে সাথে এ কথাও ভাবা দরকার যে, সে জমির বৃহদাংশ ছিলো খাস সরকারী সম্পত্তি। সারা জেলায় স্থায়ী বন্দোবস্তিভুক্ত জমি ছিলো মাত্র চার হাজার একর।

কানাডার ফরেষ্টল ফরেষ্ট্রি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারনেশনেল লিমিটেডের জরিপ রিপোর্ট হলো ঃ

সংরক্ষিত বনাঞ্চল বহির্ভুত মোট জমি ২৩ লাখ, ৫৯ হাজার ৯৭৬ একর। জমির প্রকৃতি অনুযায়ী পাঁচটি শ্রেণীতে তা বিভক্ত। 'এ' শ্রেণীতে পড়ে ৩.২% জমি, যা সমতল কৃষি জমি ও খাস। 'এ'+'বি' শ্রেণীর জমি ২৯% যা ঢালু অনুচ্চ টিলা ভুমি। এ জমি ধান চাষ বাগান বনায়ন পশু পাখির খামার ইত্যাদির জন্য উপযোগী। ১.৪% জমি 'সি+ডিঃ শ্রেণী ভুক্ত। এটি ও খামারের যোগ্য। সি ও সি-ডি শ্রেণী ভুক্ত, ৬,৬৭,৬৮৭ একর জমির পুরোটাই খামারযোগ্য। ৭৭% ভূমি 'ডি' শ্রেণী ভুক্ত, এবং এটি কেবল বনায়ন যোগ্য খাড়া পাহাড়।
কিন্তু ভূমির এই প্রকৃতি অনুযায়ী তা ব্যবহারের ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। এজন্য সার্কেল চীফ মৌজা হেডম্যান ও উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের কেউ সোচ্চার ও সক্রিয় হোন নি। প্রশাসনিক কাজে সরকারকে সহায়তা দানের পারিশ্রমিক রূপে চীফ, হেডম্যান ও কারবারীরা সরকার থেকে মাসিক মাসোহারা পেয়ে থাকেন, যার পরিমান যথাক্রমে টাকা ৫০০০/০০ টাঃ ৩০০/ ও টাঃ ২০০/০০ এবং তদোতিরিক্ত তারা জুম খাজনার ৮০% ভূমি রাজস্বের ১০% সামাজিক সালিশে ধার্যকৃত নগদ দন্ডের একাংশ, ভেট সালামী, ও মৌজা প্রতি ৫০ একর সার্ভিস ল্যান্ডের ফল ফসল ভোগ করে থাকেন। রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেও সরকার কর্তৃক অনুগৃহীত। কিন্তু তারা গঠনমূলক পরামর্শ দান থেকে বিরত। এই নেতৃতন্ত্র স্বাধীন নাগরিক অধিকারের সাথে সঙ্গতিশীল নয়, এবং এই ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাটিও আধা সামন্ততান্ত্রিক। জাতীয় ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা থেকে এটির ভিন্ন হওয়া, উপজাতীয় মনোস্তাত্বিক স্বাতন্ত্র্যের পরিপোষক। এই অঞ্চলের আইন পৃথক, আইনের প্রয়োগ পদ্ধতি পৃথক, স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান ও তার ক্ষমতার পরিধিও পৃথক। এতসব অসামঞ্জ্যের ভিতর উপজাতিদের দেশ ও জাতির সাথে অভিন্ন থাকা, এবং ধ্যান ধারনায় অভিন্নতা পোষণ করা অবশ্যই কঠিন। সাংবিধানিক ভাবে দেশ ও জাতিকে একক অখন্ড ঘোষণার পাশাপাশি, ব্যবহারিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বহু অঞ্চলে বহু স্থানীয় আইনে ও স্থানীয় লোকদের খন্ডিত জাতি সত্তায় বিভক্ত রাখা মানে সাংবিধানিক অখন্ডতাকে অকার্যকর করা। বিভিন্ন আঞ্চলিক নিয়মনীতি আইন প্রশাসন ও রাজনৈতিক আকাঙ্খাকে আমল দিতে গেলে, দেশটিকে যুক্তরাষ্ট্রে বা ইউনিয়ন রাষ্ট্রে এবং জাতিকে সমন্বিত সংযুক্ত জাতিতে পরিণত করাই শ্রেয়ঃ। সাংবিধানিকভাবে দেশকে এককেন্দ্রিক ও জাতিকে একক বৈশিষ্টপূর্ণ রাখা এবং আচরণে তার ভিন্নতা করার ভিতরই রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অনৈক্যের সমস্যা নিহিত। এটাই পার্বত্য সমস্যার সূচক।

যদি দেশ ও জাতিকে বিশুদ্ধ এক কেন্দ্রিক চরিত্র সম্পন্ন করে রাখাই শ্রেয়ঃ মনে হয়, তা হলে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের শাসন প্রশাসন আইন ও গঠন পদ্ধতিও অভিন্ন হতে হবে। নতুবা সংবিধানে সংশোধনী এনে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশসন ও

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মঞ্জুর করাই যথার্থ। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক লোকচুরি সমস্যার সমাধান নয়। অতীতকে ধরে রাখা, এবং আঞ্চলিকতাকে পরিপোষণ করা, যথার্থ সাংবিধানিক রাষ্ট্রনীতি নয়। সাম্প্রদায়িক আকাঙ্খার কাছে হার মানলে দেশ ও জাতিকে স্বাধীন আর অখন্ড রাখা কঠিন হবে। রাষ্ট্রনীতিতে ভয় ও তোষামোদ বাঞ্ছিত নয়। পর্বতাঞ্চলে সামন্তবাদ, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও পরাধীনতা সম্পন্ন আইন রীতি ও পদ্ধতি অব্যাহত আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরূপ আঞ্চলিকতার বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ করেছে। ফরাসী জাতি বিপ্লবের মাধ্যমে তার আঞ্চলিকতার বিলোপ সাধন করেছে। আমাদেরও অনুরূপ সাহসী পদক্ষেপের প্রয়োজন। উপড়ে ফেলা হোক সব পশ্চাদপদতা, আঞ্চলিকতা ও বিশেষ সাম্প্রদায়িক অগ্রাধিকার। সমাজে রাজা প্রজার পরিচয় ও পার্থক্য থাকা অবাঞ্ছিত। বৈষম্যহীন মানবিক ও অবাধ গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থাই কাম্য। জন্ম সুত্রে বাংলাদেশী মান্য কেউই দেশাভ্যন্তরে অবাঞ্ছিত হতে পারে না। দেশ ও জাতি খন্ডিত নয়, সম্মিলিত সত্তা। সবারই সমানাধিকার প্রাপ্য।

১৪
(তাং-সোমবার ১৩ অগ্রাহায়ন ১৪০৭ বাংলা, ২৭ নভেম্বর ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

বৈধ ভূমি মালিকানার উপায় হলো ঃ প্রথমতঃ তার দাবীদারকে দেশের খাঁটি ভূমি সন্তান হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সংশ্লিষ্ট জায়গা জমিগুলো ভিন্ন দখল ও মালিকানা থেকে মুক্ত হতে হবে। তৎপর আইন সঙ্গত উপায়ে ঐ জায়গাতে লীজ অথবা বন্দেবাস্তি সহ দখলাধিকার থাকতে হবে। অতঃপর, ধার্যকৃত ভূমি রাজস্ব নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে। আদিকাল থেকে আচরিত ভূমি মালিকানার উপায় এটাই। দ্বিতীয় মালিকানার উপায় হলো ঃ দুই বৈধ নাগরিকের পারস্পরিক খরিদ, বিক্রি, হস্তান্তর, উত্তরাধিকার, নাম জারি ও তার পক্ষে সরকারী অনুমোদন। এছাড়া বৈধ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি মালিকানা, উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে মোটেও ঝামেলামুক্ত ও নির্বিরোধ নয়।

প্রতিবাদী উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ দাবী করেন ঃ এতদাঞ্চল তাদের নিজস্ব ভূমি। এখানকার আসল ও আদি ভূমি সন্তান তারাই। তাদের রাজাদের দ্বারা আনিত কিছু পুরানবস্তিবাসী বাঙ্গালী বাদে হাল আমলের পুনর্বাসিত বা বসতিকারী বাঙ্গালীরা এখানকার অবৈধ বাহিরাগত। সরকারের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই বাঙ্গালী বসতি স্থাপন কার্যক্রম এক অন্যায় পদক্ষেপ। এটা উপজাতিদের প্রতি অবিচার। এর প্রতিকার হলো, নবাগত বাঙ্গালীদের প্রত্যাহার। বাঙ্গালী বসতি স্থাপনেরই তিক্তফল, সশস্ত্র উপজাতীয় বিদ্রোহ। এর সমাধান না হলে শান্তি সুনিশ্চিত হবে না।

কিন্তু এই উপজাতীয় দাবীগুলো প্রকৃত তথ্য নির্ভর নয়। ইতিহাস বলে ঃ এতদাঞ্চল চট্টগ্রামেরই খণ্ডিত অংশ। চট্টগ্রামী মূলের লোকেরাই এর ভূমি সন্তান বা আদি

বাসিন্দা। উপজাতিরা কখনো দাবী করেনি যে, তারা চট্টগ্রামী রক্তের লোক বা চট্টগ্রাম মূল থেকে উদ্ভুত আদিবাসী।
এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত সত্য যে, উপজাতীয়রা স্থানীয় নয়, বগিরাগত অভিবাসীদের বংশধর। তবে তাদের এই বহিরাগমন শতাব্দী প্রাচীন। তাদের বর্তমান প্রজন্ম জন্ম সুত্রে স্থানীয় বাসিন্দা। এখন তাদের অভিবাসী বা বিদেশী বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কালের বিবর্তনে তাদের রূপ পরিচয় স্থানীয় হয়ে গেছে। তবু ইতিহাস হলোঃ তারা অভিবাসী বংশধর। তাদের স্থানীয়দের মত সমান রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্য নয়। এখানে সমস্যা হলো ঃ এই দেশবাসী বাঙ্গালীরা তাদের স্বজাতি বলে মেনে নিয়ে, শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানে অভ্যস্ত হলেও, উপজাতিদের একদল নেতৃস্থানীয় প্রতিবাদী, স্বদেশবাসী বাঙ্গালীদের সাথে শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানে অনীহ। এটাই অশান্তির হেতু। এই কারণটাকে আন্দোলনে গড়িয়ে সশস্ত্র মারমুখী উপজাতীয় প্রতিবাদীরা সংকট সৃষ্টি করেছে, এবং এই উগ্রতা প্রতিহিংসায় পরিণত হয়েছে। এই প্রতিহিংসার অবসান তখনই সম্ভব, যখন উপজাতীয় পক্ষ থেকেই পুনরায় এই পাল্টা আন্দোলন গড়ে তোলা হবে যে, পাহাড়ী বাঙ্গালী পরস্পরের শত্রু নয় ভাই। পাহাড়ীদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে বাঙ্গালী বসতি বিস্তারে ভারসাম্যাবস্থা কাম্য। যারা আছে তারা শান্তিপুর্ণ সহাবস্থান সমানাধিকার ও গণতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা সমান ভাবে ভোগ করুক। কারো জন্য কোন অগ্রাধিকার নয় কারো জন্য কোন অগ্রাধিকার ও পদ সংরক্ষণ নয়। নাগরিক বৈষম্য নীতির অবসান হোক। হিংসা ও হানাহানি অমানবিক। এটি পাহাড়ী বাঙ্গালী উভয়েরই স্বদেশ। এদেশের প্রতিটি কণায় উভয়ের সমানাধিকার মান্য। স্বদেশের মাটিতে কেউ কোথাও অবাঞ্ছিত নয়। হিংসা বিদ্বেষ ও হনাহানিতে সমাধান নেই। কারোরই উচ্ছেদ ও বিতাড়ন কাম্য নয়। গত দুই দশকের সশস্ত্র কার্যক্রম, বিজয় অর্জন বা শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। আর তার পুনরাবৃত্তি নয়। এবার বন্ধুত্ব ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার দ্বারা হৃদয় জয়ের ধারা প্রবর্তন দরকার। এ পথেই শান্তি সম্ভব।

বাঙ্গালী প্রত্যাহার হলো অবান্তর ও হিংসাত্মক দাবী। এতে হিংসা উস্কানী ও উত্তেজনা নিহিত। অহিংস পথে সংকটের সমাধান খুঁজতে হবে, এবং সে সমাধান অসম্ভব নয়। উপজাতীয় পক্ষ বহুবিধ দুর্বলতায় নিমজ্জিত। তাদের অধিকাংশের বৈধ ভূমি মালিকানা নেই। এই শূণ্যতাকে পূরণ করা ছাড়া, কেবল উত্তেজক ফাঁকা দাবীতে সুফল লাভ সম্ভব নয়। প্রথাগত ভূমি অধিকার, সামাজিক জুম ভূমি, অতীত রাজকীয় ঐতিহ্য ইত্যাদি দাবী নেহাত ফাঁকা বুলি।

জমির বৈধ মালিকানা লাভের প্রক্রিয়াকে প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত করে খরিদ বিক্রি বন্দোবস্তি ও লীজ গ্রহণ সহজ করা জরুরী। এটাই ভূমি মালিকানা লাভের বৈধ পথ। এছাড়া কোন কঠিন আন্দোলনই ভূমি মালিকানা ঘরে এনে তুলে দিবে না। যতই কঠোর ও হিংসাত্মক আন্দোলন হোক, বাঙ্গালীদের পক্ষে গৃহীত বন্দোবস্তি ও লীজ প্রক্রিয়া অবৈধ হবে না। তাহলে সরকারী ক্ষমতা ও আদেশে বৈধতাই ক্ষুণ্ন হবে।

আন্দোলনের চমৎকারিত্বে উপজাতীয়রা উজ্জীবিত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলের একক ও একচ্ছত্র মালিকে পরিণত হয়ে যাবেন, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কৌশল বাস্তব ভিত্তিক না হলে, কোনকালেও উপজাতীয় ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন বাস্তবায়িত হওয়ার নয়। দেশ জাতি ও বাঙ্গালীদের জিম্মি ও বাধ্য করার দ্বারা বিজয় ও সাফল্য অর্জনের আশা আকাশ কুসুম কল্পনা। এ কৌশল ভুল। এটাও সঠিক তথ্য যে, বিদ্রোহ বাঙ্গালী আবাসনের আগেই সংঘটিত হয়েছে, এবং তাকেই দমাতে বাঙ্গালী বসতি স্থাপনের ঘটনা ঘটেছে।

১৫

(তাং-মঙ্গলবার ১৪ অগ্রহায়ন ১৪০৭ বাংলা ২৮ নভেম্বর ২০০০ খ্রীঃ/ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

বাস্তবতা হলো ঃ বাংলাদেশে বাঙ্গালীরা শাসক সম্প্রদায়। জাতীয় জনসংখ্যায় তাদের অনুপাত ৯৯%। বিপরীতে পার্বত্য উপজাতীয়দের অনুপাত এক শতাংশের অর্ধেক মাত্র, অর্থাৎ এরা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু। ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু হওয়াতে তাদের নিজেদের মহা পরাক্রমশালী ভাবার অবকাশ নেই। বাস্তবে তাদের শক্তি সামর্থ বাঙ্গালীদের সাথে তুলনীয় নয়। তাদের অহংবোধও যথার্থ নয়। কেবল অহংবোধ ও বিদেশী প্ররোচনায় তারা বাঙ্গালীদের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। আরেকটি বিষয় তাদের অহংবোধকে তীব্রতর করেছে, আর সেটি হলো স্বল্প সংখ্যক উপজাতীয়দের আবাস ভূমি হিসাবে পার্বত্য অঞ্চলের বিশালত্ব, এবং স্থানীয় ভাবে তাদের সংখ্যাগুরু হওয়া। এই অহংবোধকে আরো স্ফীত ও সম্প্রসারিত করেছে, অঞ্চলটির সীমান্তবর্তী দুর্গম অবস্তান, যার পাশে সম শ্রেণী ও সম সম্প্রদায়ভিত্তিক প্ররোচনা দাতা ও মদদগার জনশক্তি ও রাষ্ট্র বিদ্যমান। পার্বত্য উপজাতিরা জাতীয় জন সংখ্যায় একের আধা শতাংশ হলেও, এই পার্বত্য অঞ্চলটি গোটা বাংলাদেশের প্রায় এক দশমাংশ। এটা প্রধান উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলও বটে, এ মূল্যমান ও উৎসাহজনক। তাই রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ হলো, এখানে উপজাতীয় অধিকার ও প্রাধান্য রক্ষা করা, যা হবে রাজনৈতিক উচ্চাষা পূরণের ভিত্তি কিন্তু এই উচ্চাভিলাষ জাতীয় আধিপত্য ও অধিকারের প্রতি হুমকিরূপে অনুভূত। এই চ্যালেঞ্জের সুরাহা করাটা আবশ্যক। বিষয়টি উপজাতীয় আবেগ ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের সাথে জড়িত এবং বাংলাদেশের পক্ষে স্পর্শকাতর।

সর্ব প্রথম স্থানীয় ইতিহাসের ব্যাপক চর্চা আবশ্যক। প্রচারিত ও প্রচলিত ইতিহাস সবাইকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। সে ইতিহাস উপজাতীয় আদিবাস, স্বাতন্ত্র্য ও অতীত রাজ্যাধিকারের মিথ্যাচারের সমষ্টি। কিন্তু অভিনব হলেও এটাই সত্য সঠিক তথ্য যে, প্রচারিত কথা কাহিনীর অধিকাংশ মুখ্যতঃ রূপকথা, প্রকৃত ইতিহাস নয়। কথিক চাকমা রাজাদের কিছু দাপ্তরিক সীলমোহর সংরক্ষিত আছে, যেগুলো আরবী বর্ণে, ও ভাষায় খোদাইকৃত। ঐ রাজাদের অন্যতম শের জব্বার খানের শীলমোহরটিতে লেখা আছে ঃ রোসান, আরাকান, আল্লাহু রাব্বি, শের জব্বার খান ১১১১।

মঘী পঞ্জিকার হিসাবে ঐ ১১১১ হলো ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দ, যে সময়টি তার ক্ষমতা লাভের

(খ) পার্বত্য চুক্তির মূল্যায়ন।

১.

(তাং-শুক্রবার ১৪ শ্রাবণ ১৪০৬ বাংলা ৩০ শে জুলাই ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সন তারিখে পার্বত্য জন সংহতি সমিতির সাথে আওয়ামী সরকারের সমঝোতা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যা শান্তি চুক্তি নামে সাধারণভাবে অবিহিত। তবে চুক্তিটির শিরোনামে শান্তি সংজ্ঞা নয়, নিম্নোক্ত পরিচয়ই ব্যক্ত হয়েছে, যথাঃ 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির চুক্তি।' সুতরাং মূলতঃ এটির নাম শান্তি চুক্তি নয়, এবং এটি সরকারি নির্বাহী ক্ষমতাধীন চুক্তি ও নয়। জাতীয় কমিটির আবহায়ক চীফ হুইপ হাসানাত আব্দুল্লাহ, মর্যাদায় জাতীয় সংসদ সদস্য মাত্র, যার কোন নির্বাহী ক্ষমতা প্রাপ্য নয়। তার দায়িত্বে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিপক্ষের সাথে মীমাংসায় পৌছা ও চুক্তি সম্পাদন, সরকারী আদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিলো বলে কোন তথ্যে অবগত হওয়া যায় না। চুক্তিটি সংসদীয় পর্যায়ে আলোচিত না হওয়ায়, এর খুটিনাটি ফাঁক ফোঁকর অজ্ঞাত থেকে গেছে। মীমাংসায় পৌছা ও চুক্তি সম্পাদন, শূণ্য ক্ষমতায়ই হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। চুক্তির ভিত্তিতে দায় দায়িত্ব গ্রহণ ও আইন প্রণয়ন এখানে অবশ্যই আলোচ্য। আসলে জাতীয় কমিটির সাংগঠনিক দায়িত্ব ছিলোঃ প্রতিপক্ষের মতামত গ্রহণ, সরকারী মতামত প্রদান, এবং উভয় পক্ষের অভিপ্রায়ের সঙ্গতি বিধান। এই সঙ্গতি বিধানের শেষ পর্যায় হলো ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি মীমাংসার সুপারিশ প্রদান এবং তা গৃহীত হলে, আদিষ্ট নির্বাহী ক্ষমতায় আনুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পাদন। চুক্তিতে এই আনুষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা ও নিয়ম নীতি পালিত হয়নি। তাই এটি কাগজে পত্রে নয়, আওয়ামী সরকার কথিত শান্তি চুক্তি, যা নির্বাহী ক্ষমতাবলে সম্পাদিত সরকারী চুক্তি নয়, সরকার সমর্থিত চুক্তি। এর দুর্বলতা হলোঃ কোন ভিন্ন সরকার এর দায় দায়িত্ব অস্বীকার করতে, এবং তার ভিত্তিতে প্রণীত আইন গুলোকেও অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করতে পারে। চুক্তি ও আইনের এই দুর্বল ভিত্তি অবহেলা যোগ্য নয়।

মুখবন্ধ ঃ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের

সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে, সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও অর্থ নৈতিক অধিকার সমুন্নত, এবং আর্থ সামাজিক ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংসহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারিখন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন।'

চুক্তির উপরোক্ত বর্ণনায় এটা পরিষ্কার যে, সরকার চুক্তির কোন পক্ষ নন। প্রথম পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি সরকারের পক্ষে চুক্তি সম্পাদনে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ নন। তাই এই মুখবন্ধে বর্ণিত অঙ্গিকারগুলো সরকারিভাবে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণভাবে, পালনীয় হওয়ার কোন বাধ্য বাধকতা নেই। যদি জন সংহতি সমিতি নির্বাচিত ও ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হতো, এবং চীফ হুইপ সরকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হতেন, তা হলে সরকার ও পার্বত্য জনগণ পর্যায়ে, এটি পালনের বাধ্য বাধকতা থাকতো। তদুপরি জন সংহতি সমিতি, স্থানীয় বাঙ্গালীদের দ্বারা তো বটেই, উপজাতীয়দের একাংশের দ্বারাও প্রত্যাখ্যাত। ঐ ভিন্ন মতাবলম্বী উপজাতীয় নেতৃমহল, সরকারের সাথে ইতিপূর্বে চুক্তিবদ্ধ হয়ে, স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। জনসংহতি সমিতিও সে বিরুদ্ধ মত ও ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করেছিলো। সুতরাং পার্বত্য জনসংহতি সমিতিকে পার্বত্য জনগণের অবিসম্বাদিত মুখপাত্র রূপে গ্রহণ বিতর্কিত। কার্যতঃ এটি কর্তৃপক্ষীয়ভাবে সম্পাদিত ও সার্বজনীনভাবে পালনীয় চুক্তি নয়। এটি হলো ঃ চীফ হুইপের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য জন সংহতি সমিতি নামক একটি সংগঠনের চুক্তি। এটিকে সরকারী ও পার্বত্য জনগণের পক্ষে সম্পাদিত চুক্তি বলা নিরেট প্রতারণা।

পার্বত্য জনগণ নয়, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ও তার নেতৃত্বাধীন জন সংহতি সমিতি মাত্র, সম্পাদিত চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষ। স্থানীয় ভিন্ন মতাবলম্বী উপজাতি ও বাঙ্গালীরা এর বাধ্যবাধকতার সাথে আবদ্ধ নেই। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ও তার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতি সহ শান্তিবাহিনীকে, একমাত্র ও শেষ প্রতিপক্ষ ভাবারও অবকাশ নেই। হালে তারা ও তাদের আধিপত্য গুরুত্ব পেলেও, ভবিষ্যতের জন্য তা স্থায়ী রূপে মান্য কিছু নয়। তবে চুক্তি ও মুখবন্ধের অঙ্গিকারগুলো, উপজাতি সহ জন সংহতি সমিতি ও জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার পক্ষে অবশ্যই পালনীয়।

দোষ ক্রটি থাকা সত্বেও, এটা স্বীকার্য যে চুক্তিটি তাৎক্ষণিকভাবে যথেষ্ট সুফল দান করেছে। আর সে হলো বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর একটি বিরাট অংশ অস্ত্রসহ

আত্মসমর্পণ করেছে। ভারতের শরণার্থী শিবির ছেড়ে দেশ ত্যাগী উপজাতিরা ফিরত এসেছে, এবং শান্তিবাহিনী সৃষ্ট নিত্য দিনের নিরাপত্তাহীনতা পরিমানে কমেছে। বিছিন্ন ও ভিন্ন মতাবলম্বী বিদ্রোহীরা সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি অব্যাহত রাখলেও, আগের মত তারা সংগঠিত নয়। তারা এখন দুষ্কৃতি কারী মাত্র।

চুক্তির ধারা বিবরণের সারকথা বা মূল বক্তব্য হলো মুখবন্ধ। এর সাথে দফাওয়ারী ব্যবস্থাগুলোর সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছিত। নতুবা তা হবে মুলনীতি বিরোধী, অপালন যোগ্য ব্যবস্থা। সামনে চুক্তির দফাওয়ারী মূল্যায়নে এরূপ কোন সামঞ্জস্য আছে কিনা তা দেখা যাবে। মুখবন্ধে নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলো ব্যক্ত হয়েছে, যথা ঃ

ক) বাংলাদেশ সংবিধানই মূল অনুসরণীয় আইন।
খ) রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আর অখন্ডতা অলঙ্ঘনীয়।
গ) জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত থাকবে।
ঘ) সকলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হবে।
ঙ) বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন কর্তব্য রূপে মান্য হবে।

এই পাঁচ মূলনীতি হলো চুক্তিভুক্ত পক্ষদ্বয়ের অঙ্গিকার। এখানে বিশেষ সুবিধাভোগী কোন পক্ষ নেই। বাঙ্গালী বা উপজাতীয় নামীয় কোন বিশেষ ভোক্তার কথাও ব্যক্ত হয়নি। জাতি ধর্ম, বর্ন ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল নাগরিকই ভোক্তা। জনসংহতি সমিতি প্রধান পার্বত্য অধিবাসীদের পক্ষে এবং জাতীয় কমিটি প্রধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে, উপরোক্ত লক্ষ্যাবলী অর্জনে, পরস্পরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এখানে ধর্ম বর্ন সমাজ ও সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি বৈষম্য বা অগ্রাধিকার আরোপের কোন কথা নেই। বর্ণিত মহৎ লক্ষ্যাদির গুণেই চুক্তিভুক্ত এই মুখবন্ধটি একটি উত্তম মোসাবেদা। চুক্তি ও তার বাস্তবায়নে এই লক্ষ্যাদির ব্যতিক্রম কিছু না ঘটাই বাঞ্ছিত। তবু অসাবধনতায় বা প্রতিপক্ষীয় চাপে, এই মূলনীতি ও অঙ্গিকার ভিত্তিক লক্ষ্যের কিছু হের ফের, পরবর্তী করণীয় দফাগুলোতে কোনভাবে ঘটে থাকলে, তা নীতিগতভাবে পরিত্যজ্য হবে। এটাই চুক্তিভুক্ত অঙ্গিকারও নীতিকথা। খন্ড ঃ ক। সাধারণ বিষয়াদি।

দফা নং 'ক/১ । উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে। বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।'
এখানে তিনটি সিদ্ধান্ত মূলক বক্তব্য আছে যথাঃ

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল।
খ) এই অঞ্চল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যা সংরক্ষণ প্রয়োজনীয়।

গ) এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন সাধন আবশ্যক।

(ক) -তে বর্ণিত সিদ্ধান্তটি বিতর্কিত।

এর দ্বারা পর্বত্যঞ্চল এককভাবে উপজাতীয় লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত, না এটা উপজাতিদের বসতি সম্পন্ন কোন অর্থ বুঝান হয়েছে, তা পরিষ্কার নয়। বাস্তবে স্থানীয় অধিবাসী অবাঙ্গালীরা হলো বিভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের সমষ্টি। তারা প্রধানতঃ এতাদাঞ্চলেই অধ্যুষিত। সারা দেশ জুড়ে অধ্যুষিত উপজাতিদের অর্ধেকই এতদাঞ্চলের বাসিন্দা। এই অর্থে এতাদঞ্চল প্রধান উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল, একক উপজাতি অধ্যুষিত নয়। একক উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল বুঝাতে হলে, উপজাতি অধ্যুষিত না বলে উপজাতীয় অঞ্চল বলাই যথেষ্ট হতো। সুতরাং উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল মানে উপজাতীয় বসবাস সমৃদ্ধ অঞ্চল, যেখানে বন পাহাড় হ্রদ ও শিল্পাঞ্চলসহ, সর্বত্র বাঙ্গালী উপজাতি মিশ্র বসতি আছে। উপজাতি অধ্যুষিত মানে, অউপজাতীয়দের অবস্থান ও বসবাসকে অস্বীকার করা নয়। অবশিষ্ট সিদ্ধান্ত দুটি যথার্থ।

দফা নং 'ক/২: উভয় পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথা শীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানবলী ও রীতি সমুহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন, আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন।'

এই বয়ানের ভিতর কোন দ্বিমত বা বিতর্কের বিষয় নেই। এটি সাধারণ গতানুগতিক বক্তব্য। তবে সমুদয় কর্মকান্ড আইন মোতাবেক সম্পন্ন করা হবে, এই নিশ্চয়তা দান একটি বিরাট অঙ্গিকার। এটা জন সাধারণকে গভীরভাবে আশ্বস্ত করার বিষয়।

(তাং-বৃহস্পতিবার ২১ শ্রাবণ ১৪০৬ বাংলা ৫ আগস্ট ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

দফা নং 'ক/৩ । এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে।

ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য........আহ্বায়ক

খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান .....সদস্য

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ....সদস্য।'

এই ধারার আওতায় গঠিত চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম আহ্বায়ক হলেন চীফ হুইপ হাসানাত আব্দুল্লাহ। তবে প্রতিপক্ষীয় সদস্য জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, দীর্ঘ একটানা অভিযোগে সোচ্চার ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার পর ২৭/৫/১৯৯৯ তে ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। আঞ্চলিক পরিষদ অন্তর্বর্তী কাঠামোতে এখন গঠিত ও সক্রিয়। এখন এই পরিষদ সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি অধস্তন কর্তৃপক্ষ। এটি স্বশাসিত হলেও স্বায়ত্তশাসিত নয়। স্থানীয়

সরকার আইন কাঠামোতে এটি গঠিত হলেও বিধিগতভাবে এর এখতিয়ারভুক্ত তিন পার্বত্য জেলা তথা অখন্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন প্রশাসনিক অঞ্চল নয়। সুতরাং-এর এখতিয়ার আঞ্চলিকভাবে শূণ্যস্থিতিতে আবদ্ধ। সংবিধানে ব্যক্ত স্থানীয় শাসন আইনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

'অনুচ্ছেদ ৫৯(১) আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান সমুহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে। (২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লেখিত অনুরুপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেই রূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।'
এখন বাস্তবতা হলো, পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন প্রশাসনিক একাংশ নয়। সুতরাং আঞ্চলিক পরিষদের এখতিয়ার প্রয়োগের প্রস্তাবিত ভিত্তি ভূমি শূণ্য। এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ শূণ্যস্থিতিতে অবস্থিত। এ যেন ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার।

দ্বিতীয় বাস্তবতা হলো ঃ সংবিধানে অনির্বাচিত বা অর্ন্তবর্তী কোন শাসন কর্তৃপক্ষের সংস্থান নেই। অথচ আঞ্চলিক পরিষদ আইনে অনুরূপ বিধান রাখা হয়েছে, এবং আইনী বিধান না থাকা সত্বেও, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, নির্দিষ্ট মিয়াদের বহুগুণ বেশি সময় ধরে মনোনীত লোকজনদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। জেলা পরিষদ নির্বাচিত না হলে তদ্বারা আঞ্চলিক পরিষদ ও সংগঠিত হবে না। তদুপরি ভোটার তালিকা সংশোধনের দাবী হলো নির্বাচনের আরেক পূর্বশর্ত। অথচ এ কাজটি সাংবিধানিক বাঁধায় আবদ্ধ। এই বিপত্তিগুলো পেরিয়ে কখন নির্বাচন হবে তা অনিশ্চিত। আর বাস্তবতা হলো নির্বাচন ছাড়াও এগুলো টিকে আছে। তা হলে কি এই অনির্বাচিত জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ কায়েমী? অন্তর্বর্তী সময়কালের তো কোন সীমা সরহদ নেই। এ হলো বেআইনী ক্ষমতা ভোগ প্রক্রিয়া। আইনে তা কি অনুমোদিত? শান্তি চুক্তি ও আইনে এরূপ বেআইনী সুবিধাবাদী নীতির কোন উল্লেখ নেই। তবু এ ব্যবস্থা রাজনৈতিক ভাগ বাটোয়ারা ও ভোগ উপভোগ করার প্লেট ফরম হয়ে আছে। স্বচ্ছতা ও আইন মান্যতার এটি কি নমুনা? এ-তো হলো গণতন্ত্রকে রাজনৈতিক বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন।

দফা নং ক/৪। এই চুক্তি উভয়পক্ষের তরফ হইতে সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে, এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।'
চুক্তি বলবৎ করনের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল থাকা উচিত ছিলো। যার অভাবে কেবল মত পার্থক্য জনিত বাদানুবাদ ও আশ্বাসের ভিতর বেশির ভাগ সময়ের অপচয় হচ্ছে। চুক্তির প্রধান গ্রহণীয় পদক্ষেপ ছিলো ঃ আইন প্রয়ণন পার্বত্য

মন্ত্রণালয় স্থাপন ও অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, যা সম্পাদিত হয়েছে। তবে সম্পন্ন অনেক কিছুই ফেকড়া বাঁধিয়ে রেখেছে।

মুখবন্ধের ব্যাখ্যায় আলোচিত ক, খ, গ , ঘ, ঙতে চিহ্নিত অঙ্গিকারগুলো ক-খন্ডের প্রথমেই লঙ্ঘিত হয়েছে। এখানে বক্তব্য হওয়া উচিত ছিলো ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বাঙ্গালী অবাঙ্গালীদের মিশ্র অধ্যুষিত অঞ্চল। এই সার্বজনীনতা না থাকায় উপরোক্ত অঙ্গিকারগুলো গালভরা বুলির পর্যায়ে নেমে গেছে। চুক্তির মূলনীতিগত বিচারে ক-খন্ডে বর্ণিত এক পাক্ষিক বক্তব্যগুলো, বলবৎ যোগ্য ও মান্য নয়। মুখবন্ধে সার্বজনিন বক্তব্য থাকায়, এটা ধরে নেয়া স্বাভাবিক যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম মিশ্র জন অধ্যুষিত অঞ্চল, অথবা এই বাক্যাংশ জুড়ে দেয়া যেতো যে, এতদাঞ্চল উপজাতিদের প্রধান বসতি এলাকা। 'খন্ড/খঃ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (জেলা পরিষদ)। উভয় পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারা সমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন।
দফা নং খ/১। পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত উপজাতি 'শব্দটি বলবৎ থাকিবে।'

এই খ/১ ধারায় ব্যক্ত সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত তাৎপর্যপুর্ণ। ঐক্যমত অনুযায়ী এখানে কোন পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করা হয়নি। বরং ঐক্যমতের ভিত্তিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হয়েছে। বিষয়টি বিতর্কিত ও তাত্বিক। স্থানীয় অবাঙ্গালী সুধীমহল, উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ী এই সংজ্ঞাত্রয়ের কোনটিতে পরিচিত হবেন, তা নিয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন না। কেউ নিজেদের উপজাতি ভাবেন, কেউ ভাবেন আদিবাসী, আর আরেক দল নিজেদের পাহাড়ী দাবী করেন। নৃতাত্বিক ও সমাজ বিজ্ঞান ভিত্তিক তত্ব মতে ও সংজ্ঞাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ও পরিচয় আছে। তবে তিনটি সজ্ঞায়ই আদিম লোক জ্ঞাপক অর্থে বিচার করা হলে, স্থানীয় কোন অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠীকেই বাস্তবে আদিম অসভ্য রূপে গণ্য করা যায় না, এবং তারা একসাথে উপজাতি আদিবাসী ও পাহাড়ী এই তিন সংজ্ঞায় পরিচিত হতে পারেন না। এই লোকেরা বাঙ্গালী নন, এই অর্থে অবাঙ্গালী সংখ্যালঘু বলে আখ্যায়িত হতে পাবেন, আর এটাই যথার্থ। সভ্য জগতের সভ্য মানুষদের আদিম অসভ্য অর্থবোধক সংজ্ঞায় আবদ্ধ করে পরিচিত করা অন্যায়। এই অনুপযোগী সংজ্ঞা বৃটিশ আমলের উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত, এবং সরকারী উদ্যোগে ব্যবহৃত। জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দের কেবল উপজাতি সংজ্ঞার সাথে একমত হওয়া বিস্ময়কর অধুনা চুক্তিকারী উপজাতী প্রধান সন্তু লারমা আধিবাসী নেতা গোষিত। পশ্চাদপদ ধ্যান ধারণাকে পোষণ করা, আধুনিক মনষ্কতা নয়। উপজাতি আদিবাসি, পাহাড়ী, জুম্ম জাতি

ইত্যাদি পরিচয়গুলোকে আধুনক ও যুগোপযোগী বলা যায় না। বিকল্প যুগোপযোগী ও যথার্থ স্বকীয়তা পরিচায়ক নাম চয়নই বাঞ্চিত। এমনিতে পৃথক পৃথক সম্প্রদায়িক নাম পরিচয় তো আছেই। সমষ্টিগত নাম পরিচয়েরও প্রযোজন হলে তা হেলা ফেলাও তুচ্ছার্থক হওয়া ঠিক নয়। সম্মানজনক রুচিকর নাম পরিচয় না হলে, তা হবে অগ্রহণীয়। সুতরাং যে পর্যন্ত না রুচিকর সম্মানজক ও শ্রুতিমধুর একটি সামগ্রিক নাম নির্বাচিত হবে, ততদিন পর্যন্ত এই পার্বত্য অঞ্চলের জাতীয় সংখ্যালঘুদের পরিচয় হোক অবাঙ্গালী। তাতে অপ্রাঞ্জল, অরুচিকর, ব্যাকরণগত ভাবে ভুল, বিরপরীত অউপজাতি সংজ্ঞা থেকে বাঙ্গালীরাও রেহাই পাবে। কী লজ্জ্যাজনক অন্যায় কথা যে, মাত্র ৫/৬ লাখ অবাঙ্গালীর বিপরীতে কোটি কোটি বাঙ্গালী তুচ্ছার্থক 'অউপজাতি সজ্ঞায় আখ্যায়িত। এ সংজ্ঞাটি কোন স্থানীয় অবাঙ্গালীর দ্বারাও আরোপিত নয়। তাদের কাছে বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ বাঙাল, কখনো অউপজাতি নয়। পার্বত্য বাঙ্গালীরা ও পৃথক কোন সমাজ নয়।

জ্ঞান বিজ্ঞান ও তাত্বিক ব্যাপারে, আপনা আপনি গুরু সাজা অনুচিত। এসব ব্যাপারে চাপিয়ে দেয়া মীমাংসা অবশ্যই আপত্তিকর। রাজনৈতিক দাবী দাওয়া অন্যায় কিছু নয়। এসব ব্যাপারে শৈথিল্য মান্য। তবে জ্ঞান বিজ্ঞান ও তাত্বিক বিষয়াবলীকে হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখাই উচিত। এ বিষয়টি সংশোধন যোগ্য।

সংজ্ঞাগত ব্যাপারটা রাজনৈতিক নয়। তবে এতদাঞ্চলে এগুলো রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে এটি এখন দীর্ঘ আচরিত ঐতিহ্য। মিঃ আর্থার ফেইর ও মিঃ টি এইচ লুইনই প্রধান ব্যক্তি, যারা নিজেদের অনুসন্ধানী বিবরণে, পূর্ব ভারতীয় পাহাড়ী ও বনবাসী, অপ্রধান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌম জনগোষ্ঠীকে, যারা সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, ও নিজস্ব মুক্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত, তাদের কখনো উপজাতি, কখনো আদিবাসী আর কখনো পাহাড়ী জনগোষ্ঠী নামীয়, বিভিন্ন সমষ্টিগত নামে, আখ্যাযিত করেছেন। পরে সরকারী আইনী ও প্রশাসনিক ভাষায় তা স্থান লাভ করে নিয়েছে। নৃতাত্বিক ও সমাজ তাত্বিক চর্চায় পন্ডিত মহল একটি সীমারেখা টেনে বলেন, অপ্রধান অনুন্নত জাতিগোষ্ঠী যারা বিচ্ছিন্ন দুর্গম পাহাড় ও বনের বসবাসে অভ্যস্ত, তারা অবাধে বা সাধারণ ভাবে উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ী আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য নয়। এ সংজ্ঞাগুলো তাদের উপরই প্রযোজ্য যারা অনুন্নত বিচ্ছিন্ন জীবন জীবিকা সহ নিজস্ব আবাস ক্ষেত্রের আদি ও আদিম বাসিন্দা এবং তাদের আচরণে টাবু মান্যতা ও টুটেম বিশ্বাস পালিত হয়। টুটেম হলো প্রাণী ফল মূল ও বস্তু জাত পূর্ব পুরুষের ধারণা, আর টাবু হলো ঃ পূর্ব পুরুষ জাত খাদ্য পানীয় ও স্বগোত্রীয় স্বামী স্ত্রী গ্রহণ করা না করা বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ম নীতি।

ইতিহাস ও স্থানীয় অবাঙ্গালী ঐতিহ্য আলোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশ তাদের কারো আদিম পিতৃভূমি নয়, এবং তাদের আচার-আচরণেও টাবু ও টুটেম ধারা

পালিত হয় না। খাটি অর্থে তাদের আদি বলা ও যায় না। সুতরাং তাত্বিক অর্থে এরা উপজাতি আদিবাসী ও পাহাড়ী তথা আদিম নয়। তবে ব্যবহারিক অর্থে, এরা বাংলাদেশী জাতি বা বৃহৎ বাঙ্গালী জাতিসত্তার বিপরীতে ক্ষুদ্র অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠী ও শাখা জ্ঞাতার্থে উপজাতি আখ্যাযিত হতে পারে। যদিও এইঅর্থে উপজাতি পরিচয় এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট নয়। আর যদি শাখা জাতি ধরে নেয়াই হয়, তখন এর বিকল্পে আদিবাসী আখ্যা প্রযোজ্য হয় না। পাহাড়ী সংজ্ঞাটিও প্রকৃতিগত বলা সঙ্গত। উপজাতি সংজ্ঞাটি বহুল ব্যবহৃত। চুক্তিতে ও তা গৃহীত। এর ভিন্নতা করা জন সংহতি সমিতির পক্ষে চুক্তি ভাঙ্গার পর্যায়ে পড়ে। আসলে আদিবাসী হওয়ার ধারণা সঠিক নয়।

সংশ্লিষ্ট জনগণের কারো কারো মাঝে বর্ণিত সংজ্ঞাত্রয়ের ব্যবহারিক প্রবণতা বিদ্যমান। তাদের কাছে এগুলো একার্থবোধক। রেগুলেশন নং ১/১৯০০ বা পার্বত্য অঞ্চল শাসন বিধিতে, স্থানীয় লোকজনকে কখনো উপজাতি, কখনো আদিবাসী, আর কখনো পাহাড়ী আখ্যায়িত করা হয়েছে। ধারা নং-৫২তে এই তিন সংজ্ঞার ব্যবহারে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। চাকমা ও মগ সম্প্রদায় নিজস্ব নামে উল্লেখিত হয়েছে তবে সংজ্ঞা নামে উল্লেখিত লোকদের কোন সাম্প্রদায়িক নাম নেই। তাই পরিষ্কার নয় যে, কারা উপজাতি, কারা আদিবাসী আর কারা পাহাড়ী জনগোষ্ঠীভুক্ত লোক। তবে এটাই খিচুড়ি ধারণা যে, এই সংজ্ঞাত্রয়ে অবাঙ্গালীদের সবাই অন্তর্ভুক্ত।

২.

(তাং-বৃহস্পতিবার ২৮ শ্রাবণ ১৪০৬ বাংলা ১২ আগস্ট ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

পার্বত্য অবাঙ্গালীদের সমষ্টিগত পরিচয়ে ট্রাইব বা উপজাতি সংজ্ঞার ব্যবহার কেবল হিলট্রাস ম্যানুয়েল, তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার বা জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (আইন নং ১৯,২০ ও ২১) ও পার্বত্য চুক্তি ১৯৯৭ ছাড়া অন্য কোন আইনে বা প্রশাসনিক বিবরণে এতো সুনির্দিষ্ট ও জোরদার নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৪০ নং ও অন্যান্য কিছু ধারায় ট্রাইবেল মামলা বা উপজাতীয় মোকাদ্দমা ও জায়গাজমি সংক্রান্ত আইনে ও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তাতে ট্রাইব বা উপজাতীয়দের সুনির্দিষ্ট পরিচয় ও তালিকা নেই। আনুমানিক সাধারণ ধারণা হলো ঃ ট্রাইব বা উপজাতি মানে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী সমুদয় অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠী।পার্বত্য অঞ্চল শাসন বিধির ধারা নং ৪, ৩৪, ৫০ , ৫২ ইত্যাদি । আইনগুলোতে নামহীনভাবে কিছু লোকের উল্লেখ আছে, যারা পরিচয়ে উপজাতি আদিবাসীও পাহাড়ী। তবে চাকমা ও মগ সম্প্রদায়কে তাদের নামীয় পরিচয়ের বাহিরে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত করে, উপজাতি, পাহাড়ী ও আদিবাসী বলা হয়নি। কেবল আদমশুমারী গুলোতেই লোক সংখ্যা ও সম্প্রদায়িক তালিকায় এবং সে সবের জাতি তাত্বিক বিবরণে ও প্রতিবেদনেই মাত্র, চাকমা ও মঘদের উপজাতি ও পাহাড়ী

ও আদিবাসী সজ্ঞায়িত করে মোটামুটি ধারণা দেয়া হয়েছে। সে বিবরণগুলো ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের শেষ কথা নয়, ধারণা লাভের সুত্র মাত্র। এই তথাকথিত ধারণার উপর ভিত্তি করে বর্তমানে উপজাতীয় পরিচয় সুনির্দিষ্ট করে নিম্নোক্ত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনটি প্রণীত হয়েছে, যার ভিত্তি হলো পূর্ববর্তী পার্বত্য স্থানীয় পরিষদ আইন, যথা ঃ

'ধারা নং ২ (গ) উপজাতীয় অর্থ পার্বত্য জেলা সমূহে স্থানীয়ভাবে বসবাসরত চাকমা মারমা তঞ্চঙ্গ্যা ত্রিপুরা লুসাই পাংখো, খিয়াং ম্রো বোম খুমি ও চাক উপজাতীয় কোন সদস্য।' (সুত্র সংশোধিত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮)।

এখন প্রশ্ন হলো ঃ মূল আইন ভারতীয় আয়কর আইন ও রেগুলেশন ১/১৯০০ বা পার্বত্য শাসন বিধিতে চাকমা ও মগ বাদে উপরোক্ত সম্প্রদায়দের কেউই সুনির্দিষ্টভাবে স্বনামে উপজাতি রূপে আখ্যায়িত বা তালিকাভুক্ত লোক নয়। নাম ধরে পাহাড়ী ও আদিবাসী রূপে ও তাদের সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রাচীন অবাঙ্গালী নামের তালিকায় মারমা নামটিও অনুপস্থিত। তাই বর্তমান উপজাতি তালিকা সম্পুর্ণ অভিনব আর আজগৌবী। পূর্ববর্তী আদমশুমারী তালিকাগুলো এর ভিত্তি হয়ে থাকলে, অনেক সম্প্রদায়ই তা থেকে বাদ পড়ে গেছেন, যারা সরকারী রেকর্ড পত্রে সুনর্দিষ্টিভাবে স্থানীয় অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠী রূপে দীর্ঘকাল যাবৎ গণ্য। উপজাতি গণ্য বর্ণিত ১১টি সম্প্রদায় প্রকৃত উপজাতি কিনা তা যেমন প্রশ্ন সাপেক্ষ, তেমনি প্রশ্ন সাপেক্ষ হলো এই তালিকা। পর্বতাঞ্চলের নেপালী বংশোদ্ভূতরা পার্বত্য শাসন বিধির ধারা নং ৩৫ ও ৩৮ এর দ্বারা দৃঢ়ভাবে পাহাড়ী বলে সমর্থিত লোক। মাইনী ভেলি সার্কেল তাদের জন্যই গঠিত হয়েছিলো। অপর পক্ষে মুরুং সম্প্রদায়টি লোক বলে ৫ম প্রধান সম্প্রদায়, এবং তারাই তাত্ত্বিক উপজাতি হওয়ার যোগ্য অন্যতম প্রধান জনগোষ্ঠী। গত আদমশুমারীতে মাত্র ১২৬ জন সংখ্যা সম্বলিত ম্রো সম্প্রদায়, ২২০০০ এর অধিক জনসংখ্যা সম্বলিত তাদের ভ্রাতৃ সম্প্রদায় মুরুংদের উপর টেক্কা দিয়ে উপজাতি তালিকায় বিস্ময়করভাবে স্বীকৃত আর এটা জেলা পরিষদ আইনে গৃহীত। এই নির্দিষ্ট করণ ও তালিকা গঠন অসঙ্গত। এতদোভয়ের যথার্থতা চ্যালেঞ্জযোগ্য। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও উপজাতীয় তালিকাটিকে যথার্থ বলা সঠিক নয়। আমরা জানি পাঁচ দফা দাবী নামায় জনসংহতি সমিতিকৃত একটি তালিকা আছে, যেটিকে তারা বলে জুম্ম জাতিগোষ্ঠীভুক্ত দশ ভাষাভাষী লোক। তা-ই হুবহু বর্ণিত উপজাতি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।তা হলে তো এটি বিপক্ষীয় রাজনৈতিক দাবী জাত তালিকা। এটি নিরপেক্ষ তাত্ত্বিক তালিকা নয়, অথবা এটি শাব্দিক শাখা জাতি জ্ঞাপক সংজ্ঞাও নয়। তাত্ত্বিক অর্থে মান্য উপজাতিরা হলো ঐ সব লোক, যারা বহৎ জাতিসত্তা থেকে পৃথক, ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ও আদিম জীবন যাপনে অভ্যস্ত, এবং সভ্যতা-বঞ্চিত-পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী। বর্ণিত ১১ উপজাতীয় গোষ্ঠীতে অনুরূপ কোন আদিম লোক পাওয়া দুষ্কর। বর্ণিত উপজাতীয় সংজ্ঞাটিও অবিতর্কিত । আজকাল অবাঙ্গালী নেতৃবৃন্দ, নিজেদের ইনডিজেনাস বা আদিবাসী হওয়ার

দাবীতে সোচ্চার। জনসংহতি সমিতির দুইটি অঙ্গ সংগঠন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী গণ পরিষদ নাম সুত্রেই পাহাড়ী দাবীদার। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত আদিবাসী বর্ষ পালন উপলক্ষে বেশ জাকজমকের সাথে রাঙ্গামাটিতে আদিবাসী বর্ষ পালিত হচ্ছে। চুক্তি কারী শন্তু লারমা নিজেও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের প্রধান নেতা। এটাও প্রমাণঃ স্থানীয় অবাঙ্গালীরা আদিবাসী পরিচিতির প্রতি আগ্রহী। কিন্তু বিস্ময়কর হলো ঃ সরকারি পর্যায় ছাড়া সাধারণভাবে কেউ উপজাতি হওয়ার পক্ষে সোচ্চার নন। তবে এটা বোঝা কষ্টকর যে, উপজাতি সংজ্ঞাটির প্রতি সরকার কেন উদগ্রীব। এটিতো ঔপনিবেশিক ধারার উত্তরাধিকার। তা হলে তো সুবিধা সুযোগ হাতিয়ে নেয়ারই অবলম্বন উপজাতি আদিবাসী পাহাড়ী ও জুম্মু জাতি সংজ্ঞা।

সারাদেশে বাঙ্গালী জনসংখ্যা ১৩ কোটির অধিক তাদের বিপরীতে অবাঙ্গালীরা সংখ্যায় ১৩ লাখ ও নয়। এই পার্বত্য অঞ্চলেও বাঙ্গালীদের সংখ্যা ৫ লক্ষাধিক। তারা একক প্রধান স্থানীয় জনগোষ্ঠী। তাদের বিপরীতে বিভিন্ন ভাষা সমাজ ও সংস্কৃতিতে আবদ্ধ অবাঙ্গালীরা একক কোন জাতি গোষ্ঠী নয়। উপজাতি সংজ্ঞায়িত আনুমানিক একটি সমষ্টির ভিত্তিতে জনসংখ্যাগত ভাবে তারা কিঞ্চিদধিক পাঁচ লাখ তথা জাতীয় অনুপাতে জত(১,২)%। উপজাতি পরিচয়ের ভিত্তিতে তাদের বিপরীতে বাঙ্গালীরা অউপজাতি সংজ্ঞাভুক্ত। এই সংজ্ঞায়নটিও ভুল।

বৃটিশ ভারতীয় ইনকাম টেক্স আইন ও ফাইনেন্স এক্টে, পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী ইনডিজেনাস হিলম্যান বা আদিবাসী পাহাড়ীদের আয়কর থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। পার্বত্য শাসন বিধির ধারা নং ৪ এবং ৩৪ এর ক (১)-এর গ, ঘ চ, ছ, জ, ঝ নং উপধারা সমুহ ৪৫ নং ধরার উপধারা ক ও খ, ৫০ নং ধারার ১ ও ২ উপধারা এবং ধারা নং ৫২ তে ট্রাইব হিলম্যান ইলডি জেনাছ সংজ্ঞাধারীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করা হয়েছে। সুযোগ সুবিধা মঞ্জুরের ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট ভাবে মাত্র ৪ ও ৫২ নং আইনে ট্রাইব বা উপজাতির উল্লেখ আছে, যে আইন চাকমা ও মগ সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে বাদ রেখে অন্যদের নামহীনভাবে ইনডিজেনাস হিলম্যান ও ট্রাইব রূপে সংজ্ঞায়িত করেছে। সংশ্লিষ্ট আইন দুটি এখানে দ্রষ্টব্যঃ

(ক) ধারা নং ৪। কোন চাকমা মগ অথবা পর্বতাঞ্চলের আদিবাসী পরিচিত কোন উপজাতীয় সদস্য, যে বিচার প্রার্থী, তার আবেদন পত্রে, কোন ফি দিতে হবে না। কোন পাহাড়ী পরিচিত লোকের পক্ষে বন্দোবস্তি, জমিত্যাগ ও খাজনা মওকুপ, নাম জারি, সীমানা চিহ্নিতকরণ, জমির রায়তী পত্তন সংক্রান্ত আবেদন পত্রেও কোন রকম এ জাতীয় ফি প্রদেয় হবে না।

(খ) ধারা নং ৫২ । পার্বত্য অঞ্চলে অভিবাসন।

(ক) নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি থাকা ব্যতিরেকে, কোন চাকমা মগ অথবা কোন পাহাড়ী উপজাতীয় সদস্য যে পার্বত্য চট্টগ্রাম লুসাই পাহাড় আরাকানের পর্বতাঞ্চল, অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী বাসিন্দা সে ছাড়া অন্য কোন লোক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিতর প্রবেশ অথবা বসবাস করতে পারবে না, যদি না তার নিকট জেলা প্রশাসকের

বিশেষ বিবেচনায় মঞ্জুরকৃত কোন অনুমতি পত্র থাকে।

উপরোক্ত আইন দুটিতে অবাঙ্গালীদের পরিচয় নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা ঃ (১) চাকমা (২) মগ (৩) উপাজাতীয় আদিবাসী পাহাড়ী। এই আইন দুটিতে চাকমা ও মগেরা উপজাতি তো নয়ই, পাহাড়ী আদিবাসী রূপেও গণ্য নয়। অন্যান্য সহযোগীদের তো তাতে স্বনামে উল্লেখই নেই।

৩.

(তাং-মঙ্গলবার ৩ ভাদ্র ১৪০৬ বাংলা ১৭ আগস্ট ১৯৯৯ খ্রী/ দৈনিক গিরিদর্পন রাঙ্গামাটি)।

পার্বত্য অঞ্চল শাসন বিধির বর্ণিত ধারা নং ৪ ও ৫২ সহ এর সংজ্ঞা জ্ঞাপক বর্ণনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপুর্ণ। এই আইনে ব্যবহৃত সংজ্ঞা নাম উপজাতি পাহাড়ী ও আদিবাসীকে, চাকমা ও মগদের নৃতাত্বিক বিশেষণ রূপে ভাবার অবকাশ নেই। চাকমা ও মগ নামের পরে 'ওর' অর্থাৎ অথবা শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায়, পরবর্তী অংশটি বাক্যের সংযুক্ত বিবরণ, অভিন্ন বক্তব্য নয়। চাকমা মগ সহ অন্য কোন সম্প্রদায়কে, উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ী বুঝাতে, 'ওর' এর পরিবর্তে এন্ড বা এনি আধার বলার প্রযোজন ছিলো। সুতরাং 'ওর' শব্দ, চাকমা ও মগদের সুনির্দিষ্টভাবে উপজাতি আদিবাসী ও পাহাড়ী হওয়াকে দৃঢ়ভাবে নাকচ করে দিয়েছে।

পার্বত্য শাসন আইন হলো, স্থানীয় মূল শাসন বিধি। তত্বগত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এর বক্তব্য এখনো অনুকরনীয়। ১৯৯৮ সালের সংসদীয় আইন নং ১৬ বলে এটি আংশিক রহিত হলেও, এর প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে, আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ রহিতকরণ আইনটি কার্যকর হয়নি। প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে ১৬নং আইনটি স্থগিত ও পার্বত্য শাসন বিধি কার্যকর রাখা হয়েছে। যথা ঃ আইন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ২১৫ তাং ৩. ৫. ১৯৮৯।

এই প্রচলিত মৌলিক পার্বত্য শাসন আইনের বর্ণিত ধারা নং ৪ এখনো চালু আছে, এবং ধারা নং ৫২ স্থগিত হলেও, তার সংজ্ঞা জ্ঞাপক বক্তব্যটির মূল্যমান এখনো মান্য। প্রথম আইনটি তিন শ্রেণীর লোককে কোর্ট ফি প্রদান থেকে অব্যাহতি প্রদান করেছে। সে লোক হলো,

(১) চাকমা সম্প্রদায়,

(২) মগ সম্প্রদায় ও

(৩) উপজাতীয় আদিবাসী পাহাড়ী সম্প্রদায়। দ্বিতীয় আইনটি নিম্নোক্ত লোকদের জন্য অবাধ অভিবাসন মঞ্জুর করেছে, যথা

(১) চাকমা ,

(২) মগ ও

(৩) পাহাড়ী উপজাতি যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা রাজা লুসাই ও আরাকান

পর্বতাঞ্চলের আদিবাসী বাসিন্দা।

উপরোক্ত শ্রেণীকরণ ও সুবিধাদান বিবরণে একথা পরিষ্কার যে, চাকমা ও মগ সম্প্রদায়ের লোক উপজাতি তো নয়ই, পাহাড়ী আদিবাসী ও নয়। তাদের বাদ বাকি সহযোগীরাও সে সংজ্ঞায় গ্রহণযোগ্য কিনা, তাও সন্দেহজনক। কোন লেখক, সাংবাদিক, প্রশাসক, রাজনীতিক বা অন্য সাধারণ কেউ যথেচ্ছ ভাবে, কারো প্রতি এই সংজ্ঞা আরোপ বা কারো থেকে এগুলোর প্রত্যাহার করার অধিকারী নন। আইনজ্ঞ ও তাত্বিক পন্ডিতজনদের বিশ্লেষণকে অবলম্বন করেই, সংজ্ঞা আরোপিত হয়। পার্বত্য অবাঙ্গালীদের নৃতাত্বিক পরিচয় নির্ণয়ে, পথিকৃত পন্ডিত হলেনঃ প্রফেসার পিয়ের বেসানেত। তাঁর বক্তব্যটি এ ব্যাপারে চূড়ান্ত প্রতিপাদ্য রূপে গণ্য হতে পারে। তিনি বলেন ঃ

(ক) উপজাতিদের আদিম সমাজের মানুষ হিসাবেই গণ্য করে গবেষণা করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমি এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের এই রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের অংশ হিসাবে বিবেচনা করেছি।

(সুত্র ঃ ট্রাইবসম্যান অফ দি চিটাগাং হিলট্রাক্টস, ভূমিকার শেষ অংশ)

(খ) যদি কেউ আদিম অর্থে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম ভাবধারা ধারণ করে আজও যারা টিকে আছে, তাদের বুঝায়, তবে এই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের আদিম বলে বর্ণনা করা সত্যের অপলাপ।

(সূত্র ঃ ট্রাইবসম্যান অফ দি চিটাগাং হিলট্রাক্টস, ১ম পরিচ্ছেদের শুরু)

উপরে বর্ণিত পার্বত্য আইন দুটিতে বর্ননাগত বিভ্রান্তি হলো, তাতে উপজাতি আদিবাসী ও পাহাড়ী বলে বর্ণিত লোকদের কোন নাম পরিচয় ব্যক্ত হয়নি। নতুবা এ বলার অবকাশই থাকতো না যে, চাকমা ও মগেরা উপজাতি আদিবাসী ও পাহাড়ী নয়। এখন সন্দেহমুক্ত পরিষ্কার ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, চাকমা ও মগ সম্প্রদায়ের লোকেরা আদৌ উপজাতি নয়। তাদের আদিবাসী পাহাড়ী হওয়াটা ও ভ্রান্ত দাবী। সুতরাং পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে তাদের উপজাতি সংজ্ঞায়িত করে গৃহীত আইনী সিদ্ধান্ত, একটি জাজ্বল্যমান ভুল, এটি পরিত্যজ্য। আইনে ব্যক্ত উপজাতীয় তালিকাটি তাই সঠিক নয়। যদি আদৌ অনুরূপ পরিচিতি ও তালিকা প্রয়োজনীয় হয়, তা হলে, রাজনৈতিকভাবে নয়, একাডেমিক তত্বীয় মূল্যায়নের মাধ্যমে, সে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে। এটা বিশুদ্ধ তাত্বিক বিষয়।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, পার্বত্য শাসন বিধির ৫২ ধারায় যে ইমিগ্রেশন তথা অভিবাসন ও অভিবাসনের কথা বলা হয়েছে, তা কি দেশী-বিদেশী মিশ্র বহিরাগমন? তাতে কি স্বদেশী বহিরাগমন অভিবাসন রূপে মান্য? তত্বে কেবল বিদেশী অনুপ্রবেশকেই ইমিগ্রেসন তথা অভিবাসন ও বাহিরাগমন বলা হয়। স্থানীয় অবাঙ্গালী পন্ডিত ও তাদের সমর্থকেরা এর বিপরীতে একটানা বলে যাচ্ছেন

ঃ স্বদেশী বহিরাগমনটিও অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ আইনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এটা আসলে উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপব্যাখ্যা। ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন হলো সরকার ব্যবহৃত পরিভাষিত শব্দ। এটা সরকারী দাপ্তরিক ভাষায় বিদেশী বহিরাগমন ব্যবহৃত হয়, সাধারণ শাব্দিক অর্থে নয়। সুতরাং সরকারী আইনের ভাষায় ব্যবহৃত ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন, যা পার্বত্য শাসন বিধির ৫২ নং ধারায় ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ স্বদেশী বহিরাগমন নয়, বিদেশী বহিরাগমন। সংশ্লিষ্ট অভিবাসন স্বদেশের ভিতর স্থানান্তর গ্রহণ ও বসতি স্থাপন আগে ভারত শাসন আইনেও নিয়ন্ত্রণ যৌগ্য ছিলো না, পাকিস্তান আমলেও তা ছিলো স্থানীয় আবেগজাত বিরোধীতার বিষয়, এবং বাংলাদেশ আমলে রাষ্ট্রীয় সংবিধানই তা নাকচ করে দিয়েছে। পার্বত্য শাসন বিধিতে ঘুণাক্ষরেও সুনির্দিষ্টভাবে স্বদেশী বাঙ্গালীরা, এতাদঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ জনগোষ্ঠী বলে কোথাও উল্লেখিত নন। এই আইনে বহিরাগত বিদেশীদের কেউ অবাধ অভিবাসী, আর কেউ অনুমতিপ্রাপ্ত অভিবাসী। স্বদেশী বাঙ্গালীদের বসতি বিস্তারের বিষয়টি একটি অধিকার। এই নাগরিক অধিকার নিষিদ্ধ বা কারো অনুমতি সাপেক্ষ নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকভাবে মূল চট্টগ্রাম ভুমিরই অংশ। আর এই বৃহত্তর অঞ্চলের মূল অধিবাসী হলো চট্টগ্রামী মূলের জনগোষ্ঠী। এই অঞ্চলের আদি মানুষ হতে হলে, চট্টগ্রামী লোক পরিচয় থাকাই প্রথম ও প্রধান শর্ত। এই শর্ত কেবল চট্টগ্রামী বাঙ্গালীদের পক্ষেই পুরণ করা সম্ভব। মূল চট্টগ্রামী দাবীদার কোন অবাঙ্গালী লোকের এতদাঞ্চলে থাকা সন্দেহজনক। কোন স্থানীয় অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠী আজ পর্যন্ত এ দাবীতে সোচ্চার নন। সুতরাং তাদের আদি স্থায়ী ও অগ্রাধিকারের দাবী যুক্তিহীন।

স্থানীয় অস্থানীয় আর স্থায়ী অস্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার ব্যাপারটি যুক্তিগতভাবে মূল চট্টগ্রামী ও বাংলাদেশী লোক হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভরশীল। নীরবচ্ছিন্ন দীর্ঘ বসবাস ও অবস্থানের পক্ষে মূল চট্টগ্রামী ও বাংলাদেশী হওয়ার শর্তযুক্ত করা হলে, অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশ আটকে যাবেন। তখন বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে তাদের পাতা ফাঁদ বহিরাগত হওয়ার ভ্রান্ত দাবী বলে গণ্য হবে।

স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা ও সম্প্রদায়গত পরিচিতির সনদ দান হলো প্রশাসনিক কাজ। আগে যথাযথভাবেই এ কাজটি সম্পাদনের দায়িত্ব জেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত ছিলো। এই সরকারী প্রত্যয়ন ব্যবস্থা ছিলো যথার্থ ও নিরপেক্ষ।

বাঞ্ছিত না হলেও, স্থানীয়ভাবে বাঙ্গালী অবাঙ্গালীরা দুই প্রতিপক্ষ সমাজ। এই প্রতিপক্ষতাই পার্বত্য রাজনীতির জটিল গ্রন্থি। তাতেই এখানে সবাই দুই দলে বিভক্ত। উপজাতীয় চীফ, পরিষদীয় চেয়ারম্যান, মৌজা হেডম্যান, মন্ত্রী ও এমপিদের কেউ, এই গন্ডি থেকে মুক্ত নন। তাদের স্বজাতীয় পক্ষপাতিত্ব প্রশ্নাতীত সত্য। এমতাবস্থায় উপজাতীয় ক্ষমতাসীনদের কাছে বাঙ্গালীদের নিরপেক্ষ আচরণ

ও সুবিচার লাভ সন্দেহজনক বিষয়। এ বিষয়গুলোর বিবেচনায় উপজাতীয় চীফেরা, নির্বাহী ক্ষমতা না থাকা সত্বেও, প্রতিপক্ষ সমাজ বাঙ্গালীদের স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার সনদ নিরপেক্ষভাবে দিবেন, এবং তা আইনতঃ বৈধ হবে, এটা উদ্ভট, আর অবাস্তব ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে একটি ফাঁদ। উগ্র উপজাতীয় বিরোধীতা ও এ কাজে বাঁধা।
আগে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন দরকার। যাদের দায়িত্ব হবে প্রকৃত উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ীদের পরিচয় নির্ধারণ। তৎপর দরকার স্থানীয়, অস্থানীয়, স্থায়ী, অস্থায়ী, স্বদেশী, বিদেশী ও চট্টগ্রাম মূলের লোকদের পরিচয় ও সংখ্যা নিরূপণ। এই তত্ব তথ্য, আর উপাত্তই হবে সনদ দানের ভিত্তি। নইলে ইচ্ছা খুশির সনদ ও প্রত্যয়ন, জন-শৃঙ্খলা, শান্তি ও সংহতি ভেঙে দিবে। জন্ম নিবে অরাজক উপজাতিতন্ত্রের, এবং তাকে রোখতে জন্ম নিবে প্রতিপক্ষীয় জঙ্গী আন্দোলন, যা অবাঞ্ছিত।

৪

(তাং-শুক্রবার ৫ ভাদ্র ১৪০৬ বাংলা ২০ আগস্ট ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক নিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)
দফা নং ‘খ/২। পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ এর নাম সংশোধন করিয়া তদপরিবর্তে এই পরিষদ পার্বত্য জেলা পরিষদ নামে অভিহিত হইবে।’

এই সংশোধন প্রস্তাবটি যথার্থ নয় এবং অপ্রয়োজনীয়। মনে হয় জনসংহতি সমিতির ডিকটেশনই এতে কার্যকর হয়েছে। সংবিধানের স্থানীয় শাসন আইন অনুচ্ছেদ নং ৫৯ হলো এই পরিষদগুলোর আইনী ভিত্তি। সে অনুযায়ী পার্বত্য রাঙ্গামাটি, খাড়গাছড়ি ও বান্দরবন জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদই যথার্থ নাম। বাস্তবে দেশ ভিত্তিক স্থানীয় শাসন আইন অনুসারে জেলা পরিষদ আইন প্রণীত হলে, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন হবে তার সাতে সামঞ্জস্য হীন। তখন এই পরিষদ আইনের দ্বৈতরূপ অঞ্চলে অঞ্চলে ও মানুষে মানুষে বৈষম্যের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধার তারতম্য সর্বত্র বিক্ষোভ সৃষ্টি করবে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ২৭ অনুরূপ আইনী বৈষম্যকে অনুমোদন করে না। আইনটির নাম স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ও পরিষদগুলো পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ ও আঞ্চলিক সরকার পরিষদ হলে আইনী আত্মরক্ষার শক্তি বৃদ্ধি হতো। এছাড়া স্থানীয় পাবর্ত্য জেলা পরিষদগুলো হবে ভবিষ্যতে আইনী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।
স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত সংবিধানিক আইনের পরিচ্ছন্ন ভাব ও ভাষ্য হলো ঃ

অনুচ্ছেদ ৫৯ (১) আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসন ভার প্রদান করা হইবে।’
‘(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন সাপেক্ষ সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লেখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত

প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেই রূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে ঃ
ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য,
খ) জন শৃঙ্খলা রক্ষা,
গ) জন সাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন।' (সুত্র বাংলাদেশ সংবিধান)

এই সীমারেখার ভিতরে থেকে জাতীয় সংসদকে একটি অভিন্ন স্থানীয় শাসন আইন প্রনয়ন করতে হবে। তাতে বিবেচ্য হবে ঃ সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৭ ও ২৬ এর বাধা নিষেধ এড়িয়ে এবং অনুচ্ছেদ নং ২৭, ২৮ ও ২৯ এর নির্দেশকে অক্ষুন্ন রেখে আইন প্রণয়ন। এই আইন পাঁচটির ভাষ্য হলো;
'ক) অনুচ্ছেদ নং ৭। (২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন, এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।

খ) 'অনুচ্ছেদ নং ২৬। (মৌলিক অধিকার) (১) এই ভাগের (সংবিধানের তৃতীয় ভাগ) বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্য পূর্ণ, এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।' (২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না। এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপুর্ণ ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।'
গ) অণুচ্চেদ নং ২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।'

(ঘ) অনুচ্ছেদ নং ২৮/(১) কেবল ধর্ম গোষ্ঠী বর্ন নারী পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।
(ঙ) অনুচ্ছেদ নং ২৯/(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। (২) কেবল ধর্ম বর্ন ও গোষ্ঠী বর্ন নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ ও পদ লাভের অযোগ্য হইবে না, কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।'
এই সর্বোচ্চ আইনের অলঙ্ঘনীয় নিষেধাজ্ঞাকে এড়িয়ে অঞ্চলভিত্তিক পৃথক পৃথক স্থানীয় শাসন আইন প্রণয়ন সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২৮(৪) এর বিধানটি সহজ বাস্তবায়ন যোগ্য নয়। উক্ত আইনে বলা হয়েছে ঃ

'নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির

জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।'

এখানে কেবল উন্নয়ন মূলক বিধি বিধানই উদ্দিষ্ট, সংবিধানের অন্য কোন আইন লঙ্ঘন করা নয়। অন্য আইন ও বিধি বিধান অলঙ্ঘনীয়ই আছে এবং থাকবে। ২৮ নং অনুচ্ছেদের বাকি অংশে বলা হয়েছে ঃ

'(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

'(২) রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষেরা সমান অধিকার লাভ করিবেন।'

'(৩) কেবল ধর্ম গোষ্ঠী বর্ন নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জন সাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীতব্য বিধানাবলী ও মৌলিক অধিকার আইনের বাধ্য বাধ্যকতার ভিতর অবদ্ধ। তাই অনগ্রসরদের জন্য করণীয় বিধি বিধানগুলো এমনভাবে প্রণীত হতে হবে, যাতে অন্যদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন বা কারো প্রতি বৈষম্য আরোপিত না হয়। কিন্তু পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নিশ্চিতরূপেই অনুরূপ বাধ্যবাধকতা লঙঘন করেছে। এটি ২৮(৪) বিধির আওতায় প্রণীত হলেও তাতে এই অনুচ্ছেদের সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে। অনুচ্ছেদ নং ২৭, ২৮ ও ২৯ কেও তা ক্ষুণ্ন করেছে। সুতরাং অনুচ্ছেদ নং ৭(২) ও ২৬ (২) অনুসারে এই পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যশীল এবং অন্যান্য সম্প্রদায় অঞ্চল ও জনগণের পক্ষে বৈষম্য মূলক ও আপত্তিকর। এই বাধা বিপত্তিকে এড়ানোর উপায় হলো সংশোধন ও স্থানীয় বাঙ্গালীদের সমসুযোগ-সুবিধা প্রদান।

দফা নং 'খ/৩। অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।'

এই দফা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট আইনটি বৈষম্যমূলক। ধর্ম, বর্ন, সম্প্রাদায় ও শ্রেণী নির্বিশেষে বাঙ্গালীরা একটি সমষ্টি এবং তাদের সংখ্যা কয়েক কোটি। তাদের বিপরীতে উপজাতিরা কোন একক জাতিসত্তা বিশিষ্ট লোকের সমষ্টি নয়। উপজাতি টার্ম বা সংজ্ঞাটি তাদের নিজস্ব আরোপিতও নয়। তদুপরি পার্বত্য উপজাতীয়রা সংখ্যায় দেশ ভিত্তিক বাঙ্গালী জনসংখ্যার আধা শতাংশ মাত্র। স্থানীয়ভাবেও বাঙ্গালীরা উপজাতীয় সমষ্টির প্রায় সমান সংখ্যক। এমতাবস্থায় দেশের ৯৯% লোক সংখ্যা সম্বলিত বাঙ্গালীদের বিপরীতে উপজাতীয়দের প্রকৃত পরিচয় হবে অবাঙ্গালী। বাঙ্গালীরা ক্ষুদ্র তুচ্ছ অউপজাতীয় আখ্যায়িত হতে পারে না। এটি ব্যাকরণ রীতিতে ও অশুদ্ধ শব্দ প্রকরন। এ নামে তারা কারো দ্বারা কোথাও

সম্বোধিত হয় না। এটি তাদের পরিচয় ও নয়।
উপজাতীয়দের স্থানীয় হওয়া নিঃশর্ত। কিন্তু বাঙ্গালীদের তা শর্তাধীন। এটা বৈষম্য। বরং বাঙ্গালীরা স্বদেশী, আর উপজাতিরা বিদেশী বংশোদ্ভূত। তাই বাঙ্গালীদের নয় উপজাতিদের স্থানীয় হওয়া শর্তাধীন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নইলে উভয় সম্প্রদায়ই হবে নিঃশর্ত স্থানীয়। এর দ্বারা অপ্রিয় অতীত ইতিহাসকে খুঁড়ে তোলা হচ্ছে। এই আপত্তির সুত্রে এতদাঞ্চলে লোক আগমন নির্গমন ও বসতি বিস্তারের অতীত ইতিহাস জড়িয়ে যাচ্ছে, যা সুখকর নয়। তাছাড়া ভূমিহীন বাস্তুহারা বাঙ্গালী লোকেরা সংখ্যায় জাতীয় জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক, আর অবাঙ্গালীদের অনেকের, নাগরিকত্ব প্রশ্নাতীত নয়। এই যুক্তির ভিত্তিতে বর্ণিত (চুক্তি) দফাটি এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনটি অসঙ্গত। এটি কার্যকর হতে পারে না।

৫.
(তাং-বৃহস্পতিবার ১১ ভাদ্র ১৪০৬ বাংলা ২৬ আগস্ট ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

আইনে বাঙ্গালীদের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া প্রতিপক্ষীয় অবাঙ্গালী চীফদের দয়ার উপর নির্ভরশীল করে দেয়া হয়েছে, যারা কেবল প্রথাগত কিছু সামন্তীয় ক্ষমতার অধিকারী। অথচ প্রত্যয়ন ক্ষমতা বিশুদ্ধ সরকারী নির্বাহী কাজ, এবং স্বদেশে জন্মগত কারণে বাঙ্গালীদের স্থায়ী বসবাস প্রশ্নাতীত বিষয়। কেবল কোন বাহির্দেশীয় বাঙ্গালীর প্রশ্নেই, মীমাংসা সুত্র রূপে, আনুষ্ঠানিক প্রত্যয়ন পত্র জরুরী হতে পারে, যা জনপ্রতিনিধত্ব মূলক বা নির্বাহী ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্পাদনীয়।

অউপজাতীয় মানে কেবল বাঙ্গালী ও নয়, তালিকাভুক্ত ১১ উপজাতির বহির্ভূত অন্য সবাই। এখানে ঐ নামহীনদের দলে বাঙ্গালীরাও অন্তর্ভুক্ত। প্রতিনিধিত্ব আর সুযোগ-সুবিধার কোটা বন্টনের সময়, এই ইজমালী উহ্য পরিচিতি ফেকড়া সৃষ্টি করবে। যদি নেপালী মুরুং ইত্যাদি উপজাতি বহির্ভূত অবাঙ্গালী সম্প্রদায়গুলো, তাদের নাগরিক মৌলিক অধিকারের দাবীতে, রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে ন্যায্য অংশীদারিত্ব দাবী করে, তখন তাদেরকে সাংবিধানিক কারণেই তা দিতে হবে। তখন কি তারা উপজাতি তালিকাভুক্ত হবে, না বাঙ্গালীদের প্রাপ্য অউপজাতির কোটায় ভাগ বসাবে, এ বিষয়টি অনিশ্চিত। এ পর্যন্ত উপজাতি অর্থে তালিকাভুক্তদের, এবং অউপজাতীয় অর্থে একচেটিয়াভাবে বাঙ্গালীদের গণ্য করা হয়েছে। তা হলে বঞ্চিতদের উপায় কী? যে আদম শুমারী, সম্প্রদায়গত লোক সংখ্যা নির্ণয়ের সুত্র, সে আদম শুমারী ১৯৯১ নিম্নোক্ত সাম্প্রদায়িক চিত্রই প্রদান করেঃ

১। চাকমা	২৩৯৪১৭ জন	২৪.২০% (তিন পার্বত্য জেলা)
২। মার্মা (মগ)	১৪২৩৩৪ জন	১৪.৯৮% ৎ
৩। ত্রিপুরা	৬১১২৯ জন	৬.০১% ৎ
৪। তঞ্চঙ্গ্যা	২২০৪১ জন	২.২৫% ৎ

হইতে নির্বাচিত হইবেনঃ
জেলা পরিষদে সদস্য কোটা ঃ

	রাঙ্গামাটি	খাগড়াছড়ি	বান্দরবান
উপজাতীয় চেয়ারম্যান	১জন	১জন	১জন
ক) চাকমা	১০ জন	৯ জন	১ জন
খ) মারমা	৪ জন	৬ জন	১০জন
গ) তঞ্চঙ্গ্যা	২ জন	০ জন	১ জন
ঘ) ত্রিপুরা	১ জন	৬ জন	১ জন
ঙ) চাক	০ জন	০ জন	১ জন
চ) লুসাই	১ জন	০ জন	১ জন
ছ) পাংখু	১ জন	০ জন	০ জন
জ) খেয়াং	১ জন	০ জন	০ জন
ঝ) খুমি	০ জন	০ জন	১ জন
ঞ) ম্রো	০ জন	০ জন	৩ জন
ট) অউপজাতি	১০জন	৯জন	১১জন

আগে প্রদর্শিত সংখ্যার অনুপাত হিসাবে, উপজাতিদের ৫১% প্রতিনিধিত্ব এবং এককভাবে বাঙ্গালীদের ৪৯% প্রাপ্য। এ হিসাবে চেয়ারম্যান পদটি কেবল উপজাতিদের মধ্যে সংরক্ষিত করা অগণতান্ত্রিক। অথচ জনসংহতি সমিতি লিখিতভাবে সংবিধান ও গণতন্ত্রের প্রতি দৃঢ়ভাবে অঙ্গিকারাবদ্ধ। তাদের সে অঙ্গিকারটি এখানে স্মরণীয় ঃ

'এই পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ অগণতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, কর্মক্ষমতাহীন ও ক্রটিপুর্ণ। বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন ব্যাতিরেকে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ভূমিস্বত্ব ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভবপর নহে।' (সূত্র ঃ সংশোধিত পাঁচ দফা দাবীনামা পৃ ঃ ১) এই সাথে বিবেচ্য হলো চুক্তিভুক্ত সংবিধন মান্যতার অঙ্গিকার।

পরিতাপের বিষয় ঃ চুক্তিকারী পক্ষদ্বয় এই প্রশংসনীয় অঙ্গিকারগুলো বেমালুম অবহেলা করে, অগণতান্ত্রিক সুবিধাবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মহিলা প্রতিনিধিত্বের ব্যাপার, প্রশংসনীয় হলেও, তা বৈষম্যশূলক আর অপ্রতুল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ স্বীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৭, ১১, ২৭ ও ২৯ অনুযায়ী একটি বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক সমানাধিকারবাদী রাষ্ট্র। জনগণের অভিপ্রায়ই এর চালিকা শক্তি। জনপ্রতিনিত্ব মানে সুবিধাবাদী প্রাধান্য ও পদ সংরক্ষণ নয়। গণতন্ত্র মানে গরিষ্ঠ সংখ্যক নাগরিকের অভিপ্রায় সম্মত শাসন ব্যবস্থা। এটি গোষ্ঠীতন্ত্র নয়।
৬.

৫। মুরুং'	২২১৭৬ জন	২.২৬% ৎ
৬। বোম	৬৯৭৮ জন	০.৭১% ৎ
৭। চাক	২০০০ জন	০.১৯% ৎ
৮। খুমি	১২৪১ জন	০.১২% ৎ
৯। খিয়াং	১৯৫০ জন	০.১৯% ৎ
১০। লুসাই	৬৬২	০.০৭% ৎ
১১। ম্রো	১২৬ জন	০.০১% ৎ
১২। পাংখো	৩২২৭ জন	০.২৩% ৎ
১৩। উসাই	৭৬২ জন	০.০৭% ৎ
১৪। অন্যান্য অবাঙ্গালী	৬৮৮ জন	০.০৭% ৎ
১৫। বাঙ্গালী	৪৭২১০১ জন	৪৮.৩৩% ৎ

এখানে শুভঙ্করের ফাঁকি হলো ঃ মুরুং ও অন্যান্য অবাঙ্গালী সম্প্রদায় সহ মোট উপজাতীয় জনশক্তি হলো, স্থানীয়ভাবে ৫১.৬৭%। উপজাতি ও বাঙ্গালী বহির্ভুত অবাঙ্গালীরা হলো জনসংখ্যায় ২.৩৩%। এদের বাঙ্গালীদের দলভুক্ত করা হলে, বাঙ্গালীসহ ও উপজাতীয়দের সম্মিলিত সংখ্যা শক্তি হয়, ৫০.৬৬%। এই হিসাবে উপজাতীয় জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয় ৪৯.৩৪% তথা সংখ্যালঘু। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় আনুকুল্যও গণতান্ত্রিক প্রাধান্য উপজাতিদের অনুকূলে থাকতে পারে না। তা হবে বৈষম্য, বঞ্চনা, ও পক্ষপাতিত্বের শামিল। ন্যায় বিচারের স্বার্থে এসব বর্জনীয়। এই সুবিধাবাদী শ্রেণীকরণ, নতুন করে জন অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

দফা নং 'খ/৪ (ক) প্রত্যেকটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩টি আসন থাকবে। এসব আসনের এক তৃতীয়াংশ অউপজাতীয়দের অংশ হইবে।

(খ) ৪ নং ধারা উপধারা ১, ২, ৩ ও ৪ মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।'

স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯-তে কোন মহিলা আসনের ব্যবস্থা ছিলো না। এর সংশোধনী হিসাবে মহিলা আসনের সুযোগ সৃষ্টি অবশ্যই গ্রহণীয়। তবে পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সম্প্রদায় ভিত্তিতে জনসংখ্যার অনুপাত হারে প্রতিনিধিত্বের কোটা নির্ধারিত না হওয়া অযৌক্তিক আর অগণতান্ত্রিক। এখানে সংশ্লিষ্ট আইনে ভীষণ অবিচারের অবতারণা হয়েছে যথা সংশ্লিষ্ট আইন ঃ

'ধারা নং ৪ (স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯) পরিষদের গঠন ঃ (১) নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে পরিষ গঠিত হইবে। যথা ঃ

ক) চেয়ারম্যান একজন

খ) বিশজন উপজাতীয় সদস্য

গ) দশজন অউপজাতীয় সদ্য

২) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন। (৩) চেয়ারম্যান উপজাতীয় জনগণের মধ্য

(তাং-রোববার ১৪ ভাদ্র ১৪০৬ বাংলা ২৯ আগষ্ট ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

'খন্ড খ/(গ)। ৪ নং ধারার উপধারা (৫)-এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ডেপুটি কমিশনার এবং 'ডেপুটি কমিশনারের' শব্দ গুলির পরিবর্তে যথাক্রমে সার্কেল চীফের শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।'

প্রণীত সংশোধিত আইনটি হলো ঃ

ধারা নং '৫/(৮) কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রমত পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সার্কের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন অউপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।'

১৫ /(৯) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় কি না এবং হইলে তিনি কোন উপজাতির সদস্য, তাহা সার্কেল চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি উপজাতীয় হিসাবে চেয়ারম্যান বা কোন উপজাতীয় সদস্যপদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

এখানে প্রশ্ন হলো ঃ উপজাতীয় সার্কেল চীফেরা, স্বাধীন বাংলা দেশ রাষ্ট্রের পক্ষে কোন বৈধ কর্তৃপক্ষ কিনা। অনুরূপ ক্ষমতার অধিকার থাকা ছাড়া গুরুত্বপুর্ণ ও মৌলিক নাগরিকত্বের প্রশ্নে সার্টিফিকেট দানের ক্ষমতা বৈধ হতে পারে না। উপজাতীয় চীফেরা সার্বভৌম রাজক্ষমতার অধিকারী নন। তারা না নির্বাহী রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, না জন প্রতিনিধি। তাদেরকে সামন্ত প্রভূ, বা জমিদারও বলা যায় না। কারণ তাদের কোনরূপ ভৌমিক মালিকানা, রাজ্য বা জমিদারী নেই। তারা উপজাতীয় সর্দার রূপেই মাত্র স্বীকৃত। এটি হলো রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতামুক্ত অভিজাত পদমাত্র। তদুপরি তারা অউপজাতি খ্যাত বাঙ্গালীদের চীফ বা সর্দার নন। বাঙ্গালীরা তাদের প্রজাও নয়। খোদ উপজাতিরাও এখন স্বাধীন নাগরিক। তারা ঐ সর্দারের খাস বান্দাও নয়। পরাধীনতামূলক কোন কর্তৃত্ব এই স্বাধীন নাগরিকদের উপর এখন প্রযোজ্য নয়। পার্বত্য শাসন বিধিভুক্ত প্রচলিত কোন আইনে চীফদের অনুরূপ প্রভুত্বমূলক ক্ষমতার কোন উল্লেখ নেই। সংবিধান সম্মত কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসন আইনে, অনুরূপ কোন ক্ষমতাও অনুমোদিত নয়। শাসন প্রশাসন বাস্তবায়ন হলো নির্বাহী কাজ। এটির দায়িত্ব নির্বাচিত জন প্রতিনিধি ও আমলাদের। এই ক্ষেত্রে উপজাতীয় সর্দারদের কর্তৃত্ব অবৈধ। তারা উপজাতীয় পক্ষভুক্ত ও বাঙ্গালীদের প্রতিপক্ষও বটে। তাদের দ্বারা নিরপেক্ষ আচরণ অসম্ভব এবং দাতব্য সার্টিফিকেট প্রদান সঠিক নয়। তাদের বেগার চূড়ান্ত প্রত্যয়ন ক্ষমতার

কোন বৈধ ভিত্তি নেই। এই দায়িত্বটি তাদের পক্ষে অনিয়মিত ঐচ্ছিক ও বাধ্যবাধকতা মুক্ত। জনসাধারণ তাদের দ্বারা অবহেলা ও হয়রানীর শিার হবে, এবং এই ঐচ্ছিক চূড়ান্ত ক্ষমতার চর্চা জন্ম দিবে অন্যায় লেনদেন, মনোরঞ্জন ও অনুগ্রহের, যা বাঞ্ছিত নয়।

জেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের প্রত্যয়ন ক্ষমতা রহিত করা মানে, তার আইন সঙ্গত প্রশাসনিক ও সিভিল দায়িত্বের উপর হস্তক্ষেপ। এতদসংক্রান্ত স্থানীয় পরিষদ আইন সংশোধিত হলেও স্থানীয় মূল প্রশাসনিক আইন রেগুলেশন নং ১/১৯০০ এর অধীন প্রণীত পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইন যথাযথ বহাল আছে, যা স্থানীয় জেলা প্রশাসকদের অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী করেছে। তদনুযায়ী স্থানীয় চীফ, হেডম্যান ইত্যাদি প্রথাগত প্রধান এবং নির্বাচিত পরিষদ প্রধানরাও তার এখতিয়ারাধীন। তিনি একাধারে জেলা প্রশাসক, জেলা হাকিম ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি। স্থানীয় রাজা, প্রজা, চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সবাই তার এখতিয়ারধীন অধঃস্তন। এই পর্বতাঞ্চলের সমুদয় রাষ্ট্রীয় সম্পদ সম্পত্তি তার এখতিয়ারে ন্যস্ত। এসবের হস্তান্তর, খরিদ, বিক্রি, বন্দোবস্ত ও ইজারা তার চূড়ান্ত হুকুম সাপেক্ষ। তিনি বৈধ প্রধান প্রত্যয়ন কর্তাও বটে।

সংশ্লিষ্ট আইনগুলো নিম্নরূপ।

ক) রেগুলেশন নং ১/১৯০০ ধারা নং ৭। পার্বত্য চট্টগ্রাম হবে ডেপুটি কমিশনারের অধীন একটি জেলা। পার্বত্য চট্টগ্রাম, ফৌজদারী ও দেওয়ানী এখতিয়ার যুক্ত রাজস্ব ও সাধারণ বিষয়াদি সংক্রান্ত জেলা রূপে গঠিত হবে। ডেপুটি কমিশনার হবেন জেলা হাকিম। স্থানীয় সরকার কর্তৃক ৬নং ধারায় আদেশ জারি সাপেক্ষে বর্ণিত অঞ্চলের ফৌজদারী, দেওয়ানী রাজস্ব ও অন্যান্য সব ব্যাপার সংক্রান্ত সাধারণ প্রশাসন ডেপুটি কমিশনারের উপর ন্যস্ত হবে।

(খ) ধারা নং ১৭। নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন। (১) পার্বত্য চট্টগ্রামের সমূদয় কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের অধঃস্তন হবেন। তিনি এরূপ যে কোন কর্মকর্তার জারিকৃত আদেশ সংশোধন করতে পারবেন, যাদের মাঝে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর অথবা সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাব ডেপুটি কালেক্টর অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(গ) ধারা নং ৪৮। চীফদের অধিষ্ঠান এবং হেডম্যান নিযুক্তি ও বরখাস্ত করণঃ বাংলা সরকার কর্তৃক চীফদের অধিষ্ঠানকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। চীফদের সাথে আলোচনাক্রমে জেলা প্রশাসক হেডম্যান নিয়োগ করবেন। সংশ্লিষ্ট চীফকে জানান ক্রমে, জেলা প্রশাসক কর্তৃক তারা অযোগ্যতা বা অসদাচরণ হেতু বরখাস্ত হবেন। এতদোভয় ব্যাপারে চীফদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কাছে জেলা প্রশাসক বাধ্য হবেন না। তবে তাদের প্রতি পরিপূর্ণ বিবেচনা প্রদান করা হবে। এই নিযুক্তি উত্তরাধিকার সম্পন্ন নয়। তবে একজন ছেলে উপযুক্ত হলে, সে তার বাবার স্থলাভিষিক্ত হতে

পারবে।

৭.

(তাং-শনিবার ২০ ভাদ্র ১৪০৬ বাংলা ৪ সেপ্টেম্বর ৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)
(ঘ) ধারা নং ৪১ জুম নিয়ন্ত্রণ ও বিধিবদ্ধ করণঃ জেলা প্রশাসক জুম নিয়ন্ত্রণ ও তা বিধিবদ্ধকরণে এবং প্রয়োজনে অনুরূপ আদেশ জারি ও তা কার্যকর করণের ক্ষমতা রাখেন। তিনি যথেষ্ট কারণ বশতঃ যে কোন এলাকা জুম মুক্ত বলে ঘোষণা দিতে অথবা জুম স্থানান্তর বন্ধের আদেশ দিতে পারবেন। এর অতিরিক্ত ১/১৯ রেগুলেশনের আইন নং ১৮ এর ধারা উপধারায় ব্যক্ত ক্ষমতাবলী।

আর অধিক উদাহরণের প্রয়োজন নেই। বর্ণিত আইনগুলোই জেলা প্রশাসককে অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী করেছে। পার্বত্য অঞ্চল ভুক্ত রাজা প্রজা সহ প্রত্যেক অধিবাসী, স্বীয় জেলা প্রশাসকের এখতিয়ারে ন্যস্ত। স্থানীয় স্থায়ী বসিন্দা রূপে প্রত্যয়ন, জেলা প্রশাসকের নির্বাহীও দেওয়ানী এখতিয়ার ভুক্ত দায়িত্ব। তার এই ক্ষমতা স্থানীয় সরকার আইন ১৯৮৯ এবং জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ তে থাকা না থাকার উপর নির্ভরশীল নয়। মূল রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক আইন বহাল থাকা পর্যন্ত, জেলা প্রশাসকের প্রত্যয়ন ক্ষমতাটিও বজায় থাকবে। বরং জেলা পরিষদ আইনে প্রদত্ত চীফদের প্রত্যয়ন ক্ষমতা, জেলা প্রশাসকের আদালতে চ্যালেঞ্জযোগ্য। খোদ চীফদেরও প্রত্যয়নকারী কর্তপক্ষ হলেন জেলা প্রশাসক। এমতাবস্থায় জেলা পরিষদ আইনে চীফদের প্রত্যয়ন ক্ষমতা দানের অর্থ জেলা প্রশাসকদের প্রত্যয়ন ক্ষমতা ও আইনী এখতিয়ারের বিলোপ সাধন নয়। জেলা প্রশাসকের প্রদত্ত স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা পরিচয়যুক্ত সনদ বা সার্টিফিকেটের গুরুত্বই সর্বাধিক। অনুরূপ সার্টিফিকেটের বৈধতা ও গুরুত্ব চ্যালেঞ্জযোগ্য নয়।

জেলা প্রশাসক সার্বক্ষণিক ও নিরপেক্ষ সরকারী কর্মকর্তা, চীফেরা তা নন। এমতাবস্থায় প্রয়োজন মুহুর্তে, জেলা প্রশাসকদের পাওয়া নিশ্চিত হলেও, চীফদের বেলায় তা নয়। তারা মুক্ত স্বাধীন ও আত্মস্বার্থে ব্যতিব্যস্ত লোক। তাদের ঐচ্ছিক উপস্থিতির উপর মানুষের প্রয়োজন নির্ভরশীর নয়। সুতরাং চীফদের ইচ্ছা অনিচ্ছা আর অনুপস্থিতি, সার্টিফিকেট প্রত্যাশী নাগরিকদের পক্ষে সমস্যা হয়ে দেখা দিবে। এই জটিলতা কাম্য নয়। এই যুক্তিতে চীফদের চূড়ান্ত সার্টিফিকেট দান ক্ষমতা সঠিক ব্যবস্থা নয়। এমনিতেই অউপজাতীয় সংজ্ঞায়িত বাঙ্গালীদের প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা, এক তৃতীয়াংশে হ্রাস করে দেয়া হয়েছে। তদুপরি প্রতিপক্ষীয় চীফদের স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট দান অনিশ্চিত বলে, বিশেষতঃ নতুন বসতিকাবী বাঙ্গালীরা সার্টিফিকেট লাভে হয়রানীর শিকার হবে। উপজাতীয় আশীর্বাদ পুষ্ট তথাকথিত আদি বাঙ্গালীদের, নিজেদের ঘুটি রূপে ব্যবহারের উপজাতীয় খাহেশ, এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে বলে সন্দেহ করা যায়। চীফেরা উপজাতীয়

খাহেশ পুরণে কেবল আদি বাঙ্গালীদের সার্টিফিকেট দিলে, এবং নবাগতদের ঠেকিয়ে রাখলে, নির্বাচন হবে প্রহসনে পরিণত। এমনটি হবে না, এই আশাবাদ ও পোষণযোগ্য নয়। কারণ উপজাতীয় রাজনীতির ধারা নিরেট আত্মমুখী ও বাঙ্গালী বিরোধী।

জনসংহতি সমিতি আদৌ কোন বাঙ্গালী স্বার্থ সমর্থন করে না। পুরান বস্তিবাসী আদি বাঙ্গালী নামে বর্তমানে তারা যে দরদ দেখাচ্ছে, তা তাদের রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। আসলে আদি বাঙ্গালীদের লেজুড় ও বংশবদে পরিণত করতে এটি তাদের এক কুমতলব। তাতে বহিরাঞ্চলবাসী বুদ্ধিজীবীদের এই ধোকাও দেয়া যাবে যে, তারা সার্বিকভাবে বাঙ্গালী বিদ্বেষী নয়। অথচ পাঁচ দফা দাবী নামাই প্রামাণ্য দলিল যে, তাদের বাঙ্গালী দরদ ভূয়া। সংশ্লিষ্ট দফাগুলো এখানে দ্রষ্টব্যঃ

'দফা নং ৩ (১)। ১৭ আগস্ট ১৯৪৭ সাল হইতে যাহারা বেআইনীভাবে, পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ কারিয়া পাহাড় কিংবা ভূমি ক্রয় বন্দোবস্ত ও বেদখল করিয়া অথবা কোন প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয় বন্দোবস্ত ও বেদখল ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছ গ্রামে বসবাস করিতেছে, সেই সকল বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া।

দফা নং ৫ (৪)। বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল হইতে আসিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ, বসতি স্থাপন, পাহাড় ও ভূমি ক্রয় বন্দোবস্ত, হস্তান্তর ও বেদখল বন্ধ করা।
(৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছ গ্রামে বসবাসরত বহিরাগতদেরকে, পর্যায়ক্রমে, পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অনতিবিলম্বে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া।' (সুত্র ঃ পাঁচ দফা দাবীনামা)।

উপরোক্ত বক্তব্যে নতুন পুরাতন আদি ও অনাদির কোন রেহাই ও তফাৎ নেই। এমন কি খাঁটি চট্টগ্রামবাসীদেরও কোন কনসেশন দেয়া হয়নি। কিছু দিন যাবৎ সমিতির নেতৃবৃন্দ বলতে শুরু করেছেন ঃ বাঙ্গালী প্রত্যাহারে আওয়ামী সরকারের সাথে তাদের মৌখিক চুক্তিও হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় নতুন পুরাতন কোন বাঙ্গালীর প্রতি জনসংহতি সমিতির লেশমাত্র সহানুভূতি নেই। পরিষদীয় নির্বাচনে তাদের সদস্য পদ প্রাপ্তিকে, অকার্যকর করে তুলতে তারা যে সক্রিয় তা নিঃসন্দেহ। এই ক্ষেত্রে তাদের চেষ্টা হবে নবাগতদের ঠেকিয়ে রাখা ও পুরাতনদের নিয়ে তাবেদার সৃষ্টি। চীফ ও উপজাতীয়দের মোটিভেট করে ঐ লক্ষ্য অর্জনে সফল হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব।

সদস্য পদের কোটা, নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন লাভ নিশ্চিত করলেও সাম্প্রদায়িক বিরূপ মনোনয়ন ও বিরুদ্ধ ভোটের ফল স্থানীয় পরিষদে বাঙ্গালীদের বিজয় অর্জন নিশ্চিত করবে না। বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের অপ্রিয় ভাজন ব্যক্তি. প্রতিপক্ষ সম্প্রদায়ের সমর্থন ও

ভোটে বিজয়ী হলে তাতে সদস্য পদে সাম্প্রদায়িক কোটা ঠিক থাকলেও, তাদের দ্বারা বাঙালী পক্ষে বাঞ্ছিত সুফল ফলবে না। দ্রষ্টব্য অউপজাতীয় সদস্য পদ কোটা ঃ

নারী/পুরুষ	রাঙ্গামাটি	খাগড়াছড়ি	বান্দরবন
পুরুষ	১০ জন	৯ জন	১১ জন
নারী	১ জন	১ জন	১ জন

৮.

(তাং-রোববার ২৯ ভাদ্র ১৪০৬ বাংলা ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ খ্রীঃ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

চীফদের দ্বারা প্রদেয় স্থানীয় স্থায়ী উপজাতি আর অউপজাতি পরিচিতির সনদ দান কোন আইনে সমর্থিত, এবং তারা কেমন করে এমন চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ, এ বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার। চীফদের পদ ও ক্ষমতা বৃটিশ ঔপনিবেশিক আইন রেগুলেশন নং ১/১৯০০ এর অধীন প্রণীত পার্বত্য অঞ্চল শাসন বিধির ধারা নং ৪৮ ছাড়া অন্য কোন আইন ও আদেশে সুনির্দিষ্ট নয়। এটা বৃটিশ উপনিবেশিক আমলের ধারাবাহিকতা। তারা তৎপূর্বকালে এতদাঞ্চলে ছিলেন কিনা, এবং থেকে থাকলে এতদাঞ্চল ও তার অধিবাসীদের উপর তাদের অধিকার ও ক্ষমতা কিরূপ ছিলো, তা পূর্ববর্তী কোন রেকর্ড পত্রের দ্বারা সমর্থিত নয়। পূর্ববর্তী ত্রিপুরা, রোসাং ও মোগল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, মাং, বোমাং ও চাকমা সর্দারদের কোনরূপ ক্ষমতা সনদ প্রদত্ত হয়নি। অথচ ইতিহাস বলে, বৃটিশ আমলের আগে, এতদাঞ্চল ছিলো মোগল শাসনাধীন। তৎপূর্বে দীর্ঘকাল এতদাঞ্চল ছিলো আরাকানের রোসাং দখলাধীন, এবং ঐ আমলে ত্রিপুরা কর্তৃক ও এটি আংশিক ও সাময়িক শাসিত হয়েছে। সে আমলে এই ত্রয়ী সর্দার গোষ্ঠী অনুপস্থিত। বোমাংরা আরাকানী রাজ রক্তধারী এ দাবীটি তাদের নিজেদের মাঝেই বিতর্কিত। মাং বোমাং ওচাকমা সর্দারদের এরূপ প্রাচীন আভিজাত্য তো কেবল তাদের নিজস্ব গল্প কথায়ই সীমাবদ্ধ। একমাত্র বৃটিশ কর্তৃপক্ষই তাদের আভিজাত্যের প্রবর্তক। চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৃটিশ কালেক্টর মিঃ স্মিত কর্তৃক চাকমা সর্দার মাননীয়া কালিন্দি বিবিকে লিখিত চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। চট্টগ্রামের নিজামপুর সড়ক থেকে, পূর্বের কুকি রাজ্য ও উত্তরের ফেনী নদী থেকে মধ্যবর্তী শঙ্খ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে চট্টগ্রামের প্রথম বৃটিশ শাসক মিঃ হেরি বেরেলষ্ট সূত্রে প্রয়াত চাকমা প্রধান শেরমস্ত খাঁর জমিদারী বলে বর্ণিত । এটাই একমাত্র প্রদর্শনীয় দলিল, যা চূড়ান্ত ক্ষমতার স্মারক নয়। প্রথমতঃ স্বীকৃত ঐ জমিদারী কোন রাজ ক্ষমতা নয়। আসল ক্ষমতার মালিক হলেন জমিদারী মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ। ঐ চিঠিতেই আছে ঃ এলাকাটি হলো সরকারের কার্পাস মহালভুক্ত অঞ্চল যেখানে জুম চাষ সূত্রে একশনা নোয়াবাদ বন্দোবস্তি দেয়া হতো। ঐ বন্দোবস্তি ছিলো সরকারকে কার্পাস তুলা ও জুম খাজনা সরবরাহের অঙ্গিকার সম্পন্ন অস্থায়ী

ব্যবস্থা। শের মস্ত খাঁকে প্রদত্ত কুদালা ভুক্ত ঐ জুম নোয়াবাদ বন্দোবস্তিটির নাম ছিলো তরফে শুকদের রায়। আসলে এলাকাটি ছিলো দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ার শিলক উপত্যকাভুক্ত কিছু নির্দিষ্ট অনাবাদী পাহাড়ী জমি। ঐ বন্দোবস্তির সুত্রে শেরমস্ত খাঁও তার উত্তরাধিকারীরা পূর্ব-উত্তর ও উত্তর দিকে তাদের প্রভাব ও জুম চাষ এলাকার বিস্তার ঘটান। সরকারী কর্তৃপক্ষ জুমকর ও তুলার বর্ধিত সরবরাহে সন্তুষ্ট হয়ে, তৎপ্রতি নীরব অনুমোদন দান করেন। বর্ণিত এই শেরমস্ত খাঁ হলেন প্রথম আরাকান ত্যাগী চাকমা প্রধান। যিনি ১৭৩৭ সালে চট্টগ্রামের মোগল শাসক জুলকদর খানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন, ও ক্ষুদ্র সংখ্যক অনুসারী একদল চাকমাসহ বর্ণিত কোদালা উপত্যকায় পুনর্বাসিত হোন। তিনি নিঃসন্তান মারা গেলে আরাকান ত্যাগী মূল চাকমা সরদার শের জব্বার খাঁন তার স্থলাভিত্তিক হোন। এবং সেই সাথে বিপুল চাকমা জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে। যতটুকু জানা যায়, তাতে পরিষ্কার যে শের মস্ত খাঁন ১৭৫৮ সালে মারা যান, এবং স্বীয় পালিত পুত্র শুকদেব রায় ও তৎপুর্বে নিঃসন্তান ইহলোক ত্যাগ করেন। তৎপর উত্তরাধকারী রূপে আবির্ভুত হোন মূল জাতীয় সর্দার শের জব্বার খাঁন, যিনি ১৭৪৯ সালে আরাকানে অবস্থিত মূল চাকমা সম্প্রদায়ের সর্দার রূপে অভিষিক্ত হয়েছিলেন, এবং তিনি শেরমস্ত খানের নিকটতম জ্ঞাতি ভাই ও ছিলেন। শের জব্বার খান ১৯৬৫ পর্যন্ত জীবিত থাকায় বলা যায় মাত্র সাত বছর পর্যন্ত তার এ দেশীয় কার্যকাল সীমাবদ্ধ ছিলো। তখন বৃটিশ আমলের শুরুকাল।

দ্বিতীয় সর্দার বংশ বোমাংদের প্রথম পুরুষ কংহ্লাপ্রু ১৭৭৪ সালে কিছু সঙ্গী সাথীসহ আরাকান ত্যাগ করে বৃটিশদের আশ্রয়ে, চকোরিয়া থানা এলাকার হারবাং অঞ্চলে এসে পুনর্বাসিত হোন। এই ব্যক্তির এতদাঞ্চলে কিছু পূর্ব ঐতিহ্য ছিলো। তিনি ছিলেন দক্ষিণ চট্টগ্রামে পরাজিত শেষ আরাকানী শাসক। তৃতীয় সর্দার বংশ মাংদের প্রথম পুরুষ হলেন ১৭৮৪ সালের আরাকানী উদ্বাস্তু সর্দার ম্রাচাই। এখন তার রক্তধারা নিঃশেষিত। তার শেষ বংশধর মাননীয় মাং সর্দার মং প্রু সাইন ১৯৮৪ সালে নিঃসন্তান মারা গেছেন। এখন পরবর্তী সর্দার পদটি বিচারাধীন ও বিতর্কিত।

এই সর্দারদের স্বীকৃতি ও ক্ষমতার উৎস হলো রেগুলেশান ১/১৯০০ এর অধীন রচিত পার্বত্য অঞ্চল শাসন বিধি, তাতে তাদের ক্ষমতার পরিধি নির্দিষ্ট করে যে আইন আছে, তা এখানে বিবেচ্য, যথা ঃ

পার্বত্য শাসন আইন ধারা ৩৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল, তিন চীফের সার্কেল যথা, চাকমা চীফ, বোমাং চীফ মাং চীফ, এবং মাইনী উপত্যকা নিয়ে গঠিত হবে।

ধারা নং ৩৭। মৌজা। জেলার সংরক্ষিত বন বহির্ভুত সমুদয় এলাকাকে জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিভিন্ন মৌজার আকারে খন্ডিত ও সে সমূহের সীমানা চিহ্নিত করা

হয়েছে।

ধারা ৩৮। সার্কেল ও মৌজা শাসন। সার্কেল চীফদের নিয়ে জেলা প্রশাসকের জন্য একটি পরামর্শ পরিষদ গঠিত হবে। তারা জেলা প্রশাসককে নিজ নিজ সার্কেলের প্রশাসন সংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ দান সহ সহায়তা করবেন, এবং চীফের ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজ নিজ সার্কেলাধীন মৌজা সমুহে দ্রুততার সাথে জেলা প্রশাসকের সমুদয় আদেশ কার্যকর করবেন। তারা নিজেদের সার্কেলের প্রতিটি অংশ সময়ে সময়ে পরিদর্শন করবেন এবং এটা নিশ্চিত করবেন যে, মৌজা হেডম্যানদের রাজস্ব উশোল, সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রশাসন কাজ দক্ষতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। তারা নিজ নিজ সার্কেলে শিক্ষার প্রসার ও মৌজাবাসী লোকজনের স্বাস্থ্য ও বৈষয়িক অবস্থার উন্নয়নে প্রভাব খাটাবেন। তারা কোন রকম জবরদস্তিমূলক দাবী দাওয়া আরোপ করবেন না ও নিজেদের পক্ষে লোকজনকে বিনা পারিশ্রমিকে বেগার খাটাবেন না।

মৌজা হেডম্যানেরা তাদের নিজ নিজ মৌজার খাজনা যথাযথ উশোল করবেন ও তা রাজস্বের হিসাব খাতে জমা দিবেন। তারা জেলা প্রশাসক মহকুমা প্রশাসক ও সার্কেল চীফদের আদেশ পালন করবেন। তারা নিজ নিজ মৌজায় শান্তি-শৃঙ্খলা বহাল রাখবেন এবং মৌজাধীন পাড়া পরিবেশের পরিবর্তনশীল অবস্থা, জনসংখ্যা ও উৎপাদন সংক্রান্ত পরিবর্তনের তথ্যাদি জেলা প্রশাসককে জানাবেন।

ধারা নং ৩৯। জেলা প্রশাসক, চীফদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপুর্ণ বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করবেন। এই উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে বছরে অন্ততঃ দুটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যে সভায় চীফ অথবা তার প্রতিনিধি আহুত হবেন।

উক্ত সভা জেলা প্রশাসকের ইচ্ছানুসারে তার সিদ্ধান্ত মতে, বিভাগীয় কমিশনারের সাথে আলোচনা ক্রমে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, রামগড়, মানিকছড়ি অথবা চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হবে।

৯.

(তাং-রোববার ১৪০৬ সালে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)
ধারা নং ৪০। চীফ ও হেডম্যানদের প্রশাসনিক ক্ষমতা। এই আইনে ভিন্ন কিছু থাকা ব্যতিরেকে মৌজা হেডম্যানেরা নিজ নিজ মৌজার বাসিন্দাদের দ্বারা উত্থাপিত বিরোধ সমূহের বিচার সম্পন্ন করবেন। তারা পক্ষ সমুহের সামাজিক রীতি নীতি অনুযায়ী উপজাতীয় মামলাদি নিস্পন্ন করবেন। তাতে ক্ষমতা হলো ২৫ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ মূলক অর্থদন্ড আরোপ এবং জেলা প্রশাসকের আদেশ লাভ পর্যন্ত আসামীদের আটক করে রাখা।

এই আইনে ভিন্ন কোন ব্যবস্থা না করা হলে চীফেরা তাদের খাস মৌজার হেডম্যান হিসাবে তথাকার বিরোধ সমূহের বিচার কাজ সম্পাদন করবেন। এবং ঐ সব উপজাতীয় মামলাদির বিচার কার্য চালাবেন, যে গুলো হেডম্যানদের রায় শেষে অথবা হেডম্যান হিসাবে তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে ও উত্থাপিত হবে। চীফদের ৫০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ মূলক অর্থ দন্ড আরোপের ক্ষমতা থাকবে এবং এতদ ব্যাপারে তারা জেলা প্রশাসকের আদেশ পাওয়া পর্যন্ত আসামীদের আটক করে রাখতে পারবেন। উপজাতীয় মামলাদি ও সে সবের রায় সমূহ জেলা প্রশাসকের পুনরবিচার এখতিয়ার সাপেক্ষ এবং তা-ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

যেসব মামলায় চীফ বা হেডম্যানেরা আরোপিত শাস্তি কার্যকর করতে অপারগ হবেন সেগুলোর জন্য তারা সাহায্য চেয়ে জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করতে পারবেন। চীফ বা হেডম্যানদের কাছে বিচারাধীন উপজাতীয় মামলা সমূহে কোন রূপ কোর্ট ফি আরোপিত হবে না। অনুরূপ মামলায় আরোপিত অর্থ দন্ড, যদি কোন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ থাকে তবে তাকে, এবং সার্বিকভাবে সমাজকে, উপজাতীয় রীতি নীতি অনুসারে বরাদ্দ করা হবে। উপজাতীয় রীতি নীতির অনুমোদন অনুসারে সমাজের প্রাপ্য ইজমালী অর্থদন্ডের অংকে, চীফ ও হেডম্যানদের একাংশ প্রাপ্য হবে। কোন অজুহাতেই কোন রূপ নজর বা অন্য কোন রূপ পাওনা, সে যে ধরনেরই হোক, এ জাতীয় উপজাতীয় মামলায় আরোপ করা যাবে না।
তবে চীফ ও হেডম্যানেরা জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদিত পরিমানে, মামলা গুলোর পক্ষে ব্যয় নির্বাহযোগ্য ফি, আরোপ করতে পারবেন।
এই আইনের অধীন চীফ ও হেডম্যানদের নিকট দায়ের যোগ্য উপজাতীয় মামলা ব্যতীত কোন ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা পরিচালনার ক্ষমতা তাদের থাকবে না, যদি না গভর্নর কর্তৃক কোন সময় তাদের অনুরূপ ক্ষমতা দেয়া হয়। এই আইনে চীফ ও হেডম্যানদের, অনুশীলনযোগ্য সমুদয় ক্ষমতার উপর জেলা প্রশাসকের সাধারণ পুনরবিচার ও ভিন্নতা করার এখতিয়ার থাকবে।
নিম্ন বর্ণিত অপরাধ সমূহ এই আইনের অধীন চীফ ও হেডম্যানদের দ্বারা বিচার্য বিষয় সমূহের বহির্ভুত থাকবে
যেমন ঃ

(১) রাষ্ট্র ও রাজকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনুষ্টিত অপরাধ ও প্রচলিত আইনে বিচার যোগ্য অপরাধ সমুহ।

(২) ঐ সব দাঙ্গা হাঙ্গামা, যেগুলোতে গুরুতর জখম সংঘটিত অথবা মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

(৩) কোন ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত নিম্নোক্ত গুরুতর অপরাধ সমূহ যথা ঃ হত্যা, গণহত্যা, স্বেচ্ছায় গুরুতর জখম করা, অন্যায় অবরোধ, ধর্ষণ, চুরি, রাহাজানি, ছিনতাই এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক অপরাধ।

(৪) অপহরণ, রাহাজানি, ডাকাতি, গুম করা অনধিকার প্রবেশ বা ঘর ভাঙ্গা ও

৫০ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি হস্তাগত করা।

(৫) জালিয়াতি

(৬) পার্বত্য চট্টাম রেগুলেশন ১/১৯০০ এর অধীন প্রণীত পার্বত্য অঞ্চল শাসন বিধির অধ্যায় ৪ এর অধীন অনুষ্ঠিত অপরাধ সমূহ, অন্য কোন প্রকার বা শ্রেণীর অপরাধ, যা বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক এতদসঙ্গে নির্দিষ্ট হবে।

ধারা নং-৪১ (ক) হেডম্যান স্বীয় মৌজাধীন প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহ রক্ষায় দায়ী থাকবেন। এ জন্য যে কোন হেডম্যান
স্বীয় মৌজাধীন বনের বাঁশ, গাছ ও অন্যান্য বনজ দ্রব্য যা গৃহস্থালী প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন কাজে তার নিজ মৌজার বাসিন্দা বা অন্য অনাবাসী কর্তৃক যেকোন কাজে হস্তান্তর নিষিদ্ধ করতে পারবেন।

(খ) তিনি স্বীয় মৌজার যে কোন এক বা একাধিক এলাকা এই উদ্দেশ্যে জুম চাষ থেকে বাদ দিতে পারবেন যে এলাকা বা এলাকা গুলো মৌজার প্রয়োজনীয় বাঁশ, গাছ ও অন্যান্য বনজ দ্রব্যের জন্য সংরক্ষিত বন রূপে ধরে রাখা প্রয়োজন।

(গ) তিনি নবাগতদের নিজ মৌজায় জুম চাষ থেকে বিরত রাখতে পারবেন, যদি তার ধারণা হয় যে, তাতে ভবিষ্যতে তার নিজ মৌজাধীন প্রজাদের জুম করনে অভাব দেখা দিবে।
(ঘ) তার নিজ এলাকায় জুম চাষের জন্য ক্ষতিকর মনে হলে, তিনি নিজ মৌজায় যে কোন ব্যক্তির পশুচারণ বারণ করতে পারবেন।

ধারা নং-৪৭। চীফের খাস মৌজাঃ বিভাগীয় কমিশনারের মঞ্জুরী ক্রমে তিনি যে মৌজার বাসিন্দা সেটি নিজের খাস মৌজা রূপে ধরে রাখতে পারবেন, এবং এই ক্ষেত্রে তিনি চীফের প্রাপ্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধাদির অতিরিক্ত হেডম্যানের প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদি ও ততদিন ভোগ করার অধিকারী হবেন, যতদিন পর্যন্ত তিনি হেডম্যান ও মৌজার কর্তকর্তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে থাকবেন। এখানে উল্লেখ্য যে ধারা ৪৮ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক কোন চীফ ও ও হেডম্যানের ইচ্ছায় অনিচ্ছার কাছে বাধ্য নন।

এখানে প্রচলিত আইনগুলোর উদৃতি এটাই প্রমাণ করে যে, চীফেরা জেলা প্রশাসকের নির্বাহী ও দেওয়ানী ক্ষমতার আওতাধীন লোক। তাদের ক্ষমতা কেবল উপজাতীয় মামলার মীমাংসা জুম কর আদায়, সরকারকে রাজস্ব সরবরাহ করা, আর শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় জেলা প্রশাসককে সহায়তা দান। তাদের আরো দায়িত্ব হলো পাড়া পরিবেশের পরিবর্তন, ফল ফসল, জনসংখ্যা, শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদির ব্যাপারে জেলা প্রশাসককে তথ্য ও পরামর্শ দান। অথচ এই আসল দায়িত্বগুলো পালনে তারা হামেশাই নিষ্ক্রিয়। সর্দারী পদ ও নিযুক্তিকে পুঁজি করে, তারা কেবল নিয়মিত সম্মান, মাসোহারা ও কমিশন ভোগ করছেন।

নির্বাহী ও দেওয়ানী ক্ষমতাধীন প্রত্যয়ন ক্ষমতা কোন আইনেই চীফদের প্রাপ্য নয়। এটা জেলা প্রশাসকদের এখতিয়ারাধীন বিষয়। স্বাধীন এই দেশে নির্বাচিত ও কর্মকর্তা রূপে নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছাড়া অন্য কোন নার্গরিক কর্তারূপে মান্য হতে পারেন না। এমনিতে পার্বত্য শাসন আইন সাংবিধানিকভাবে অনুমোদিত নয়। এমন একটি পরিত্যক্ত আইনই হলো চীফদের, পদ মর্যাদা ও ক্ষমতার ভিত্তি। তাকে অবলম্বন করে, তাদের সাটিফিকেট দাতা চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষে উন্নীত করা মানে ক্ষমতাধর রাজায় পরিণত করা। সংশ্লিষ্ট সংসদীয় আইনটি চীফদের উপর রাজ ক্ষমতা আরোপেরই শামিল। হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল ও তাদের জন্য অনুরূপ ক্ষমতা অনুমোদন করে না।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কি নাগরিকদের স্বাধীনতা বিলোপও তাদের প্রতি পরাধীনতা আরোপের ক্ষমতা রাখে? পার্বত্য অধিবাসীরা কি তিন চীফের স্বামন্তীয় প্রজা? চীফেরা জি জমিদারী বা রাজ ক্ষমতার অধিকারী? রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধি বা রাজা হওয়া ছাড়া তো কারো উপর ক্ষমতার অধিকার বর্তায় না।

এটা পরিষ্কার যে, চীফেরা কোন প্রকৃত রাজা সরকারী কর্মকর্তা বা জনপ্রতিনিধি নন। তাদের রাজ পদ সম্মান জনক পদবী মাত্র। তারা সার্বভৌম ক্ষমতাধর নৃপতি নন। তাদের সরকারী রাজ পদবি লাভের ইতিহাস হলো ঃ

'পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজারা দেশের সার্বভৌম কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত নন বরং সাধারণ জুমিয়া, কুকি ও অন্যান্য অধিবাসীদের দ্বারাই রাজা অভিহিত। (সুত্র ঃ চট্টগ্রামের কমিশনারকে লিখিত রাজস্ব চিঠি নং ১৪৯৯, তাং ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৬৬) এই যুক্তি ও তথ্যের আলোকে বলা যায়, আওয়ামী সরকার এক আজগৌবী চীফ তন্ত্র তথা রাজতন্ত্রকে পার্বত্য অধিবাসীদের ভাগ্য বিধাতা বানিয়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। এই ব্যবস্থা সংবিধানের ধারা নং ১, ৭ ও ১১ এর পরিপন্থী। তাতে বলা হয়েছে ঃ

অনুচ্ছেদ নং ১। প্রজাতন্ত্র। বাংলাদেশ একটি একক স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র. যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে।

'অনুচ্ছেদ নং ৭। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।

অনুচ্ছেদ নং ১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।
সুতরাং চীফদের স্থানীয় বাসিন্দা সনদ প্রদানের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ও তার পক্ষে রচিত আইন সম্পুর্ণ বেআইনী। এটা নাগরিকদের স্বাধীন মর্যাদার পরিপন্থী
১০
(তাং-শনিবার ১০ আশ্বিন ১৪০৬ বাংলা ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

দফা নং-ক ৫/৭ চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন ইহা সংশোধন করিয়া চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার এর পরিবর্তে হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন, অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।
এই সংশোধনীয় অনুকূলে নিম্নোক্ত আইন প্রণীত হয়েছে ঃ

পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ধারা নং ৯। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ। চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যপদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নিম্নলিখিত ফরমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারপতির সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন........।

এখানে প্রশ্ন হলো ঃ চুক্তিতে হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি কর্তৃক কেবল সদস্যদের শপথ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, চেয়ারম্যানদের শপথ গ্রহণের কথা তাতে নেই। অথচ প্রণীত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে চেয়ারম্যানদের শপথের কথাও যুক্ত আছে। এটা চুক্তির এক তরফা সংশোধন। এর জন্য উভয়পক্ষের একটি সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষর করা জরুরী ছিলো। সুতরাং এই সংশোধনের কোন বৈধ ভিত্তি নেই।

হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারকের এখতিয়ার দেশ ভিত্তিক ব্যাপক। ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পন্ন দেশে হাইকোর্টের এখতিয়ার প্রদেশ বা অঙ্গ রাজ্য ভিত্তিক। তাই এ কথা ভাবার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, বর্ণিত শপথ গ্রহণ ব্যবস্থা কেবল আঞ্চলিক পরিষদকে নয়, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে ও ফেডারেশনভুক্ত অঙ্গরাজ্যের মর্যাদায় উন্নীত করে দিয়েছে। এই উচ্চাভিলাষী সংশোধন ভিত্তিক মর্যাদা বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১ এর লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, যা বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে এককেন্দ্রিক কাঠামো ও মর্যাদায় উন্নীত করেছে। পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের শপথ বিভাগীয় কমিশনারের দ্বারা অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখা হলে, তা মর্যাদায় প্রশাসনিক কাঠামোতে সীমাবদ্ধ থাকতো। সুতরাং সংশোধিত শপথ গ্রহণ ব্যবস্থাটি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদকে আঘোষিতভাবে স্বায়ত্তশাসিত অঙ্গরাজ্যের মর্যাদায় উন্নীত করে দিয়েছে। এতে এই তিন জেলা পরিষদ তিন রাজ্য বা প্রাদেশিক পরিষদে এবং এই তিনের সমন্বয়ে গঠিত আঞ্চলিক পরিষদ একটি মিনি ইউনিয়ন রাজ্যে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও সরকার ব্যবস্থা অনুযায়ী ফেডারেল রাষ্ট্রে, একাধিক ইউনিয়ন রাজ্য ও মিনি ফেডারেশনের সংস্থান করা হয়। ফেডারেশন হলো শিথিল ও সমন্বিত রাষ্ট্রীয় কাঠামো। কিন্তু বাংলাদেশ হলো একটি বিশুদ্ধ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এর কাঠামোকে শিথিল ও সমন্বিত করার উপায় নেই। এর ৯৯% জনগোষ্ঠী বাঙ্গালী হওয়ায়

জাতীয়তায় ও এককেন্দ্রিকতা বিদ্যমান। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ৯৯% বাঙ্গালী চরিত্র সম্পন্ন। অবশিষ্ট ১% কোন একক এলাকা ও জনগোষ্ঠীর দ্বারা অধ্যুষিত নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অবাঙ্গালীরা জনসংখ্যার জত(১,২) % মাত্র, এবং তাদের অধ্যুষিত বসতি অঞ্চলটি গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের ১০% এর ও কম। এতদাঞ্চলের বৃহদাংশ সরকারী খাস পাহাড় বন ও হ্রদ। প্রথাগতভাবে অবাঙ্গালীদের একাংশ ঐ খাস পাহাড় ও বনে বিনা বাঁধায় জুম চাষ করলেও, তাতে তাদের কোন ভূমি মালিকানা নেই। প্রথাগত মালিকানা একটি ভূয়া দাবী। এই উপমহাদেশীয় ভূমি মালিকানার ইতিহাসে, প্রথাগত ভূমি মালিকানার কোন স্বীকৃতি নেই। পাশ্চাত্য শক্তিগুলো দেশে দেশে আদিবাসীদের হত্যা ও বিতাড়ণ শেষে সে সব দখল করে নিয়েছে। আজকাল বিবেকের তাড়ানায় তাদের জন্য মায়া কাঁন্না কাঁদছে। এই মায়া কান্নারই অংশ হলো ঃ আদিবাসী দরদ, মানবতাবাদ ও প্রথাগত ভূমি অধিকারের আওয়াজ। এটি বাংলাদেশের জন্য এক ফাঁদ। তত্বীয় অর্থে এদেশে কোন আদিবাসী, পাহাড়ী ও উপজাতি নেই। আছে ভিন্ন পরিচয় যুক্ত সংখ্যা লঘু। তারা সভ্য স্বাধীন গর্বিত বাংলাদেশী জাতি। এখানে তারা অবাঙ্গলী সংখ্যালঘু।

রাজ্য মর্যাদার প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতিটাই এই পরিষদীয় আইনের প্রধান আপত্তিকর বিষয়। এই পরিষদীয় ক্ষমতা সুসংহত হলে ভবিষ্যতে তা থেকে পিছানো অসম্ভব হবে, আর এটাই হবে প্রকাশ্য স্বায়ত্তশাসন ও রাজ্য ক্ষমতা লাভের অগ্রবর্তী যুক্তি। এটা বাংলাদেশকে ফেডারেল রাষ্ট্রে পরিণত করার পথে পদক্ষেপ বা অগ্রগতি বলেও যুক্তিপদর্শন করা যায়। তেমন অবস্থায় এতদাঞ্চলে বিছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। চরমপন্থী উপজাতিদের লক্ষ্য তা-ই। এখন যারা চুক্তি বিরোধী ও বৃহত্তরও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনকামী তারাই হবে ভবিষ্যতে স্বাধীনতা বাদী স্বশাসন বা আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবিদার। এই রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষকে উস্কে দিচ্ছে এই পরিষদীয় ব্যবস্থা ও শপথ গ্রহণ প্রক্রিয়া।

ব্যবস্থাটি অবাঙ্গালীদের জন্য নিরেট সান্ত্বনামূলক ভাবার অবকাশ নেই। বরং এ কারণে আশংকাজনক যে, এর দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে দেশকে যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করার আগাম ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে গেছে, যে জন্য জাতি এখনো প্রস্তুত নয়। আওয়ামী সরকার তার জনকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে এখানে পদদলিত করেছে। নতুবা মুসলিম বাদশাহী আমল থেকে গোটা ভারতীয় উপ মহাদেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ই শাসিত হয়েছে। বৃটিশ আমল আর পাকিস্তান আমলেও তা অব্যাহত ছিলো। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই আমাদের দীর্ঘকাল লালিত ঐতিহ্য। আমরা ঐ ব্যবস্থার সাথে অভ্যস্ত। একক কাঠামো ভিত্তিক দেশ গঠনের পক্ষে জনমত কখনো সোচ্চার ছিলো না। কিন্তু সংবিধান রচনা কালেই পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে গুরুতর বিপত্তি দেখা দেয়। সংসদে পার্বত্য প্রতিনিধি মনবেন্দ্র নারায়ণ লারমা দাবীকরে বসেন ঃ পার্বত্য অঞ্চলবাসী অবাঙ্গালীরা বাঙ্গালী নয় পৃথক জাতিসত্তার লোক। তাদের স্বায়ত্তশাসন ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রাপ্য।

রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ভাবে এ দাবীর মীমাংসার অপেক্ষা না করে, এম এন লারমা বিদ্রোহাত্মক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যান। গঠিত হয় রাজনৈতিক দল ঃ পার্বত্য জনসংহতি সমিতি ও অস্ত্রবাজ শান্তি বাহিনী। দেশের নাজুক জন্মকালের ঐ বিদ্রোহী কার্যক্রম, শেখ সাহেবকে বিচলিত করে তুলে। এটাকে তিনি বাংলাদেশ ও তার নিজের পক্ষে একটি বড় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ রূপে গ্রহণ করেন। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় তারই নির্দেশনায় যে কয়টি ব্যবস্থা গৃহীত হয় তা হলো ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করনে দীঘিনালা ও রুমায় সেনা নিবাস স্থাপন, দলীয়ভাবে পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপনে বাঙ্গালীদের উৎসাহ দান, বাঙ্গালী জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা ও দেশকে অখন্ড একক রাষ্ট্রের কাঠামো প্রদান। তাই বলতে গেলে পার্বত্য বিদ্রোহই দেশকে অখন্ড একক রাষ্ট্রীয় কাঠামো দান ও একক কেন্দ্রীয় প্রশাসনে রূপান্তরের জন্য মূলতঃ দায়ী। বাঙ্গালী বসতি বিস্তারের পরিণতিও তা-ই। নতুবা ঐতিহ্যগত ভাবে দেশ হতো যুক্তরাষ্ট্র এবং এতদাঞ্চল থাকতো বাঙ্গালী বসতিমুক্ত। সম্ভবতঃ সাবেক জেলাগুলো পরিণত হতো প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যে। ঐ লক্ষ্যেই জেলা প্রশাসকরা গভর্ণর আখ্যায়িত হয়েছিলেন। কিন্তু পার্বত্য বিদ্রোহই সব ভন্ডুল করে দেয়। তখন দেশ রক্ষার প্রয়োজনে অখন্ড রাষ্ট্রীয় কাঠামো, আর কেন্দ্র ভিত্তিক একক শাসন জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। এখনো সে প্রয়োজন ফুরায় নি। শেখ সাহেবের চরম স্বজাতি প্রীতি ও স্বরাষ্ট্র প্রেমের চরম অভিব্যক্তি হলো বাঙ্গালীদের সাংবিধানিকভাবে জাতি ঘোষণা দান, ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ঐ একইভাবে যুক্তরাষ্ট্র না করে, এককেন্দ্রিক কাঠামোতে সংগঠন। বর্ণিত পার্বত্য চুক্তি ও আইনের ধারা ব্যবস্থায় ঐ নীতি আদর্শের প্রচ্ছন্ন বিরোধিতা বিদ্যমান।

১১.

(তাং-শুক্রবার ১৬ আশ্বিন ১৪০৬ বাংলা ১ অক্টোবর ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিনিদর্পণ রাঙ্গামাটি)।

দফা নং-খ/৬। জেলা পরিষদ আইনের ৮ নং ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট শব্দগুলির পরিবর্তে নির্বাচনী বিধি অনুসারে শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের ৮ নং ধারার ৪র্থ পংক্তিতে ছিলো ঃ 'সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা। চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তাহার এবং তাহার পরিবারের সদস্যদের স্বত্ব দখল বা স্বার্থ আছে, এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট দাখিল করিবেন।'

'ব্যাখ্যা ঃ পরিবারের সদস্য বলিতে চেয়ারম্যান বা সংশ্লিষ্ট সদস্যের স্বামী বা স্ত্রী এবং তাহার সঙ্গে বসবাসকারী এবং তাহার উপর সম্পুর্ণভাবে নির্ভরশীল তাহার ছেলে-

মেয়ে পিতা-মাতা ভাইবোনকে বুঝাইবে।'

শপথ গ্রহন ও সম্পত্তির হিসাব দাখিল সংক্রান্ত উপরোক্ত দুই সংশোধনী প্রয়োজনীয় নয়, সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্সের ব্যাপার। চেয়ারম্যান ও সদস্যরা বিভাগীয় মর্যাদার উর্ধ্বে প্রদেশ বা রাজ্য মানের মর্যাদা সম্পন্ন, এই সুপিরিওরিটির ধারণাই এতে নিহিত। জাতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১ এর সাথে সংশ্লিষ্ট ধারণার বিপরীতে এটি অতি মাত্রিক স্পর্শকাতর ব্যবস্থা। এটি সরাসরি সংবিধান লঙ্ঘন না হলেও, নিশ্চয়ই রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষে অভিষিক্ত বিষয়। উভয় পক্ষেরই তদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্ভব। প্রতিপক্ষ এটাকে বৃহত্তর রাজনৈতিক মর্যাদার পক্ষে স্বীকৃতি রূপে প্রদর্শন করতে পারবে, এবং মঞ্জুরকারী পক্ষেরও বলা সম্ভবঃ এটি বাস্তবে অন্তসার শূণ্য ব্যবস্থা। তবে এই কুট চাতুর্যের সুবিধাভোগী পক্ষ হবে প্রতিপক্ষই। আসলে এখানে পরাজয় ঘটেছে দাতা পক্ষের। জাতির কাছেও তাকে জবাবদেহী হতে হবে এ বলে যে, রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক গঠন কাঠামো তদ্বারা রক্ষিত হয়নি। এটি সংশ্লিষ্ট সরকারের অযোগ্যতা আর অপরিপক্ষতার প্রমাণ। পূর্ববর্তী সরকারের ব্যর্থতার উদাহারণ টানার মাঝে কোন কৃতিত্ব নেই। বিরোধিতাকে ঠেকাতে বিরোধী পক্ষের ভুলকে সজ্ঞানে অনুসরন মানে নিজের অন্তসার শূণ্যতা প্রদর্শন। এরশাদ সরকার মূল স্থানীয় সরকার আইন রচয়িতা কর্তৃপক্ষ। খালেদা সরকার তার স্থিতাবস্থার ধারক। তাতে সামান্য যোগ-বিয়োগ হলো হাসিনা সরকারের কাজ।এটাই পার্বত্য চুক্তি ও জেলা পরিষদ স্থাপন প্রক্রিয়া। এ হলো সামান্য ওলট পালট অথবা নতুন বোতলে পুরাতন মদ ঢালাই, অথবা আই ওয়াশ।

আইনের আওতায় আঞ্চলিক পরিষদকে আনয়ন ও তৎপ্রতি স্বীকৃতির ভিত্তি আগেই রচিত হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং এই সম্প্রসারণটা ও নতুন কিছু নয়। তিন জেলা নিয়ে তিন স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপিত হওয়াই জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপনের পক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপ। রূপ রেখা ও পরিকল্পনা ভিত্তিক তথাকথিত শান্তিচুক্তির ভিত্তি স্থাপক মূল ব্যক্তি হলেন, স্বৈরাচারী রূপে আখ্যায়িত প্রেসিডেন্ট এরশাদ। শান্তির এই রূপরেখাটি ঐ স্বৈরাচারী সরকারেরই পরিকল্পিত। প্রথম খালেদা সরকার আমলে আঞ্চলিক পরিষদের দাবীকে ঠেকিয়ে রাখা না হলে, আরো সুবিধাজনক শর্তে চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হতো। আজ এই চুক্তির জন্য আওয়ামী সরকারের বাহবা কুড়ানো এবং তার প্রধানমন্ত্রীর শান্তি পুরস্কার লাভ সম্পুর্ণ কক্ষচ্যুত ঘটনা। এটা হলো একের লাভ অন্যে হস্তান্তর। এই সুফলচ্যুতির জন্য জাতীয় কমিটিরা মূল ব্যক্তিরাই দায়ী। তাদের ভাবা উচিত ছিলো ঃ স্থানীয় সরকার পরিকল্পনায় আঞ্চলিক পরিষদের সম্ভাবনা মুর্তিমান ভাস্বর। বাগাড়ম্বর দিয়ে তাকে বেশি দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এই ভ্রুণটি একদিন পরের ঘরে গিয়ে হলেও পুর্ণ অবয়বে ভূমিষ্ঠ হবে। শেষে তা-ই হয়েছে। আওয়ামী সরকারের ভাগ্যে তা-ই জুটেছে। এটা পুর্ববর্তী দুই সরকারের অদুরদর্শিতার ফল। যদি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও চুক্তিতে অবাঞ্ছিত কিন্তু অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তজ্জন্য একা আওয়ামী

সরকার নয়, পূবর্তী দুই সরকার ও তজ্জন্য দায়ী। জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে আইন ও চুক্তির ভূমিকা না থাকা, এবং অবাঞ্ছিত কিছু অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য একা আওয়ামী সরকার নয়, পূবর্তী দুই সরকার ও দায়ী। জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে আইন ও চুক্তির ভূমিকা না থাকা, এবং অবাঞ্ছিত পদক্ষেপ গৃহীত হওয়ার সুতিকাগার, সাবেক আমল থেকে এই আমল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই তিন আমলে পার্বত্য অঞ্চল সংক্রান্ত প্রতিটি জাতীয় কমিটি ছিলো অযোগ্য অদক্ষ অকৌশলী। সমস্যার মূল, স্থানীয় ইতিহাস ও রাজনৈতিক তথ্যের ব্যাপারে কমিটি সদস্যরা ছিলেন অজ্ঞ। তারা এ সব নিয়ে অনুসন্ধান ও চালান নি। চিরাচরিত সাধারণ ধারণাই হয়েছে তাদের সম্বল। বেশির ভাগ সময় কেটেছে গল্প গোজব, যাতায়াত, পানাহার, বিনোদন ও অবহেলায়। সুতরাং সাম্পাদিত চুক্তির বিষয়বস্তু গভীর বিবেচনা, অধ্যয়ন, ও অনুসন্ধানের দ্বারা লব্ধ কিছু নয়। খেয়ালী সিদ্ধান্ত, এবং দুর থেকে গৃহীত কিছু পরামর্শ, যার কিছু কূটনৈতিক পর্যায়ে প্রাপ্ত আর কিছু আমলা অভিজ্ঞান, তাতে তথ্য ও স্বার্থগত ভূলক্রটি স্বাভাবিক ভাবে হয়ে গেছে।

সার্বনাশ হলো ঃ আমরা চুক্তিটিকে আভ্যন্তরীন ব্যাপার রূপে ধরে রাখি নি, উন্মুক্ত করে ছড়িয়ে দিয়েছি সারা বিশ্বে। যার লক্ষ্য হলো একটি আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেট ও প্রশংসা লাভ। এই পর্যায়ে দোষ ক্রটি স্বীকার ও সংশোধনের পরিবেশ থাকে না, এবং কোন কারণেই এ থেকে পিছানো যায় না। এই ক্ষেত্রে বিরোধী দল সমূহের চুক্তি রদের কথা অতি কথন ছাড়া কিছু নয়। সর্বনাশের মূল ভিত্তি রচনা ও রক্ষাণাবেক্ষণ তারাই করেছেন। এখন ভিন্ন বুলি হলো বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা।

আমাদের এ রূপ বিশ্বাস করার কারণ হলো ঃ রাজনৈতিক দলগুলো এখনো পর্বতাঞ্চল সংক্রান্ত তাদের ভুল ক্রটিগুলোর কথা স্বীকার করছে না। এখনো তারা এতদাঞ্চল সংক্রান্ত করণীয় নির্ধারণে দলীয় পর্যায়ে নৈতিক ও তত্বীয় সিদ্ধান্তে পৌছাননি। তাদের লক্ষ্য ঃ আগে ক্ষমতা লাভ। কিন্তু ক্ষমতা ভোগের ব্যস্ততা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবসর দেয় না, এ কথা তারা ভুলে আছেন। কেবল সভা, সম্মিলন, যাতায়াত, সম্বর্ধনা, আপ্যায়ন, ফাইল ওয়ার্ক, ভ্রমণ, শ্রবণ ও ভাষণেই ক্ষমতাসীনদের দিনরাত কাবাড় হয়ে যায়। তাই রাজনৈতিক পরিকল্পনা, অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ও অবসর, ক্ষমতা গ্রহণের আগেই নিহিত, পরে নয়। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো বস্তবে তথ্যানুসন্ধান ও পরিকল্পনা গ্রহণের ধারই ধারেন না। সুতরাং আমাদের পক্ষে খেয়ালী রাজনীতির শিকার হওয়া স্বাভাবিক।
জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় থাকাকালে পার্বত্য সমস্যার সমাধানে স্থানীয় পরিষদ পরিকল্পনা উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন করেছে। বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়ে তা রদ বা ভুল ক্রটির সংশোধন কোনোটাই করে নি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে সেই মীমাংসা রোয়েদাদের আরো সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। এই ত্রিমাত্রিক প্রক্রিয়ার ভুলটুটি এখন নাগরিক পর্যায়ে বিচার্য। আমাদের আলোচনা সমালোচনা এই গুণগত দৃষ্টিকোণ থেকেই পরিচালিত। তাতে ধরা পড়ে পার্বত্য পদক্ষেপের দোষের ভাগী

সবাই, সাফল্যের একমাত্র ভাগীদার জন সংহতি সমিতি। এখন নেতিবাচক অপ্রিয় সিদ্ধান্ত এটাই যে, চুক্তিটি সরকারী নয় এবং অসাংবিধানিকও বটে। তবে এর পক্ষে সংসদীয় আইন রচিত হয়েছে, তাই তার দায়-দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তায়। ১২

(তাং-বৃহস্পতিবার ২২ আশ্বিন ১৪০৬ বাংলা ৭ অক্টোবর ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

জেলা পরিষদ আইনে সম্পত্তির হিসাব নেয়ার বিধানটি আসলে কি বাস্তবায়িত হয়েছে? তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিযোগ হলো ঃ এটা কেবল লোক দেখানো আনুষ্ঠানিকতা। বাস্তবে চেয়ারম্যান মেম্বাররা দুই হাতে লুট করে নামে বেনামে, সম্পদের পাহাড় গড়েছেন ও গড়ছেন, বা তাদের তা গড়তে দেয়া হয়েছে। ত্রাণ ও অনুদান, নগদে ও খাদ্যশস্যে, উপরি প্রাপ্তির বিনিময়ে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকেই বরাদ্দ ও ছাড়দান করা হয়। নীচের স্তরে তার উশোল ও লুটপাট অবাধে চলে। আগে জনগণ ত্রাণ ও অনুদানের ভাগ্নাংশ হলেও পেতো। এখন তার পুরোটাই লোপাট হয়ে যায়। কখন আসে, কোথায় যায়, কেউ তার কিছু টেরই পায় না দিনে দিনে গোপন লোপাটের দক্ষতা বাড়ছে। জবাবদিহিতা নেই বলেও বটে, এ সব হয়। এটা হলো সততা ও জবাবদিহিতার তামাসা। আগের কিছু থাকুক আর না থাকুক, পরে ধন কামান যায়।

দফা নং 'খ ৭। জেলা পরিষদ আইনের ১০ নং ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত তিন বৎসর শব্দগুলির পারিবর্তে পাঁচ বৎসর শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। তবে আইনটিতে নিম্নোক্ত সংযোজনটি হলো বিস্ময়কর যথা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে উক্ত মিয়াদ শেষ হওয়া স্বত্বেও নির্বাচিত নতুন পরিষদ প্রথম অধিবেশনে না বসা পর্যন্ত পরিষদ কার্য চালাইয়া যাইবে।

এই সংযোজনীয় তেলেসমাতি হলো ১৯৮৯ সালের জুনে গঠিত তিন পার্বত্য স্থানীয় সরকার বা জেলা পরিষদে এ যাবৎ আদৌ কোন নির্বাচন হয়নি। সংসদের বা হাইকোর্টের অনুমোদন অথবা অধ্যাদেশের মাধ্যমে তার কার্যকাল বর্ধিত হয়েছে ও হচ্ছে এবং বর্তমানে তা সংক্ষিপ্ত আকারে পুনরগঠিত হয়ে দলীয় অবয়ব নিয়েছে বা নিচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী নির্বাচনের আগে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন জরুরী। এবং ভোটার হওয়ার যোগ্য লোক বলে ঐ সব বাঙ্গালীরাই নির্ধারিত হবে, যারা হবে বৈধ জায়গা জমির মালিক ও সুনির্দিষ্ট ঠিকানার বাসিন্দা, অন্যরা নয়। এ কাজটি ও ভূমি কমিশনের উপর নির্ভরশীল, যে কমিশনের সধ্য তিন চীফের দুজনই পদ মর্যাদার প্রশ্নে, উচ্চতর আদালতে মামলায় আবদ্ধ। সুতরাং ভূমি কমিশনের পুর্নরূপ লাভ, ভূমি মালিকানা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও নির্বাচন, এখনো অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া সংক্ষুব্ধ পক্ষের সুপ্রীম কোর্টে আশ্রয় লাভের সম্ভাবনা তো

আছেই। এতে বলা যায় ঃ নতুন নতুন মার প্যাচে তিন পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া অনিশ্চিত। এমনি করে নতুন সহস্রাব্দ নতুন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে এসেছে। নতুন ক্ষমতায়ন হচ্ছে। বিএনপি ও তার মিত্র পক্ষ তো নরম পথ বেছেই রেখেছে ঃ তথা কথিত শান্তিচুক্তি তাদের পছন্দনীয় নয়, চুক্তিতে সে মেনে নিয়েছে। তবে চুক্তি তার নিজের প্যাচেই আটকে গেছে। নতুন সহস্রাব্দের কখন তা বাতিল অথবা সংশোধিত হয় বলা মুশকিল। এর মানে বর্তমান পরিষদগুলোর পোয়া বারো। বিলুপ্ত করা নয়, এগুলো প্রায় কায়েমী। কিসের তিন বছর আর পাঁচ বছরের মেয়াদ কাল? পরিস্থিতির দোহাই অমোঘ অব্যর্থ। যতদিন না পরিষদ ব্যবস্থার রদবদল, ভোটার তালিকা সংশোধন, তথা স্থায়ী বাঙ্গালীদের সংখ্যা ও জায়গা জমির বৈধতা নিশ্চিত হবে, ততদিন পর্যন্ত জেলা পরিষদের নির্বাচন ঝুলে থাকবে, আর সে পর্যন্ত আঞ্চলিক পরিষদের জন্য ইলেকটোরেল কলেজ বা নির্বাচনী সংস্থা ও গঠিত হবে না। আঞ্চলিক পরিষদ আইন ধারা নং ৬ অনুসারে নির্বাচিত তিন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচনী কলেজ গঠিত হবে। ঐ আইনের বিধান হলো ঃ

আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সহ সকল সদস্য, পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। সুতরাং পুনরগঠিত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও অন্তরবর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদের পূর্ণ অবয়বে নির্বাচন অনিশ্চিত। তবে তাদের অন্তরবর্তী ক্ষমতা ও মর্যাদা অটুট আছে ও থাকবে।

জাতীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হওয়া না হওয়া নিশ্চিত অনিশ্চিত যা-ই হোক, পার্বত্য বিষয় সহ জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃবৃন্দকে অনেক নমনীয় হতে হবে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ইসলাম ধর্মীয় ব্যাপারে অনেক নমনীয় হতে হয়েছে। ভারতের সাথে পানিচুক্তি ট্রানজিট চুক্তি তথাকথিত শান্তিচুক্তি, ইত্যাদির ব্যাপারে জাতি বিক্ষুব্ধ ও বিভক্ত। এ সব প্রশ্নে জাতীয় নির্বাচনকালে পক্ষীয় বিপক্ষীয় দৃঢ়তা অবশ্যই শিথিল হবে। তাতে সবাইকে ভাবতে হবে ঃ ক্ষমতার দম্ভ আর ক্ষমতার আকুতি দুই ভিন্ন বিষয়। নির্বাচনকালে দম্ভ খাটে না। দলীয় সমালোচনার নিরিখেই জনমতের নাড়ি স্পন্দনের গতি প্রকৃতি কি, তা ধরে নিতে হবে।

অন্যতম প্রধান দল বিএনপি শুরু থেকেই পার্বত্য চুক্তির ব্যাপারে সহযোগিতা থেকে বিরত ছিলো এখন সে খামুশ। চুক্তির ব্যাপারে তার এখন কার প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক। জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটসহ অনেক দক্ষিণপন্থী এবং আধা দক্ষিণপন্থী দল এই চুক্তি বিরোধী জোটে ঐক্যবদ্ধ। এটা জনমতের একাংশকে প্রতিধ্বনিত করে। এই বিরোধী জনমতের চরিত্র ভারি কি হাল্কা, এটাই রাজনৈতিক বিবেচনার বিষয়। এই বিরোধী জনমতের একাংশকে নিজের পক্ষে টানার কৌশল রূপেই আওয়ামী লীগকে নমনীয় হতে হবে। নতুবা নির্বাচনে বিরোধী পক্ষের জয়কে ঠেকান যাবে না। আর বিরোধী পক্ষের ক্ষমতাসীন হওয়া মানে ঃ পার্বত্য চুক্তির

ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু রদ বদল। জাতীয় কমিটির সংলাপে তাদের অসহযোগিতার মানে এটা-ই। বলা যায় বিএনপি সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছে ঃ এটি শান্তিচুক্তি নয় তবে এটি মান্য। এই প্রশ্নে নির্বাচনী রায় হবে বিজয়ী দলের পক্ষে গণভোট। সেই গণরায়কে তখন আর উপেক্ষা করা যাবে না। সেই ঘোলাটে পরিস্থিতিতে দেশের অন্যান্য অংশের মত, সমান ভাগ্য বরণে, এই পার্বত্য অঞ্চলকেও বাধ্য হতে হবে। দেশ ভিত্তিক সমান ক্ষমতা সম্পন্ন জেলা পরিষদ গঠনে, রাজি হতে হবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের অস্তিত্ব হবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দেশ জুড়ে এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যাবে কি না, তাতে দেশের এককেন্দ্রিকতা রক্ষা পাবে কি না, এবং প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রত্যাবর্তন ও তজ্জন্য সংবিধান সংশোধন যুক্তিযুক্ত হবে কি না, এসব বিষয় গভীরভাবে ভাবতে হবে। আপাতত ঃ আঞ্চলিক পরিষদের দ্বারা দেশ ভিত্তিক সম্ভাব্য মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হলো, অন্যান্য সাবেক জেলা ভিত্তিক অঞ্চলগুলো, সমান সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন আঞ্চলিক পরিষদ লাভের দাবীতে সংগঠিত হতে উৎসাহিত হবে। দেশের রাজনীতিতে এর একটি কুপ্রভাব অবশ্যই আছে। এই পরিবর্তনের হাওয়াকে অবশ্যই অবহেলা করা যাবে না। এটিকে রোখতে হলে, আঞ্চলিক পরিষদকে আর এগিয়ে নেয়া যায় না। নতুবা ফেডারেল ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনই অবশ্যম্ভাবী। ক্ষমতা লাভের পর চুক্তির বিরোধীতা কার কতটুকু টিকে তাও দেখার বিষয়। দেখা যাচ্ছে চুক্তি মেনে নেওয়ার প্রতি চার দলীয় জোট নমনীয়। ১৩.

(তাং-মঙ্গলবার ২৭ আশ্বিন ১৪০৬ বাংলা ১২ অক্টোবর ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পন, রাঙ্গামাটি।)

'দফা নং-খ৮। জেলা পরিষদ আইনের ১৪ নং ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূণ্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে, পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন, এবং দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।'

মূল আইনে ১৪ নং ধারায় নিম্নরূপ বক্তব্য ছিলো ঃ

'ধারা নং ১৪। অস্থায়ী চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূণ্য হইলে বা অনুপস্থিত বা অসুস্থতা হেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নতুন নির্বাচিত চেয়ারম্যান তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে মনোনীত কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান রূপে কার্য করিবেন'।

সংশোধনটি অধিক গণতান্ত্রিক বলে প্রতীয়মান হলেও এর মূলে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিহিত। বাঙ্গালী সম্প্রদায় স্থানীয় জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও, তারা

চেয়ারম্যান পদের পক্ষে অযোগ্য এবং অস্থায়ী চেয়ারম্যান পদ ও তাদের জন্য নিষিদ্ধ। তদুপরি মাত্র ৩০% প্রতিনিধিত্বমূলক সদস্য পদ তাদের জন্য নির্ধারিত, এটা স্বৈরতন্ত্র। সর্বোপরি দেশ এখন পার্লামেন্টারী শাসনে পারিচালিত। তার সাথে চেয়ারম্যানীয় শাসন সঙ্গতিশীল নয়। চেয়ারম্যান পদের নির্বাহী ক্ষমতা প্রেসিডেন্সিয়েল শাসন ভিত্তিক, যা বর্তমানে প্রত্যাহৃত। এই যুক্তিতে নির্বাহী ক্ষমতাসম্পন্ন কোন চেয়ারম্যান পদ থাকা যথার্থ নয়। তাই স্থানীয় শাসন কাঠামোগুলোতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির প্রয়োগ জরুরী। জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদগুলো পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে গঠিত হওয়াই সঙ্গত, যার ব্যতিক্রম হওয়া বাঞ্ছিত নয়। অন্তরবর্তী পরিষদ গঠন ও পরোক্ষ নির্বাচন বিধি ও সংবিধান সম্মত নয়।

'দফা নং-খ-৯। বিদ্যমান জেলা পরিষদ আইনের ১৭ নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বালিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন, যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হোন (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয় (৩) কোন উপযুক্ত আদালত মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।'

দেখা যায় স্থানীয় জেলা পরিষদ আইন ও সাংবিধানিক আইনের ভাষা ও বক্তব্যে বিস্তর ভিন্নতা বিদ্যমান। যেহেতু এই ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধিত হয়নি, সেহেতু জেলা পরিষদ আইনের অসাংবিধানিক বক্তব্যগুলো কার্যকর নয়। সংবিধানে ব্যক্ত অপ্রকৃতিস্থ শব্দের পরিবর্তে পরিষদ আইনে মানসিকভাবে অসুস্থ ও যোগ্য আদালতের জায়গায় উপযুক্ত আদালত এবং নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী এর স্থলে পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা শব্দের প্রতিস্থাপন মানে সংবিধানের ভিন্নতা ও লঙ্ঘন। সাংবিধানিক বক্তব্যকে জ্ঞাতসারেও ইচ্ছাকৃতভাবে এড়ানো বা অবজ্ঞা করার এটি হলো প্রকাশ্য উদাহরণ। সংবিধানে এ কাজটিও নিষিদ্ধ, যথা ঃ অনুচ্ছেদ নং ৭ (২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে, এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জ হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপুর্ণ ততখানি বাতিল হইবে। একই কথা অনুচ্ছেদ নং ২৬ (১) ও (২) বিধানে ও সন্নিবেসিত আছে।

সুতরাং বলা যায়, সাংবিধানিক আইনের ভাষা ও বক্তব্যে কোনরূপ সংযোজন বিমোচন বা সংশোধন, অনুচ্ছেদ নং ১৪২ এর অনুসরণ ব্যতিরেকে মোটেও বৈধ নয়। এবং অনুরূপ কাজ বাতিল যোগ্য।

দেশে ভূমিহীন ভিটাহীন নিরাশ্রয় বাস্তুহারা, অথচ জন্মসুত্রে বাংলাদেশী, এরূপ নাগরিকের সংখ্যা কোটি কোটি। বর্ণিত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন বৈধ হলে,

কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামে নয়, সারা বাংলাদেশে কোটি কোটি সংখ্যক গরীব অস্থায়ী বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের আইনী নজির স্থাপিত হবে। সম্পত্তি ও ঠিকানা থাকার শর্তের উপর অধিকার ভোগ সীমিত হয়ে যাওয়া দুর্ভাগ্যজনক। অবাঙ্গালী মাত্রই স্থায়ী স্থানীয় আর বাঙ্গালী মাত্রই অস্থানীয় বহিরাগত, যদি না তার স্থানীয়ভাবে নির্বিরোধ জায়গা জমি ঠিকানা ও বাড়িঘর থাকে, এটা বৈষম্যমূলক বক্তব্য। সংবিধান অনুরূপ বৈষম্যকে অনুমোদন করে না।

সাংবিধানিক ভাষায় বাংলাদেশ হলো গণপ্রজাতন্ত্রী এবং এর কাঠামো হলো এককেন্দ্রিক। এর অর্থ হলো সম্পদ সম্পত্তি থাকা না থাকা ও আঞ্চলিক ভিন্নতা ছাড়াই, দেশের প্রতিটি মানুষ বৈষম্যহীনভাবে এই প্রজাতন্ত্রের মালিক। সাংবিধানিক ভাষায় এই অধিকার ও মালিকানা এভাবে ব্যক্ত হয়েছে যথা ঃ

'অনুচ্ছেদ নং-১। বাংলাদেশ একটি একক স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে।'

'অনুচ্ছেদ নং ৭ (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল সাংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।'

'অনুচ্ছেদ নং ১১ । প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে, এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।'

"অনুচ্ছেদ নং ১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।'

'অনুচ্ছেদ নং ২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

সুতরাং নাগরিকত্ব, ভোটাধিকার ও স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার পক্ষে সম্পত্তির মালিকানা ও সুনির্দিষ্ট ঠিকানা থাকার শর্ত আরোপ সম্পুর্ণ অবান্তর।

১৪

(তাং-বুধবার ৫ কার্তিক ১৪০৬ বাংলা ২০ অক্টোবর ১৯৯৯ খ্রীঃ দৈনিক গিনিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

অপ্রকৃতিস্থ আর মানসিকভাবে অসুস্থ শব্দদ্বয় সাধারণভাবে একার্থ বোধক হলেও, বিশেষার্থে এক নয়। অপ্রকৃতিস্থ তাকেই বলা যাবে যার স্বাভাবিক হুশ বোধ নেই বা যে মস্তিস্ক বিকৃত। কিন্তু মানসিকভাবে অসুস্থ বলে তাকেও জ্ঞান করা যেতে পারে যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, যার মাঝে অস্থিরতা ক্রিয়াশীল, যে হুশবোধ জ্ঞান ও ভালমন্দের ভেদাভেদ পুরোপুরি খুইয়ে বসেনি। সুতরাং

মানসিকভাবে অসুস্থ বাক্যাংশটি অপ্রকৃতিস্থের প্রতিশব্দ বলে গণ্য হতে পারে না। যোগ্য আদালত আর উপযুক্ত আদালত বর্ণনাটি ও বাহ্যত একার্থবোধক, তবে তার বিশেষার্থ পৃথক। যোগ্য অর্থ হলো আদালতের শ্রেণী ও মান এবং উপযুক্ত অর্থ হলো বিষয় ও এখতিয়ারগত সীমানা।

নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী আর পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা একার্থবোধক বর্ণনা নয়, বরং সম্পুর্ণ পৃথক দুই বাক্যাংশ। সুতরাং পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ধারা নং ১৭ এর সংশোধিত বিবরণের ভাষ্য ও তার ভাবার্থ, বাংলাদেশ সংবিধানের ভাব ও ভাষাকে লঙ্ঘন করেছে। এটিও সংবিধান লঙ্ঘন। কার্যত সংবিধানের প্রতিটি হরফ, দাড়ি, কমা, সেমিকলন, তার ভাব ও ভাষা সবই অলঙ্ঘনীয়। এই অলঙ্ঘনীয়তা পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের বর্ণিত ধারায় রক্ষিত হয়নি। এটা অবহেলা যোগ্য নয়। এটা যে কোন পার্বত্য নাগরিকের সংক্ষোভ ও আপত্তির কারণ রূপে উচ্চ আদালতে গ্রহণীয়। স্থায়ী আর অস্থায়ী বাসিন্দার তফাৎ ও অধিকারের তারতম্যকেও সংক্ষোভ ও আপত্তির কারণ রূপে পণ্য করা যায়। দেশের সর্বোচ্চ আইনে নাগরিক ও মৌলিক অধিকারের সংজ্ঞায় এরূপ বৈষম্য স্বীকৃত নয়। ঐতিহাসিক ভাবে উপজাতীয়রা ও অস্থানীয় অধিবাসী। বাংলায় তারা আদি স্থায়ী বাসিন্দা নয়।

'দফা নং-খ-১০। জেলা পরিষদ আইনের ২০ নং ধারার (২) উপধারায় নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

মূল আইনে কোন নির্বাচনী এলাকার উল্লেখ একেবারে যে নেই তা নয়। চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনী এলাকা হলো গোটা জেলা এবং সদস্য পদের নির্বাচনী এলাকা ও তা-ই। যথা ঃ
স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ এর ধারা ৩ (১) রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপন) এই আইন বলবৎ হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবন পার্বত্য জেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী স্থানীয় সরকার পরিষদ নামে পরিষদ স্থাপিত হইবে।

ধারা নং ৪ (২) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ জন সাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।'

এখন নতুন সংশোধিত ব্যবস্থায় কেবল সদস্যদের জন্য তাদের সংখ্যা অনুযায়ী স্বতন্ত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্বাচনী এলাকা গঠিত হওয়াই সম্ভব। চেয়ারম্যান পদের জন্য গোটা জেলা হলো একক নির্বাচনী এলাকা। তবে সদস্য পদের জন্য তা হবে তাদের পদ সংখ্যার সমান নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত। এই বিভক্তি হবে জটিল। যেহেতু সদস্য পদ সাম্প্রদায়িক কোটায় বিভক্ত, আর ভোট দান অবিভক্ত সার্বজনীন এবং

সংবিধানে কোটা বিভক্তি নেই, এ হেতু নির্বাচন সাম্প্রদায়িক অসাম্প্রদায়িক এই দুই ধারায় ভিবক্ত হবে। এখানে সংবিধানকে ফাঁকি দেয়ার সুত্র নিহিত। ভোট অবিভক্ত সাবর্জনীন। প্রার্থী কোটা সাম্প্রদায়িক। এমতাবস্থায় সাম্প্রদায়িক নির্বাচনী আকাঙ্খা, বিপক্ষীয় সম্প্রদায়ের ভিন্ন মনোভাব সম্পন্ন যুক্ত নির্বাচনী ভোটে বানচাল হয়ে যেতে পারে। এই সম্ভাবনা অনাকাঙ্খিত। অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপুর্ণ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সাংবিধানিক নীতি ও মুক্ত জনমত তদ্বারা বিঘ্নিত হবে। সাম্প্রদায়িক জনমত বিঘ্নিত না করে, অবিভক্ত সার্বজনীন ভোট প্রক্রিয়া সম্ভব হবে না। ভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগ সাজসে অবাঞ্ছিত প্রার্থীদের জয় এবং সম্প্রদায়গত ভাবে যোগ্য ও জনপ্রিয় প্রার্থীদের পরাজয়, এই ব্যবস্থায় রোখা যাবে না। এটি হবে নির্বাচনের নামে প্রহশন। এ কারণে অবাধ নির্বাচন ও সাম্প্রদায়িক প্রভাবমুক্ত নির্বাচনী এলাকা ভাগ সম্পুর্ণ অসম্ভব। এর একামাত্র বিকল্প হলো মনোনয়নমূলক নির্বাচন ও সদস্যপদ সংখ্যক নির্বাচনী এলাকা ভাগ। এতে সরাসরি নির্বাচনী আইনের লঙ্ঘন হবে না। বিপরীতে সাম্প্রদায়িক কোটা ভিত্তিক পদ বন্টন, আর যোজসাজসের ভোটদান পদ্ধতি বেআইনী বলে পরিত্যজ্য হবে। আইনকে ফাঁকি দেয়া, আর সরাসরি লঙ্ঘন একই কথা। আইন ও পদ্ধতির খেলাপ করা সরকারীভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু সরকারীভাবে আইনকে ফাঁকি দেয়া ও পদ্ধতির লঙ্ঘন কি অনুমোদিত? পার্বত্য অঞ্চলের পরিষদ সংক্রান্ত আইন ও কার্যক্রমের অনেকটাই আইন ও পদ্ধতি লঙ্ঘনের সাথে জড়িত। স্থানীয় নির্বাচনী নিয়মনীতিটিও তার অন্যতম।

প্রতিপক্ষ থেকে মুক্ত কোন সাম্প্রদায়িক এলাকা বাস্তবে নেই। প্রতিপক্ষীয় সম্প্রদায়গুলো সর্বত্র পরস্পরের প্রতিবেশী। স্বপক্ষীয় সদস্য মানে স্বসমাজের দ্বারা মনোনীত বা সমর্থিত স্বধর্মীয় ব্যক্তি। প্রতিপক্ষীয় ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তি স্বসমাজের কাঙ্খিত প্রতিনিধি রূপে মান্য হতে পারে না। সে হবে প্রতিপক্ষীয় স্বার্থ ও শক্তির প্রতিভু। যদি সাম্প্রদায়িক সদস্য কোটা অসাম্প্রদায়িকভাবে পুরণযোগ্য হয়। তবে তা পুরণ করা সম্ভব। পর ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তি সম্প্রদায়ের খাঁটি প্রতিনিধি হবে না, হবে প্রতিপক্ষীয় ক্রীড়নক। তাতে কোটা সংখ্যা পুর্ণ হবে সত্য, তবে সমাজের মনোনয়ন ও নির্বাচনী আকাঙ্খা হবে ব্যর্থ। এই নির্বাচনী ধারার অনিবার্য ও দুঃখজনক পরিণতি হবে ঃ সাম্প্রদায়িক ব্ল্যাক মেইলিং এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কুমতলবের জয়। তাতে সার্বজনীন মঙ্গল আর অসাম্প্রদায়িক চিন্তা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবার মঙ্গল ও স্বার্থ চিন্তাই জনপ্রিয়তা অর্জন ও নির্বাচনী জয় লাভের উপায়। অধিকন্তু স্থায়ী বিদ্বেষ পোষণকে এড়াতে নির্বাচনী স্বার্থেই সবাইকে উদার আর অসাম্প্রদায়িক হতে হবে। তাই সামাজিক কোটা পূরণে মনোনয়ন প্রথাই প্রযোজ্য। অবাধ প্রতিযোগিতা অসম্প্রদায়িকতা আর কোটা প্রক্রিয়া এক সাথে প্রয়োগ যোগ্য নয়। জাতীয় নির্বাচনী আইন ফাঁকি ও বিরোধ সৃষ্টি করা হলে তা পরিতাজ্য।

১৬

(তাং-মঙ্গলবার ১১ কার্তিক ১৪০৬ বাংলা ২৬ অক্টোবর ১৯৯৯ খ্রীঃ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

দফা নং-'খ-১১। জেলা পরিষদ আইনের ২৫ নং ধারার (২)-এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।'

এটা একটি নতুন অস্পৃশ্য বর্নবাদ। এই রাজনৈতিক বর্নবাদ ও বঞ্চনা অযৌক্তিক। গণতন্ত্র ও সংবিধানে এরূপ নির্লজ্য বঞ্চনা অনুমোদন যোগ্য নয়। বাঙ্গালীদের বঞ্চিত করার এই নীতি তাদের মনে ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ হবে। পরিণামে এটা সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগাবে। শান্তির পূর্বশর্ত হলো, অশান্তির কার্যকারণ দূর করা। তাছাড়া শান্তির আশা করা বৃথা। বিষ ভিতরে রেখে, বাহিরে ব্যথা নিবারণী মালিশ দানে কোন উপকার নেই।

গণতান্ত্রিকভাবে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশ্বব্যাপী অনুমোদিত। রাজনৈতিক একচেটিয়াবাদ ও পদ সংরক্ষণ, গণতন্ত্র ও শান্তির অনুকূল ব্যবস্থা নয়। এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ঘটা স্বাভাবিক। পার্বত্য বাঙ্গালীরা এ ব্যবস্থা মেনে নেয়নি। তারা চায় অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতি। রাজনৈতিক সমর্থন পাওয়ার প্রক্রিয়ায়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহনশীলতার চর্চা হলে, শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। নয়তো সাম্প্রদায়িকতার চর্চাই হবে মুখ্য। সে অবস্থায় হিংসা ও বিদ্বেষ কী করে রোখা যাবে? যে আমার প্রতি বিদ্বিষ্ট, যে আমার রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক প্রতিপক্ষ, যে আমার সর্বনাশের চিন্তায় সর্বাবস্থায় তৎপর, সে আমার হর্তাকর্তা ও বিধাতা হলে, তাকে আমি সৌজন্যমূলকভাবে হলেও স্বাগত জানাতে পারি না। এতোদিন সাম্প্রদায়িক ভাবে পাহাড়ী বাঙ্গালীরা পরস্পরের প্রতিপক্ষ ছিলো। এখন আইনীভাবে এই প্রতিপক্ষতাকে বৈধ করা হলো। আগে হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতা চর্চা ছিলো ঘৃণীত দুস্কর্ম। এখন গোটা পার্বত্য রাজনীতিটাই আইনীভাবে হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতার খপ্পরে পতিত। এর পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য।

সাম্প্রদায়িকতা আর অসহিষ্ণুতা নিন্দিত বলে তার চর্চা গোপনে হয়। এখন এটা খোলা রাজনীতির ময়দানে প্রকাশ্যে আবির্ভুত বলে দুর্ঘটনার আশংকা অধিক। যে সমাজপতি ও রাজনৈতিক নেতারা শান্তি ও সম্প্রীতির চর্চায় অগ্রণীয় ভূমিকা পালনে আগ্রহী হবেন তারা এখন আইন ও রাজনীতির দৃষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য। এখন পরিষদীয় পদ ক্ষমতা ও নির্বাচনী ভূমিকায় আইনীভাবে সাম্প্রদায়িকতার চর্চা প্রবিষ্ট। এর মন্দ দিক অবশ্যই আছে, এর পরিণাম ফল যে সুখকর হবে না, তা নিশ্চিত।

এই সাম্প্রদায়িক ক্ষমতারোহনের সুবিধায় উল্লসিত হওয়ার কোন কারণ নেই। প্রধান উপজাতীয় নেতারা আপাততঃ নিরাপদে শীর্ষ পদে বরিত হবেন। নির্বাচনী

প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলে, সংরক্ষণবাদ ও একচেটিয়া পদ শিকারের প্রবক্তারা স্বপক্ষীয়দের দ্বারাই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঠ থেকে বিতাড়িত আর কোণঠাসা এবং স্বপক্ষীয় ভোটারদের প্রত্যাখ্যানে অপ্রত্যাশিতভাবে নিজেরা ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত হবেন। বাঙ্গালীরা পদ প্রার্থী হতে না পারলেও, ভোটের অধিকারী থাকবে। ক্ষুদ্র উপজাতিদের প্রার্থীরা বড় উপজাতিদের সমর্থন না পেলেও, বাঙ্গালীদের সাথে আতাত করে জোট গঠন করতে পারবে। তখন জয় পরাজয় পদ সংরক্ষণবাদীদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল থাকবে না। তখন বড়দের নিজেদের মাঝে পদ টানাটানি ও কোন্দল হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঠ থেকে বিতাড়িত বাঙ্গালী, আর জনবলহীন ও কোণঠাসা সংখ্যালঘুরা, তখন হবে কিং মেকার একচেটিয়াবাদের প্রবক্তাদের পদ ও ক্ষমতা কি তখন নিশ্চিত থাকবে? তখন হয়তো তারাই বলতে বাধ্য হবেন, না সংরক্ষণবাদ নয়, অবাধ গণতান্ত্রিক চর্চাই বিধেয়।

'দফা নং-খ-১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মাং সার্কেলের অন্তুর্ভুক্ত নয়, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা আইনের ২৬ নং ধারায় বর্ণিত "মাং চীফঃ এর পরিবর্তে "মাং সর্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফঃ শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায়, বোমাং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবন জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।'

এটা সামন্তবাদী ব্যবস্থা। পদাধিকার বলে প্রবেশাধিকার ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার, বাংলাদেশ সংবিধান ও গণতন্ত্র অনুমোদন করে না। খোদ চীফ শীপ বা সর্দারী পদ ও তার ক্ষমতা, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। পার্বত্য চট্টগ্রামের চীফ শীপ বা সর্দারী পদ হলো প্রথাগত উপজাতীয় নেতৃত্ব। তার সাথে জমিদারী বা রাজত্ব সম্পৃক্ত নয়। বাংলাদেশ থেকে আইনীভাবে, সেই ১৯৫১ সাল থেকে জমিদারী বিলুপ্ত। এবং ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগ সম্পর্কিত ঘোষণা, আদেশ ও দলিল বলে, আভ্যন্তরীন রাজ্য রাজত্বের অবসান ঘটেছে। সাবেক ভারতীয় ৫৬৫ দেশীয় রাজ্যের একটিও এখন অবশিষ্ট নেই। সে সবের শাসকরাও এখন ক্ষমতাহীন। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেই প্রচীন সামন্তবাদ এখন পোষণীয় নয়। জনসংসহি সমিতি লিখিতভাবে ঘোষণা করেছিলো ঃ

'(ক) ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ঔপনিবেসিক, অগণতান্ত্রিক ও ত্রুটিপূর্ণ। এই শাসনবিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম প্রতিনিধিত্বের কোন বিধি ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই।' (সূত্র ৫ দফা দাবী নামা)

'(খ) জুম্ম জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তাই যথেস্ট নহে, বস্তুত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নতি সাধন সহ দশ ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের জাতীয়

অস্তিত্ব ও ভূমির অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভবপর নহে। (সুত্র পাঁচ দফা দাবী নামা)'

এই নীতির বিপরীতে সন্তুবাবুরা তিন উপজাতীয় সামন্তকে সহযোগীরূপে মেনে নিয়েছেন। অথচ তাদের সংশ্লিষ্টতা গণতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিত্বশীল নয়। এটা কোন গণতান্ত্রিক সবক? এর পরিণাম যে ভয়াবহ, তা তখনই উপলব্ধ হবে, যখন রাজা বাবুদের সামনে স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা ও উপজাতি আর অউপজাতি পরিচয়ের সার্টিফিকেট চেয়ে ধর্না দিতে ও হয়রান হতে হবে। রাজনিয়ন্ত্রণের এটি হবে এক সাংঘাতিক চাবিকাঠি।
কেন সামন্ত সার্কেল ও মৌজা প্রথা ? সারাদেশে ভূমি প্রশাসন, রাজস্ব বিভাগীয় তহসিল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এ ধারায় সারা পৃথিবীর ভূমি প্রশাসন চলে। তহসিল ব্যবস্থায় সারাদেশের মত এখানেও সুষ্টুভাবে ভূমি প্রশাসন ও রাজস্ব সংগ্রহের কাজ চলতে পারে। এর বাহিরে সাম্প্রদায়িক ও এলাকাভিত্তিক সামাজিক নেতা সর্দারও মাতবর জাতীয় প্রথা সিদ্ধপদ ঐতিহ্য বজায় রাখা প্রয়োজনীয় হলে, তাকে রাজনীতিমুক্ত সামাজিক সর্দারী পদ রূপে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। সামন্ত পদরূপে চীফ, হেডম্যান ও কার্বারী পদকে রাখাতে হলে, আইনে তার সংস্থান থাকতে হবে। হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল সংবিধানিক আইনের বিকল্প নয়। একমাত্র ঐ আইনই উপরোক্ত তিন সামন্ত পদ ও ক্ষমতাকে সংরক্ষণ করে। পুর্বোল্লেখিত বক্তব্য মূলে, জনসংহতি সমিতি ঐ আইন বিলোপের পক্ষে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গণতন্ত্র চর্চা ও তাদের অঙ্গীকার।
১৬

প্রাসঙ্গিকভাবে বিষয়টি রাজনৈতিক হলেও একটি বানান ও উচ্চারণ বিভ্রান্তি দফা নং খ-১২ তে উল্লেখিত হওয়ায় এখানে তারও আলোচনা করা প্রয়োজন। দুই মগ বা মারমা চীফের একজন হলেন বোমাং চীফ, কিন্তু অপরজনকে কেউ বলেন মান চীফ কেউ বলেন মং চীফ, এবং অনেকে বলেন মাং চীফ। এমনিভাবে বান্দরবনকে কেউ কেউ বলেন বান্দরবান। আলোচ্য চুক্তিপত্রে মং চীফ ও বান্দরবনই লিখিত হয়েছে। তবে খসড়া জেলা পরিষদ আইনে বান্দরবান বানানই আছে।

রাজা ভুবন মোহন রায় কর্তৃক রাজানগর মন্দির গাত্রে লিখিত রাণী কালিন্দির প্রশস্তি বর্ণনায় শব্দটিকে মান বলেই উল্লেখ করেছেন। ১৯০০ সালের হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েলের ধারা নং ৩৫-এ বর্ণিত মাং ও বোমাং চীফকে ইংলিশে একই বানানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটির বাংলা উচ্চারণ বোমাং বলে উল্লেখিত হয়। সুতরাং সে অনুসারে দ্বিতীয়টির উচ্চারণ হবে মাং। দ্বিতীয়টি মং উচ্চারিত হলে প্রথমটি সে অনুযায়ী হবে বোমং। ঠিক একইভাবে সহজ গ্রাহ্য নাম হলো বান্দরবন। রূপকথার বান্দরবান বাস্তব নয়।

প্রসঙ্গত ঃ উল্লেখ্য যে, এককালে কুকিদের বলা হতো মুন্ড শিকারী। ঐ বদনামের

দায় ভার এড়াতে আজকাল কেউ নিজেকে কুকি বলে পরিচয় দিতে চান না। অথচ কুকি একটি সম্ভ্রান্ত প্রাচীন সম্প্রদায়। ঠিক একইভাবে সমুদয় প্রাচীন পুথি পুস্তকে আরাকানী ও বর্মী জনগোষ্ঠী মগ নামে অভিহিত। মঘী চিকিৎসা শাস্ত্র আর মঘী সংখ্যা তত্ব প্রাচীন গৌরবজনক উত্তরাধিকার। কিন্তু পর্তুগীজ হার্মাদ ও রোসাং রাজকীয় প্ররোচনায়,আরাকানী বাসিন্দা মগেরা নিজেদের নামে দস্যু আর অত্যাচারীর ঘৃণীত চরিত্রই লাভ করে। তাই তাদের বংশধরেরা কেউ দস্যু অর্থবোধক মগ পরিচয়কে গৌরবজনক মনে করেন না। পরিচয়টি তাদের দ্বারা তাই পরিত্যক্ত। প্রয়াত বোমাং চীফ মংশোয়ে প্রু চৌধুরী মগ নামের লজ্জ্যাজনক প্রয়োগকে কাটাবার লক্ষ্যে ১৯৬৪ সালে বান্দরবন মহকুমা প্রশাসককে লিখিতভাবে অনুরোধ করেন ঃ মারমা পরিচয়ই তৎপরিবর্তে তাদের অভিপ্রেয়। বোমাং চীফের সে প্রস্তাবেরই ফলে আজকাল মগেরা সরকারী ও বেসরকারীভাবে হয়ে পড়েছেন মারমা। কিন্তু আসলে মারমা অর্থ হলো বর্মী বংশোদ্ভুত লোক। এ নাম বিজাতীয়। অথচ মগ নাম হলো প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ও স্থানীয়। দীর্ঘকাল আরাকান ও বৃহত্তর চট্টগ্রাম তার মগ অধিবাসীদের সহ, এক রাজ্য ও এক জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সে গৌরবজনক অতীত পরিচয় পরিত্যজ্য নয়। দস্যু আর অত্যাচারী অর্থে মগ নামটির ব্যবহার আজকাল অবশিষ্ট নেই। বদনামের কারণে সুনামকে পরিত্যাগ করা দুর্বলতার পরিচায়ক। আমি আশা করবো মারমা নাম ধারী সংশ্লিষ্ট লোকেরা গৌরবজনক ও সম্ভ্রান্ত মগ পরিচয়টির প্রত্যাবাসন ঘটাতে সাহসের পরিচয় দিবেন। নিজেরা বিকল্প মারমা নাম ধারণ করলেও, মগ নামটি পুঁথি পুস্তক, লোক স্মৃতি ও ব্যবহারে অব্যাহত আছে-একেবারে মুছে যায়নি, যাবেও না। এটি তাদের ভাগ্যলিপি। সুতরাং মগ পরিচয়ের দুঃসাহস কাম্য।

'দফা নং-খ-১৩। জেলা পরিষদ আইনের ৩১ নং উপধারা (১) ও উপধারা (২) এ পরিষদে উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।'

এটি কি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ভিত্তিক ব্যবস্থা? স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতারই অংশরূপে এরূপ অগ্রাধিকার মান্য। স্থানীয় শাসন আইনে এরূপ সুযোগ-সুবিধা দানের কোন জাতীয় নীতি বা বিধি এখনো অনুপস্থিত। মূলত ঃ স্থানীয় শাসনের সাংবিধানিক নীতির আওতায়, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত। কিন্তু দেশের অন্য কোথাও সমান সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের অস্তিত্ব নেই। এটা অঞ্চল গত আইনী বৈষম্যের নমুনা। সংবিধান এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা সম্বলিত ও স্বায়ত্তশাসিত জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের অনুমোদন দেয় না। স্থানীয় শাসন আর স্বায়ত্তশাসন অভিন্ন কিছু নয়। দেশভিত্তিক অভিন্ন স্থানীয় শাসনই সাংবিধানিক লক্ষ্য। পশ্চাদপদ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা দানের দ্বারা জাতীয় মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাময়িক অগ্রাধিকার দানে সাংবিধানিক নির্দেশ আছে যথা অনুচ্ছেদ নং ২৮ (৪)। এর অর্থ স্থায়ী অগ্রাধিকার

মঞ্জুর নয়। অগ্রাধিকারের একটি মিয়াদকাল অবশ্যই থাকবে, আর সে হলো জাতীয় মান অর্জন পর্যন্ত। সংশ্লিষ্ট অগ্রাধিকার আইনে এরূপ কোন সীমাবদ্ধতা নেই। এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চল ও লোকজনএকমাত্র আর স্থায়ী পশ্চাদপদও নয়। সুতরাং এ ব্যবস্থাটি বৈষম্য দোষে দোষী।

দেশ জুড়ে পশ্চাদপদ দরিদ্র, অশিক্ষিত বেকার অশ্রয়হীন ও ছিন্নমূল লোকের সংখ্যা কোটি কোটি হলেও, কেবল উপজাতিদের বেলায় অগ্রাধিকার ব্যবস্থার প্রবর্তন হবে আরেক বৈষম্য। অঞ্চল হিসাবে কেবল পার্বত্য অঞ্চলই নয়, আরো অধিক পশ্চাদপদ অঞ্চল অনেকই বিদ্যমান। শিক্ষা, রোজি রোজগার, ভূমি সংস্থান, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য সুবিধা ইত্যাদির বিচারে পার্বত্য অঞ্চলের চেয়ে অধিক পশ্চাদপদ এলাকা আছে, তার হিসাব জাতীয় পরিসংখ্যানেই দ্রষ্টব্য। পার্বত্য অঞ্চল এ নিয়ে অধিক উত্তপ্ত আর অশান্ত। তাতেই শান্তকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হলো অগ্রাধিকার দান। তা হলে কি উন্নয়ন আর অগ্রাধিকার পেতে অন্যান্য অঞ্চলকেও উত্তপ্ত হতে হবে, পার্বত্য চুক্তি কি তারই উদাহরণ? বাস্তবেও পার্বত্য চুক্তি ইতোমধ্যে আঞ্চলিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে নিয়েছে। এই চুক্তির দ্বারা সরকারই দেশটিকে বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। দেশের এককেন্দ্রিক কাঠামো এখন হুমকির সম্মুখীন। জাতীয় আর রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও শান্তি রক্ষার স্বার্থে এই পার্বত্য চুক্তি সংশোধন করা দরকার নতুবা পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে দেশকে পুনর্গঠন করা আবশ্যক হবে। বিশৃঙ্খলা রোধে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোই এখন অনিবার্য। শেখ সাহেব তাতে সফল না হলেও, শেখ কন্যা সে পথেই ধাবিত হচ্ছেন। এটা তার পরিকল্পনা জাত না পরিস্থিতির পরিণতি, তা বলার চূড়ান্ত সময় এখনো আসেনি। তবে পুনরায় ক্ষমতাসীন হলে, চুক্তির শেষ পরিণতি যে তা-ই হবে, তা নিশ্চিত। সে অপেক্ষায় কি শেখ হাসিনা আছেন? তাতে সম্ভাব্য বিশৃংখলার কথা ভেবে এখনই আশংকা বোধের দ্বারা অনেকে শিহরিত।

১৭

(তাং-বৃহস্পতিবার ৪ অগ্রহায়ণ ১৪০৬ বাংলা ১৮ নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রীঃ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি।

দফা নং-খ-১৪। জেলা পরিষদ আইনের '(ক) ৩২ নং ধারার উপধারা (১) ও উপধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপসচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।'

'খ) ৩২ নং ধারার উপধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে ঃ পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত অপসারণ বা অন্য

কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে উক্ত নিয়োগ ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।'

'গ) ৩২ নং ধারার উপধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলি সাময়িক বরখাস্ত অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।'
বিধি বহির্ভুতভাবে এখানে সাম্প্রদায়িক স্বশাসন ও আঞ্চলিক স্বশাসন ক্ষমতা প্রদত্ত হয়েছে, অথবা এটা স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা ও বলা যায়। তবে সংবিধানের স্থানীয় শাসন আইনে এরূপ ক্ষমতা মান্য নয়। বাঙ্গালীদের পক্ষে বঞ্চনামূলক এরূপ আইন সংবিধান বিরোধী।

আইনে স্থানীয় বাঙ্গালীদের প্রতিপক্ষ করে উপজাতীয় পশ্চাদপদতার জন্য তাদের দায়ী করাও শাস্তি প্রদান দুর্ভ্যাগ্যজনক।

এখানে চুক্তির ভূমিকাংশের অঙ্গিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। ভূমিকায় অঙ্গিকার ছিলো ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নযন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংরাদেশের সকল নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

কেবল উপজাতীয়দের জন্য আগ্রাধিকার মানে তা সর্বাধিকার। বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী বেজাত অউপজাতীয় তো হয়েছেই, তাদের সংখ্যানুপাতিক অধিকারও রহিত। সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান ও অমান্য করা হয়েছে। উপজাতীয় অগ্রাধিকার তা গ্রাস করে নিয়েছে। এর মানে হলো সংবিধানে প্রদত্ত সমানাধিকার ও লঙ্ঘিত। বাঙ্গালীরা এখানে বর্নাশ্রমে আক্রান্ত নিম্নশ্রেণীর নাগরিক।
যদি বাস্তবে উপজাতীয়রা পশ্চাতপদ হয়ে থাকে, আর তা কাটাবার জন্য অগ্রাধিকার দান প্রয়োজনীয় হয়, তা হলে তার প্রতিকারে বাঙ্গালীদের বঞ্চিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ ন্যায্য কাজ নয়। উপজাতীয় উন্নয়নকে স্থানীয় বাঙ্গালীরা কোন ভাবে গ্রাস করেনি বা ঠেকিয়ে রাখেন। উন্নয়ন বা পশ্চাদপাতা সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। বাঙ্গালীরা খোদ বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী। তাদের বঞ্চিত আর দরিদ্র রেখে প্রতিবেশী উপজাতিদের ভাগ্যোন্নয়ন করা অসম্ভব । উভয়ের জীবন পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হবেই। উন্নয়নের স্থানীয় ভোগ্য অংশ, উপজাতীয়দের পশ্চাদপতা কাটাতে এককভাবে যথেষ্ট নয়। উপজাতীয় উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন তাদেরকে জাতীয়ভাবে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। স্থানীয় বাঙ্গালীদের ভোগ্য সুযোগ-সুবিধা অতি অল্প ও নগন্য। তা থেকে বাঙ্গালীরা বঞ্চিত হলে, তদ্বারা উপজাতীয় বঞ্চনা ও চাহিদা পুরণ হবে না। এর পরিণতি হবে বাঙ্গালী অসন্তোষ আর সাথে সাথে উপজাতীয়

চাহিদার অপূর্ণতা জনিত তাদেরও অসন্তোষ। এটা হলো বাঁদরের পিঠা ভাগ। অংশীদারদের তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। যদি সরকার উপজাতীয় কল্যাণে সত্যিকার অন্তরিক হোন তা হলে ভেদনীতি ত্যাগ করে জাতীয়ভাবে পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ সুবিধা-দানের নীতি গ্রহণ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে পারেন। ভিক্ষার চাল ছিনতাই করে লাভ নেই, দরকার ভাণ্ডরের।

উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ কেবল আঞ্চলিক ক্ষমতা লাভের প্রতি প্রলুব্ধ ও সাম্প্রদায়িক কুপমন্ডুকতায় আবদ্ধ।

জাতীয় রাজনীতিকরা ও তাদেরকে ক্ষুদ কুড়োতে তুষ্ট রাখতে ব্যস্ত। এ ধারার রাজনীতিতে পার্বত্য অঞ্চলের ভাগ্যোন্নয়নের আশা করা যায় না।

পার্বত্য অঞ্চল বাসী পাহাড়ী বাঙ্গালী যতদিন রাজনৈতিক চেতনায় পরস্পর থেকে ভিন্ন তাকবে, যতদিন পর্যন্ত তারা সাম্প্রদায়িক ভাবে পরস্পরের বৈরী হয়ে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এখানে অশান্তি আর পশ্চাদতার অবসান হওয়া অনিশ্চিত। এখানকার পশ্চাদপদতা কাটাতে তাদেরকে জাতীয় ভান্ডারে ভাগ বসাতে হবে। দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরের বিরোধ ও কাড়াকাড়িতে তার নাগাল পাওয়া যাবে না। যার পরিণতি অশান্তি ও পশ্চাদপদতা। উদার অসাম্প্রদায়িক ও দুরদৃষ্টি সম্পন্ন পার্বত্য নেতৃত্বের পক্ষে দরকার, প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সম্প্রদায়কে এক রাজনৈতিক সুত্রে গ্রথিত করে একত্রে আন্দোলন করা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা। আর তখনই কেবল সুখ ও শান্তির আশা করা যাবে। বর্তমান সাম্প্রদায়িক ও বর্নবাদী চিন্তা চেতনা পশ্চাদমুখী। এ থেকে রেহাই কাম্য। দরকার অসাম্প্রদায়িক ঐক্যবদ্ধ রাজনীতির।

দফা নং-খ এর নং ১৫ থেকে ২৫ পর্যন্ত বিষয়গুলো সম্পুর্ণ প্রশাসনিক এবং সরকার ও জেলা পরিষদের আভ্যন্তরীন ব্যাপার তাতে রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত নেই। তাই সেগুলো আলোচনা থেকে বাদ রাখা হলো।

'খন্ড-খ ২৬। জেলা পরিষদ আইনের ৬৪ সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ

ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমি সহ কোন জাগয়া জমি পরিষদের পুর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত ক্রয় বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না। এই বক্তব্যটি সংবিধান ও সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ।

তবে শর্ত থাকে যে রক্ষিত বনাঞ্চল কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা বেতনুনিয়া ভু-উপগ্রহ এলাকা রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রয়োজ্য হইবে না।'

চুক্তিভুক্ত এই দফার বলে, আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে দাবী উত্থাপিত হয়েছে যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ভূমি ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা হোক, এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্দোবস্ত দানের কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করে আদেশ জারি হোক। অথচ আসল ব্যাপার হলো চুক্তির উপরোক্ত সিদ্ধান্ত আর জনসংহতি সমিতির দাবীকৃত দফা নং ২/(৫ ক) ও ২(৫ ক) ও (২৫ খ) মূলে ৪৬৫২.৯৬ বর্গ মাইল এলাকা বিরোধমুক্ত জাতীয় অঞ্চল, পরিষদীয় অঞ্চল নয়।

উপজাতীয় পক্ষের এই দাবীর ভিত্তি হলো সংশোধিত জেলা পরিষদ আইনের প্রথম তপসিলভুক্ত ২৪ নং আইটেমটি, তাতে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনার কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। চুক্তিভুক্ত এই ক্ষমতা ও ছাড় ৪৬৫২.৯৬ বর্গ মাইল এলাকার উপর প্রযোজ্য নয়।

এই ছাড়ের দ্বারা উপজাতীয় পক্ষ উল্লসিত হলেও চুক্তিতেই শুভঙ্করের ফাঁকি বিদ্যমান। কোন জেলা পরিষদের হাতেই নিয়ন্ত্রনযোগ্য খাস জায়গা জমি নেই। সরকারের প্রাপ্য বিরাট অঞ্চলই তাকে ছাড়তে হবে। আমার হিসাবে তিন জেলা পরিষদের এখতিয়ারাধীন অঞ্চল মাত্র ৪৪০.০৪ আর জনসংহতি সমিতির হিসাবে ৪৪৬ বর্গ মাইল মাত্র। উপরোক্ত আইনের দ্বিতীয় প্যারার তাৎপয্য তা-ই।

১৮.

(তাং-শুক্রবার ৫ অগ্রহায়ন ১৪০৬ বাংলা ১৯ নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

'দফা নং খ-২৬ (খ)। আপাতত ঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।' এই বক্তব্য সাধারণ ভাবে সংবিধান ও সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপই বটে।

দফা নং ২৬ (খ) এর মূল্যায়ন আগেই দেখান হয়েছে। তিন জেলা পরিষদের কোনটির হাতেই কোন খাস জায়গা জমি নেই। একমাত্র বাজার ভূমিটাই তাদের হাতে ন্যস্ত, আর এটাই নিয়ন্ত্রন যোগ্য। প্রশাসনিক এলাকাধীন যে আয়তন তিন জেলা পরিষদের এখতিয়ারভুক্ত আছে, তা থেকে কোন জেলার অংশ কত তাও জরিপের দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। প্রশাসনিক অঞ্চলের সবটাই জেলা পরিষদভুক্ত এলাকা, এ ধারণা ভুল। পাহাড় ও উপত্যকা ভূমির খাস জায়গা জমিতে জেলা পরিষদের কোন অধিকার নেই। যদি মনে করা হয়, সার্কেল ও মৌজা এলাকা বলে তা সরকারি রেকর্ড ও দখল থেকে মুক্ত, তা হলেও ভুল করা হবে। হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের ধারা নং ১৮ (২-ডি) বলে সরকারের পক্ষে পার্বত্য অঞ্চলের সমূদয় জায়গা জমির মূল নিয়ন্ত্রণ কর্তা বা কর্তৃপক্ষ হলেন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক।

খাস জমি। হ্রদের হুকুম দখলকৃত সমূদয় জায়গা জমি এখন জাতীয় সম্পত্তি। এসব জমি কখন হ্রদমুক্ত হবে তা নিশ্চিত নয়। তবে শুষ্ক মওসুমে কিছু প্রান্তিক জমি ভেসে ওঠে ও তাতে নিকটবর্তী এলাকার কৃষিজীবী লোকেরা ধান ও অন্যান্য ফল ফসল আবাদ করেন। এখন জলে ডোবা জমির পুরাতন মালিকরা দুরবর্তী অঞ্চলে পুনর্বাসিত। জলে ভাসা সব জায়গা জমি হ্রদের বাস্তুচ্যুতদের মালিকানা ভুক্ত ছিলো না। হ্রদ ভক্ত ঐ জায়গা জমির অধিকাংশ সারা বছর গভীর জলে নিমগ্নই থাকে। আর যা অংশিক ভাসে তাও সাবেক মালিকদের অধিকাংশের নাগালাধীন নয়। এখন ঐ জায়গা জমিতে সাবেক মালিকদের বসাতে গেলে বর্তমান ভোগ দখলদারীদের সাথে বিরোধ দেখা দিবে। শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে তা মোটেও কাম্য নয়। এটা হলো মীমাংসিত বিষয়কে নতুন বিরোধের কার্যকারণ রূপে খাড়া করা।

দফা নং-খ-২৭। জেলা পরিষদ আইনের ৬৫ নং ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ

আপাতত ঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে, এবং জেলার আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।'

এই বক্তব্যের প্রথম অংশ সংবিধানের পক্ষে অমর্যাদাকর।

দফা নং-খ-২৭ (ক) অনুযায়ী জেলা পরিষদের প্রাপ্য ভূমি কোন জেলায় কত, তা আগে জরিপের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে। এই ভূমির দখল বা এখতিয়ার কাগজে-কলমে হস্তান্তরিত হলে পরে, ঐ সীমাবদ্ধ জায়গা জমির উন্নয়নকর মাত্র, জেলা পরিষদের প্রাপ্য হবে। এই পাওনার ভিতর জেলা ভুক্ত সমুদয় জায়গা জমির উন্নয়ন কর অন্তর্ভুক্ত নেই। এখানে আরেকটি ফাঁকি হলো ঃ সরকারীভাবে দেশে ৩০ বিঘা পর্যন্ত জায়গা জমির খাজনা মওকুপ আছে তবে উন্নয়ন কর প্রদেয়। তবে পার্বত্য অঞ্চল এরূপ খাজনা মুক্ত কিনা তা আদেশ বা আইনে পরিষ্কার নয়। এখানে রেয়াতহীন খাজনা উশোল প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। তবে খাজনা মাফ না হলেও, উন্নয়ন করটা স্থগিত আছে। এদেশে আইনের ভিন্ন ভিন্ন এই ধারা প্রক্রিয়া, অখন্ড রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের পরিপন্থী।

দফা নং ২৬ ও ২৭-এর উপধারা, এবং তার সহযোগী অন্যান্য আইনের বিবরণে ব্যক্ত বক্তব্য ঃ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ইত্যাদি বিবরণ আপত্তিকর। এটা সংবিধানের পক্ষে মানহানিকর।

১৯

(তাং-সোমবার ৮ আগ্রহয়ন ১৪০৬ বাংলা ২২ নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

সার্কেল বা মৌজা উপজাতীয় চীফ ও হেডম্যানদের প্রাপ্ত জামিদারী নয়। জেলা প্রশাসকদের পক্ষে তারা প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ও জুম কর আদায়কারী আর সরবরাহকার মাত্র। তদোতিরিক্ত তাদের দায়িত্ব হলো উপজাতীয় সমাজ নিয়ন্ত্রণ, শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় সহায়তা দান ও করাদি উশোল। রেগুলেশন নং ১/১৯০০ ও পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইন কোন চীফ ও হেডম্যানকে জামিদারী ক্ষমতা দান করেনি। তাতে তারা জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারী রাজস্ব এজেন্ট রূপেই মান্য। সুতরাং তাদের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা উপজাতি সমাজের প্রথাগত ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। অবাধে জুম করতে পারা ও পল্লী অঞ্চলে তিরিশ শতক পর্যন্ত জমি গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারের অবাধ অধিকারকে ও প্রথাগত ভূম্যাধিকার বলে স্বীকার করা যায় না। এটা দরিদ্র অনুন্নত জুমিয়া সমাজের প্রতি সরকারের উদার ব্যবস্থা। আসলে জুম চাষ বেআইনী ও নিষিদ্ধ পেশা এবং তাতে ভূম্যাধিকার অর্জিত হয় না। বর্ণিত আইনের ধারা নং ৪১ ও ৪১ (ক) তে এতদ সংক্রান্ত বিধি নিষেধ লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং সমুদয় পার্বত্য ভূমির উপর সরকারের পরিপূর্ণ মালিকানা ও কর্তৃত্ব বিদ্যমান। এর অতিরিক্ত সরকার বন আইন জারির মাধ্যমে ১২২০.৯৬ বর্গমাইল অঞ্চলকে সংরক্ষিত বন ৩১৬৬ বর্গমাইলকে রাষ্ট্রীয় বন রূপে নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করে বৃটিশ আমল থেকে ভোগ দখল করছেন। পাকিস্তান আমলে ২৫৬ বর্গমাইল খাস ও আবাদী এলাকা হুকুম দখল করে কর্ণফুলী হ্রদ স্থাপিত হয়েছে। পরে অধিগ্রহণকৃত ও খাস এলাকা জুড়ে স্থাপিত হয়েছে, কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প, শিল্পাঞ্চল ও ভূ-উপগ্রহ স্থাপনা সহ এই ৪৬৫২.৯৬ বর্গমাইল এলাকা এখন বিরোধমুক্ত সরকারি অঞ্চল। প্রশাসনিক সদর দপ্তরগুলো তারই ভিতর পড়ে। জেলা প্রশাসকেরা এই সরকারী সম্পদ সম্পত্তির জিম্মাদার। চুক্তির দফা নং খন্ড খ-২৬ (ক)-এর দ্বিতীয় প্যারার বর্ণনা বলে জেলা পরিষদ সমূহ এই সরকারী অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকারী নয়। এখন এটি বিরোধমুক্ত। তবু বাড়াবাড়ি করা হলে, জেলা প্রশাসনের এ বলার অধিকার আছে যে, জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ, নিজ নিজ দপ্তরাদি সহ সরকারী দপ্তর ভুক্ত অঞ্চলে সম্পত্তির বে-আইনী দখলদার। এই মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ (ক) দফাটি চুক্তিভুক্ত মীমাংসিত বিষয়। ৪৪০.০৪ বর্গ মাইলের বাহিরে জেলা পরিষদের প্রাপ্য কোন জমি নেই। বর্ণিত খ/গ দফা ভুক্ত বিধি ব্যবস্থা ও আপত্তি এখন আমলযোগ্য নয়। জরিপের মাধ্যমে এলাকা নির্দিষ্ট হলে, নির্দিষ্ট ভূমিতেই এই আদেশ দুটি আমলযোগ্য হবে।

'দফা নং-খ ২৬ (গ)। কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেয়া হইবে।

কর্ণফুলী হ্রদের আয়তন হলো ২৫৬ বর্গমাইল, তথা ১৬৩৮৪০ একর। এর ভিতর দখলীয় আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিলো মাত্র ৫৪০০০ একর, যা ক্ষতিপূরণ প্রদান পূর্বক অধিগ্রহণ করা হয়েছে। হ্রদভুক্ত বাকি ১০৯৮৪০ একর জমি হলো সরকারী

'দফা নং-খ ২৮। জেলা পরিষদ আইনের ৬৭ নং ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ

পরিষদে ও সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে, সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।'
আন্তঃ কর্তৃপক্ষ সমঝোতা ও সমন্বয় অতি জরুরী বিষয়। জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষে ঘন ঘন অভিযোগ উঠছে ঃ চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তাদের প্রাপ্য ক্ষমতা হস্তান্তরিক হচ্ছে না। এ ব্যাপারে দীর্ঘসুত্রিতা ও ফাঁকি অবলম্বিত হচ্ছে। জেলা প্রশাসন অন্যায়ভাবে জমি বন্দোবস্তি ও হস্তান্তর কার্যকর করছে এবং প্রশাসনিক এখতিয়ারকে কুক্ষিগত করে রেখেছে।

আসলেও হস্তান্তরিত বিষয় সমূহে দ্বৈত কর্তৃত্ব বিদ্যমান। বিষয় বিভক্তি শৃংখলাপূর্ণ হয়নি। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কাঠামো মূলত কেন্দ্রীয়। তাতে স্বতন্ত্র আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা বিধি সম্মত নয়। স্থানীয় বা আঞ্চলিক পরিষদসমূহ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। স্থানীয় পরিষদ সমূহের কেবল আভ্যন্তনীণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাই প্রাপ্য, এবং তাতেও কেন্দ্রীয় আধিপত্য কার্যকর। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা দ্বৈত শাসনভুক্ত বিষয়। তাতে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রত্যাহৃত হয় না।

কেন্দ্রীয় সুপ্রীম কর্তৃত্বই এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের প্রাপ্য বিষয়। এই সুপ্রীমেসি স্থানীয় শাসন কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় ও মান্য। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বিকেন্দ্রিক ক্ষমতা একক কেন্দ্র ভিত্তিক স্থানীয় শাসন কর্তপক্ষের প্রাপ্য নয়। এই মূলনীতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব তার জেলা প্রতিনিধির কর্তৃত্বাধীন হবে। তার সাথে আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে অর্পিত বিষয়াদির কার্য্য সম্পাদন বাঞ্ছনীয়।

কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে, স্থানীয় পরিষদগুলো সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্সে আক্রান্ত। তারা কেবল পার্বত্য মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর আনুগত্যাধীন হয়ে আছেন। অথচ স্থানীয় শাসন হলো পৃথক মন্ত্রণালয়ের অধীন বিষয়। এ হিসাবে ভাবতে গেলে পার্বত্য মন্ত্রণালয় হলো স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন শাখা মন্ত্রণালয়, এবং অর্পিত বিষয়গুলো বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন, যে জন্য সনন্বয় ও কঠিন। স্থানীয় ভাবে জেলা প্রশাসনই এর যোগসূত্র, যার প্রধান হলেন জেলা প্রশাসক। তাই জেলা প্রশাসকই সমন্বয়কারী স্থানীয় প্রধান।

সরকারের প্রশাসনিক বিন্যাস অনুযায়ী, পার্বত্য জেলা প্রমাসকেরা হলেন স্থানীয় কর্মকর্তাদের বোস, তবে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে তারা স্থানীয় জেলা আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানদের চেয়ে মর্যাদায় ছোট। তবু সরকারের পক্ষে তিনি বা তারা প্রতিনিধি ও জেলা হাকিম এবং জেলা জজ ও বটে, যে কোন অপ্রিয় ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী, যা পরিষদ ও চেয়ারম্যানদের বিপক্ষেও গৃহীতব্য। এই

চূড়ান্ত ক্ষমতা ও মর্যাদার ভিত্তিতে স্থানীয় সমন্বয় ও সমঝোতা সভা জেলা প্রশাসকদের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়াই যথার্থ, এবং ঐ সভার সিদ্ধান্তই হবে সবার জন্য মান্য।

এখন কার্যতঃ পরিষদগুলো আত্মকেন্দ্রিক ও রাজধানী ভিত্তিক তৎপর। তাদের কাছে জেলা প্রশাসকেরা তুচ্ছ। এজন্য সবারই সমন্বয় সভা পৃথক পৃথক হয়। পরিষদ ও জেলা প্রশাসন পরস্পরকে এড়িয়ে চলেন। প্রশাসন ও পরিষদ সমুহের একত্রিত সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় খুব কমই। মর্যাদা ও ক্ষমতা কেন্দ্রিক সুপ্রীমেসি কার প্রাপ্য, এই অহংই সমন্বয় সাধনের পথে বাধা। এটি অপসারনে কেন্দ্রকেই হস্তক্ষেপ করতে হবে। তাকে পরিষ্কার করে বলতে হবে ঃ জেলা প্রসাসকেরা সরকারী প্রতিনিধি। সব বিষয়ে তাদের কর্তৃত্ব বিদ্যমান। সরকারের পক্ষে তারাই স্থানীয় সমন্বয়ক। যেহেতু জেলা প্রশাসন ও পরিষদ ভিত্তিক সমন্বয় প্রয়োজন। সেহেতু জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে অর্পিত বিষয়াদির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমন্বয় সাধনই বাঞ্ছিত। প্রতিটি ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বা পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের দ্বারস্থ এবং পার্বত্য মন্ত্রণালয়কে সংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের মুখাপেক্ষী হওয়া সময়ক্ষেপক ও বিব্রতকর। তার চেয়ে সর্বোত্তম ও ত্বরিত ফলদায়ক হলো ঃ সকল বিষয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত জেলা প্রশাসনকে স্থানীয়ভাবে ব্যবহার করা ও গ্রহণ।

সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্সের ব্যাপার এড়াতে সমন্বয় সভায় পরিষদ চেয়ারম্যানদের উপস্থিতি বাদ দেয়া যায়। তাদের হয়ে সমন্বয় সভায় নির্বাহী কর্মকর্তারা উপস্থিত হতে পারেন।

এমন ব্যবস্থা নিয়মিত করণ ছাড়া প্রশাসন ও পরিষদগুলো পরিচালনায় সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়। কেবল ঠেলাঠেলি তুচ্ছজ্ঞান আর অবিশ্বাস উভয় কর্তৃপক্ষকে দুই মেরুতে ঠেলে রাখছে।

সমন্বয় ও মানা মানির সহনীয় পরিবেশ গড়ে উঠতে অবশ্যই সময় লাগবে। পরিষদ ব্যবস্থা ও এককেন্দ্রিক শাসনের সহাবস্থান অবশ্যই নতুন। এর কলা কৌশল নিয়ম পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রতিস্থাপন হুট করে সম্ভব নয়। গ্রহণ বর্জন ও ভাঙ্গাগড়ার ভিতর একটি কার্যকর পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। এটি তাড়াহুড়ার বিষয় নয়।

পদ্ধতিগত ভাঙাগড়া ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা সময় সাপেক্ষ হলেও, ক্ষমতাসীনরা সময়ক্ষেপণে বিক্ষুব্ধ হোন। এই ক্ষোভ অসন্তোষে সরকার পক্ষ বিব্রত হতে পারে। প্রতিপক্ষের অনেকে সদ্য সশস্ত্র সংগ্রাম ফেরৎ ব্যক্তিত্ব। তাদের মাঝে উগ্রতার রেশ এখনো বিদ্যমান। তাদেরকে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনতে সহনশীল হতে হবে। তাদের তোষণ পোষণ কাম্য। উদার মনোভাবেই সরকার পক্ষকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। তবে সময়ই বলে দিবেঃ উপজাতীয়দের লক্ষ্য প্রবোধ মানা নয়, কেবল অর্জন আর অধিক অর্জন।

(তাং-সোমবার ৬ পৌষ ১৪০৬ বাংলা ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

'দফা নং-খ-২৯। জেলা পরিষদ আইনের ৬৮ নং ধারার উপধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপণ দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পরিবে, এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনরবিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।'

এটি সরকারের উপর জেলা পরিষদের মাতবরী করার অধিকার দান। এটা প্রতিটি পদক্ষেপে দেশ জুড়ে জনমত যাচাই প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটাবে। তাতে প্রতিটি কাজে দীর্ঘ সুত্রিতা হবে অনিবার্য এবং সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা ও জাতীয় পরিষদের আইন প্রণয়নমূলক সার্বভৌমত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমন পদক্ষেপ গ্রহণ হবে দুর্ভাগ্যজনক। সারাদেশের জন্য এটি হবে মন্দ উদাহরণ। সমতল জেলা পরিষদগুলো অনুরূপ ক্ষমতার প্রতি স্বাভাবিকভাবে উৎসাহী হয়ে উঠবে, এবং তা না দেয়াটাও হবে বৈষম্যমূলক। জাতীয় সংবিধান ভিন্ন ভিন্ন জেলা পরিষদ বিধানের প্রতি অনুমোদন দান করে না। প্রতিদ্বন্দ্বী আঞ্চলিক কর্তৃত্বে নয়, একমাত্র বশংবদ কর্তৃত্বে অগুরুত্বপুর্ণ বিষয়াবলীতেই স্থানীয় শাসন সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। এ কারণেই স্থানীয় শাসন মানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন নয়। এটা হলো স্থানীয় ক্ষমতালোভীদের অল্পে প্রবোধ দান ব্যবস্থা। সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাটি এই অল্পে প্রবোধের সীমা লঙ্ঘণ করে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সেটা স্থানীয় শাসন ক্ষমতাধীন বিষয় নয়। বুঝতে হবে স্থানীয় শাসন ও স্বায়ত্তশাসন এক নয়, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতার নাম।

'দফা নং-খ-৩০ জেলা পরিষদ আইনের (ক) ৬৯ ধারার উপধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'করিতে পারিবে' এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মত ভিন্নতা পোষণ করে, তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।'

(খ) ৬৯ নম্বর ধারা উপধারা (২) এর (জ) তে উল্লেখিত পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।'

আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ হলো সরকারের অধীন অধঃস্তন প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্র প্রণীত বিধি বিধানের অনুকূলে প্রবিধান রচনায় তাদের ক্ষমতা থাকা মানে স্বাধীনতা অবলম্বন বা কেন্দ্র বিচ্যুতি নয়। যেহেতু এগুলো স্থানীয় শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, এজন্য অবশ্যই কেন্দ্রের আজ্ঞাবহ। তাদের কোন স্বাধীন বা স্বায়ত্তশাসন মূলক কর্তৃত্ব প্রাপ্য নয়। এখানে এই মৌলিক নীতি লজ্ঘণ করা অনুচিত। কেন্দ্রের পক্ষে এরূপ নতজানু নীতি গ্রহন অবাঞ্ছিত।

গুরুতর অসদাচরণ, নীতি লজ্ঘন, দুর্নীতি ও অপরাধজনিত কারণে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাকে অপসারণ জরুরী হয়ে দাঁড়ালে, বিকল্প ব্যবস্থা কি হবে, আইনে তার সুনির্দিষ্ট বর্ণনা থাকা দরকার। জেলা পরিষদ আইনে ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনে সংশ্লিষ্ট বিধান থাকা জরুরী। এখন এই সংশোধনের কারণে তাতে শূণ্যতা দেখা দিয়েছে। পরামর্শ দান ও অনুশাসন করার বর্ণনা অস্পষ্ট। সরকারের এই অস্পষ্ট ক্ষমতার বিপরীতে নিম্নোক্ত সংশোধনীটি অসহায়ত্বকে আরো প্রকট রূপে ব্যক্ত করে যথা ঃ

'দফা নং-খ-৩১। জেলা পরিষদ আইনের ৭০ নং ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।
তাতে আছে ঃ 'ধারা ৭০। ক্ষমতা অর্পণ। সরকার এই আইনের অধীন ইহার সকল অথবা যে কোন ক্ষমতা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অর্পন করিতে পারিবে।'

এই ক্ষমতা বিলুপ্তি মানে দমন বা নিয়ন্ত্রণ মূলক ক্ষমতার অবসান। এখানে সরকারের অসহায়ত্ব ও নতজানু নীতি আরো স্পষ্ট। এর মানে কি এটাই যে, অঞ্চলটি অলিখিত বা অঘোষিতভাবে আত্মনিয়ন্ত্রিত? এছাড়া তো এই শৈথিল্যের কোন মানে হয় না।
'দফা নং-খ-৩২। জেলা পরিষদ আইনের ৭৯ নং ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে। ঃ

পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর ও আপত্তিকর হওয়ার কার্যকারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।'

উপজাতীয়দের প্রতি লাগামহীন শিথিল মনোভাবের এটা আরেক উদাহরণ। জেলার জন্য কষ্টকর ও উপজাতীয়দের পক্ষে আপত্তির এ কথাগুলোর যথার্থতা নির্ধারণ করা হবে কঠিন। বিষয়গুলোর পক্ষে-বিপক্ষে জনমত যাচাই ছাড়া কেবল পরিষদের অভিমতে পরিচালিত হওয়াটাও যথার্থ নয়। উপজাতীয়দের পক্ষে আপত্তিকর বিষয় তো অনেক। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও বাঙ্গালী প্রত্যাহার ও তাদের কাম্য বিষয়।

জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনে তা অন্তর্ভুক্ত নেই, বরং চুক্তির ভূমিকাংশে সকল নাগরিকের কল্যাণ ও অধিকারের পক্ষে অঙ্গিকার ব্যক্ত হয়েছে, এবং তাই হবে স্থানীয় আইনেন ভিত্তি। উপজাতীয়দের দাবী কেবল নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারে সীমাবদ্ধ। এ রূপ ঢালাও আপত্তি কি বিবেচনা যোগ্য? অথচ বর্ণিত দফায় ঢালাও উদারতাই প্রদর্শিত হয়েছে, যা নতজানু মনোভাবের আরেক নমুনা। আইন ও নীতির ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন ও ছাড় দান ভয়ঙ্কর উদারতা।

'দফা নং-খ-৩৩। (ক) প্রথম তফসিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বরে শৃঙ্খলা শব্দটির পরে তত্ত্বাবধান শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।'

এই দফার অনুকূলে নিম্নোক্ত আইন প্রণীত হয়েছে ঃ
তফসিল নং " ২২ঃ পরিষদের কার্যাবলী। (ঘ) পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন।

কার্য্যতঃ সাধারণ প্রশাসন কেন্দ্রীয় বিষয়। জেলা প্রশাসনের উপর বিভাগীয় কমিশনারের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের ক্ষমতা প্রদত্ত আছে। আঞ্চলিক পরিষদ বিভাগীয় ক্ষমতায় গঠিত নয়। একটি অপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ হলো আঞ্চলিক পরিষদ, যার এখতিয়ার কার্যতঃ স্থানীয় শাসনে সীমাবদ্ধ, যেখানে আঞ্চলিক প্রশাসন ক্ষমতা প্রয়োগযোগ্য নয়। এই ক্ষমতা ও এখতিয়ার কোন স্বীকৃত প্রশাসনিক ইউনিট ভিত্তিকও নয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগ ক্ষেত্র হলো প্রশাসনিক ইউনিট। পার্বত্য চট্টগ্রাম না জেলা, না বিভাগ। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রশাসনিক ইউনিট ভিত্তিক অবস্থান নেই। তদুপরি তার গঠন ভিত্তি হলো স্থানীয় শাসন আইন। তাতে কেন্দ্রীয় বিষয়ের উপর তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের কাজ বিপুল আয়োজন ও ক্ষমতা বিশিষ্ট বিরাট বিষয়। তজ্জন্য ম্যাজিস্ট্রেসি পুলিশ প্রকৌশল সংস্থা ও দক্ষ জনবলের প্রয়োজন এবং তার সহায়ক বিরাট কর্মী বাহিনী অপরিহার্য। যা হবে আড়ম্বরপূর্ণ বিষয়। স্থানীয় শাসন ক্ষমতাধীন আঞ্চলিক পরিষদের এমন ব্যাপক পরিসর প্রতিষ্ঠান হওয়া কি করে সম্ভব?
২১

(তাং-৮ পৌষ ১৪০৬ বাংলা ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রীঃ/ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।
'দফা নং-খ-৩৩ (খ)। পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে সংযোজন করা হইবে। (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

(গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর (৬-খ) উপ-ধারায় সংরক্ষিত বা শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।স্ব

পরিষদের কার্যাবলী তফসিলে বর্ণিত বিষয়াবলী দ্বৈত কর্তৃত্বে পরিচালিত। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় দপ্তরই মূল পরিচালক। পরিষদ হলো অধঃস্তন কর্তৃপক্ষ। এই কাজ দ্বৈত কর্তৃত্বে সমন্বয় সাধন হবে অত্যন্ত ঝামেলাপুর্ণ কাজ। উদাহরণ রূপে উল্লেখ্য ঃ শিক্ষা হলো কেন্দ্র পরিচালিত একটি মৌলিক বিষয়, তাতে বিশ্ববিদ্যালয় গুলো স্বায়ত্তশাসিত, এবং কৌমী মাদ্রাসাদী তাই। প্রাথমিক শিক্ষা, ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী, বাদ বাকি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী বোর্ড পরিচালিত। এখন তিন পার্বত্য জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারী সরকার ও বোর্ড পরিচালিত রেখে, পরিষদ নিয়ন্ত্রিত করা মানে তাতে দ্বৈত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। সুষ্ঠু পরিচালনার পক্ষে এই দ্বৈত কর্তৃত্ব অবশ্যই ঝামেলা মুক্ত হবে না। এমনি হস্তান্তরিত প্রতিটি বিষয় ও বিভাগের দ্বৈত কর্তৃত্ব হবে অবশ্যই ঝামেলা পূর্ণ কাজ। এমনি হস্তান্তরিত প্রতিটি বিষয় ও বিভাগে দ্বৈত হস্তক্ষেপ আরোপিত হওয়া অবধারিত। বিষয় ভিত্তিক উর্ধ্বতন সরকারী কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ বিষয় পরিচালনায় প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রাপ্ত। জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান। এরা কোন অধীনতা নয়, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রত্যাশী। এই দ্বৈত চরিত্র সম্পন্ন দুই কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব বিলাসের সমন্বয় সাধন হবে একটি কঠিন কাজ। এ রূপ সমন্বয়ের পক্ষে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন আবশ্যক হবে। যার অবর্তমানে হস্তান্তরিত বিষয়াবলী পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে ও দিবে। এর সমাধানে পার্বত্য অঞ্চল ভিত্তিক পৃথক কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠা হবে অমঞ্জুর কৃত স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতাদান । আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দান মানে তো রাষ্ট্রের এককেন্দ্রিকতা পরিহার।

স্থানীয় শাসনের অধীন হস্তান্তরিত বিষয়াবলী পরিচালনা মানে কেন্দ্রীয় এজেন্সির দায়িত্ব পালন। এটি মৌলিক কর্তৃত্ব নয়। জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষে স্থানীয় শাসন ক্ষমতার পরিধি মেনে বিষয়াবলী ও দায়িত্ব পরিচালিত হতে হবে। এই সীমারেখা পালিত হচ্ছে কিনা, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ তা-ই দেখবেন।

পৃথক আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ গঠন ছাড়া কি করে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদান ব্যবস্থার প্রবর্তন করা সম্ভব? স্থানীয় শাসনের সীমিত ক্ষমতার ভিতর তা হয় না। ১০/১২টি স্থানীয় ভাষার বর্ণ উদ্ভাবন, বই পুস্তক রচনা মুদ্রণ ও সরবরাহ সংশ্লিষ্ট ভাষার শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ, এবং উচ্চতর শিক্ষা পদ্ধতির সাথে তার সংযোগ সাধন, সহজ কাজ নয়। এটা জাতীয় দায়িত্ব হলেও তা নিয়ে হিমসিম খেতে হবে। তদুপরি কারিগরী ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব পালন আরেক দুরুহ কাজ। জেলা ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের সীমিত ক্ষমতার পক্ষে তা বহনযোগ্য নয়। কেবল নিম্নতম কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ বেতন ভাতা দান, বদলী, এবং কিছু শৃঙ্খলাজনিত আদেশ নিষেধ দানে বিষয়টি সীমাবদ্ধ থাকলে, তবেই এই দায়িত্ব পালন সম্ভব। কার্যতঃ দেখা যাচ্ছে হস্তান্তরিত বিষয়াবলী সংক্রান্ত উপরোক্ত হাল্কা দায়িত্ব পালনই মাত্র জেলা পরিষদ কর্তৃক পারিচালিত হচ্ছে, এবং আঞ্চলিক পরিষদ তার উপর মাতব্বরী করছে। এর অতিরিক্ত দায়িত্ব দান হবে মাথাভারি ব্যবস্থা। মূল

সাংগঠনিক কাজ সরকারী বিভাগ ও কর্তৃপক্ষেরই নিয়ন্ত্রণাধীন আছে। তবে সত্য হলো ঃ কারো দায়িত্ব পালনই এখন আর নিরঙ্কুশ নেই। কেন্দ্র কর্তৃক স্থানীয় উঠকো হস্তক্ষেপকে এখন মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ক্ষমতার এই ভাগাভাগি ও ঠোকাঠুকি এ পর্যন্ত স্বস্তিকর বলে অনুভূত হয়নি। বিশেষতঃ আঞ্চলিক পরিষদের আচরণে মনে হয় উক্ত কর্তৃপক্ষ নিজেকে ভাবেন এক ক্ষুদ্র সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ। উক্ত পরিষদের চেয়ারম্যান নিজেকে ক্ষুদ্রে রাষ্ট্র প্রধানই মনে করেন। আজ পর্যন্ত তিনি সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছাড়া অন্য মন্ত্রীদের কাউকে সৌজন্যমূলক অভ্যর্থনা দিতে ও অনেক ক্ষেত্রে হাজির হোন নি। নিজের প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাটিও তার কাছে সন্তুষ্টজনক নয়। বাড়তি বেতন ভাতা গাড়ী-বাড়ি ও মর্যাদার বিকল্প থাকলে, এ পদবিটি তিনি প্রত্যাখ্যানই করতেন বলে মনে হয়। তার ধারণা ঃ জনসংহতি সমিতির আন্দোলনের কারণে উপজাতীয় পাতি নেতা ও পুর্ণমন্ত্রী হয়েছেন, অথচ মূল নেতা নিজে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এটি অবমূল্যায়ন। বাস্তব না হলেও তিনি নিজেকে মনে করেন আরো উচু রাজনৈতিক পদ ও মর্যাদার অধিকারী কেউ একজন। চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য না হলে, সম্ভাব্য জুম্ম রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের মর্যাদাই হতো তার প্রাপ্য, অথবা তিনি হতেন তার সরকার প্রধান। তার তুলনায় বাংলাদেশের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের সবাই অধঃস্তন। সুতরাং তাদের অভ্যর্থনা দান অমর্যাদাকর। এই সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্সেই তিনি ভোগছেন।

'দফা নং-খ ৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা খ) পুলিশ (স্থানীয়) গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার ঘ) যুব কল্যাণ ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন চ) স্থানীয় পর্যটন ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান জ) স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী নালা-খাল বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা ঙ) জন্ম মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান
সংরক্ষণ ট) মহাজনী কারবার ঠ) জুম চাষ।

ইতোপূর্বে মঞ্জুরকৃত দায়িত্বাদির সংখ্যা হলো বাইশ। এখন তা বেড়ে হলো মোট ৩৬। কিন্তু এই দায়িত্ব পালন মানে কেন্দ্রকে যোগালি দেয়া ও নিম্নস্তরে বেতন ভাতা নিয়োগ ও বদলীর কাগজপত্রে সই দান। মৌলিক দায়িত্ব ও পরিচালনা হলো কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত। স্থানীয় ক্ষমতা হলো এজেন্সী বিশেষ। অবহেলা যোগ্য হলেও এটি হস্তক্ষেপকারী ও বিব্রতকর ক্ষমতা। এর মধ্যে সর্বাধিক আপত্তিকর হলোঃ আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ২২ (ঘ) ধারায় প্রদত্ত ছাড়, যাতে বলা হয়েছে ঃ আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য জেলা সমূহের সাধারণ প্রশাসন আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নমূলক কাজের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের অধিকারী হবে। এটি কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ

বিশেষ। এই ব্যবস্থা স্থানীয়ভাবে প্রশাসনে অচলাবস্থার সৃষ্টি করবে। দ্বৈত কর্তৃত্বে এতদাঞ্চল হবে পিষ্ঠ। ইতোমধ্যে হস্তান্তরিত বিষয়াবলীতে দ্বৈত কর্তৃত্বের টানা হেচড়ায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জমি বন্দোবস্তি ও হস্তান্তর হয়ে পড়েছে প্রায় অচল তথা দীর্ঘ প্রক্রিয়াধীন ও হয়রানীমূলক। নিয়োগ বদলী ব্যবসা ও উন্নয়ন কাজে বহু কর্তৃত্বের ছড়াছড়ি, ও ঝামেলা সমূদয় কাজ কর্মকে স্থবির করে দিয়েছে। ভুক্তভোগী জনসাধারণের পক্ষে এই অচলাবস্থা সুখকর নয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের জেলা পরিষদ নিয়োগ দিলেও সে নিয়োগ আটকে দিচ্ছে আঞ্চলিক পরিযদ। এ হলো অধিক সন্যাসীতে গাজন নষ্টের মত অবস্থা।

২২

(তাং-বৃহস্পতিবার ৯ পৌষ ১৪০৬ বাংলা ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৯খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত হওয়া মানে পার্বত্য অঞ্চল থেকে সরকারের হাত গুটিয়ে নেয়া। এটা কি করে স্থানীয় শাসন ভুক্ত বিষয় হয়? সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন তত্ত্বাবধান আর সমন্বয় সাধন সহ ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত হওয়ার পর সরকার তো দেউলিয়ায় পরিণত হয়ে গেছেন। এরপর স্বায়ত্তশাসন দানের আর কিছু তো অবশিষ্ট নেই। এভাবে সরকার তলে তলে উপজাতীয়দের অঘোষিতভাবে শুধু আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনই নয় সঙ্গোপনে স্বাধীনতার কাছা-কাছি পৌছে দিচ্ছেন। অথচ এসব ক্ষমতা তাদের পাঁচ দফা দাবী নামায় অন্তর্ভুক্ত নেই। বিদ্রোহীদের সন্তুষ্ট করার এই বাড়াবাড়ি হয় বড় ধরণের রাজনৈতিক ভুল, অথবা অপুরণযোগ্য ফাঁকি। সরকারের মূল লক্ষ্যঃ অপূরণ যোগ্য প্রতশ্রিুতিতে বিদ্রোহীদের অক্ষম করে দেয়া ও কাবুতে ফেলা। অথবা তার পরিণতি হবে স্বাধীনতার পথে আরো অগ্রগতি দান। তেমন পরিস্থিতিতে সরকারকে পার্বত্য অঞ্চলের প্রতিরক্ষা নিয়ে সংকটে পড়তে হবে।

প্রতিরক্ষার পক্ষে নবতর হুমকি মোকাবেলার উপায় হলো ঃ সম্ভাব্য আগ্রাসনের আশংকায় সেনা স্থাপনা ও পাশাপাশি স্বপক্ষীয় জনশক্তি বৃদ্ধি। উপজাতীয়দের তখনই বাধ্য করা সম্ভব, যখন তারা কার্যতঃ কোণঠাসা ও সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। তাদের শক্তির ভিত্তি হলো সীমান্তে অবস্থান, স্থানীয় দুর্গমতা, সীমান্ত পারের মদদ, সংখ্যা প্রাধান্য ও স্থানীয় ক্ষমতা। এসবের বিকল্প হলো সেনা শক্তি ও বাঙ্গালী উপস্থিতি।

প্রথম তফসিলে বর্ণিত ক্ষমতার ব্যাপারে ধুরন্ধর উপজাতীয় নেতাদের পক্ষে ভিন্ন অর্থ করার প্রচুর অবকাশ আছে। যেমন তারা ফেকড়া ধরছেন ঃ চুক্তিভুক্ত আভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে বাঙ্গালী অন্তর্ভুক্ত নয়। তেমনি মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ অর্থ হবে ব্যাংকের অর্থলগ্নী কাজে নিয়ন্ত্রণ ও অনুমোদন এবং জুম চাষ অর্থ

আবাদ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ।

স্থানীয় পুলিশ বাহিনী গঠন মানে হবে রাষ্ট্রীয় পুলিশ বাহিনীর বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক বাহিনী প্রস্তুত করা। এর উদাহরণ হলো ঃ ১৯৪৭ সালে স্থানীয় পুলিশ বাহিনীকে উপজাতীয় বিদ্রোহী নেতারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন। উপজাতীয় আইন মানে তাদের সামাজিক আইন হলে সে আইনের বিধি বিধান সংকলন করা দরকার। উপজাতীয়দের মাঝে বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায় বিদ্যমান। যাদের রীতি নীতি প্রথা ও অপরাধের অনুভূতি ভিন্ন ভিন্ন। এসব সংগ্রহ করা ও তাদের দ্বারা অনুমোদন করান হলো বিরাট দায়িত্ব। তৎপর তদনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা সংগঠন আরেক জটিল কাজ। এ কাজগুলো হলো সরকারের বিচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাধীন বিষয়। আইন সংকলন, সংশ্লিষ্ট উপজাতীয় সমাজের দ্বারা তার অনুমোদন, তৎপর তাতে জাতীয় সংসদের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ, অতঃপর তার ভিত্তিতে বিচারক প্রশিক্ষণ ও বিচার ব্যবস্থা সংগঠন, সবই সময় সাপেক্ষ দুরুহ কাজ। প্রচলিত পার্বত্য শাসন বিধি বা রেগুলেশন নং ১/১৯০০ অনুযায়ী, উপজাতীয় মামলাদির বিচার প্রথাগতভাবে হেডম্যান ও চীফদের দ্বারা এবং চূড়ান্তে জেলা প্রশাসকের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যার বিধি বিধান মৌখিক। এই ব্যবস্থা অতঃপর নিয়মিত আইন ও আদালতের এখতিয়ারাধীন হবে। যা হবে হেডম্যান ও চীফদের অসন্তোষের কারণ। যারা উপজাতীয় সমাজের নেতৃ ক্ষমতা সম্পন্ন সর্বাধিক শক্তিশালী পক্ষ। তাদের বিরোধিকার ফল হবে, নতুন বিচার ব্যবস্থার দ্বারা পর্বতের মুষিক প্রসব। এই আশংকার বিষয়টি ফেলনা নয়।

পরিবেশ সংরক্ষণের দোহাই ঝেড়ে, উন্নয়নমূলক উদ্যোগাদি বাধাগ্রস্ত করা, অথবা তা থেকে অনৈতিক আর্থিক সুবিধা আদায়ের সুযোগ নেয়া যাবে। শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স প্রদানের প্রথা চালু হলে, তা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ফড়িয়াবাজি দুর্নীতি ও স্থবিরতা আনয়ন করতে পারে। যেহেতু লাইসেন্স প্রাপ্তিতে উপজাতীয় অগ্রাধিকার থাকবে এবং কার্যতঃ তারা ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রবণ নন। সেহেতু এই লাইসেন্স খরিদ বিক্রির পণ্যে পরিণত হবে, এবং তা কেবল সুযোগ সন্ধানীদের হাতে যাবে। তাতে সৎ ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহী লোকেরা হবে হতাশ ও বঞ্চিত, যারা বিশষতঃ হবে বাঙ্গালী। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে না বলেই আশংকা করা যায়। শিল্প স্থাপন ও তাতে বিনিয়োগ লাভজনক মনে করা হলেও, তা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সাপেক্ষ ঝুঁকিপুর্ণ কাজ। উপজাতীয় সমাজে এরূপ ধনী ও অধ্যবসায়ী লোক অত্যন্ত বিরল। এতদসত্ত্বেও তাদের অগ্রাধিকার ধরে রাখা হবে, যে জন্য শিল্প গড়ে ওঠা হ্রাস বা সীমিত হওয়াই সম্ভব। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত জেলা পরিষদের ক্ষমতা তফসিল ঘোষিত হলেও, তার ভিন্ন অর্থ করে ঐ সংস্থা দুটি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

'দফা নং-খ-৩৫। দ্বিতীয় তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপীয় কর, রেইট টোল, এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি খ) পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের উপর কর গ) ভূমি ও দালান কোটার উপর হোল্ডিং কর ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর ছ) বনজ সম্পদের রয়েলটির অংশ বিশেষ জ) সিনো, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পুরক কর

ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিস্কর্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার তর্কৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞা পত্র বা পাট্টাসমূহ সুত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশ বিশেষ ঞ) ব্যবসার উপর কর ট) লটারীর উপর কর ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।'

ইতোপূর্বে ধার্যকৃত আরো ৮টি কর খাতের অতিরিক্ত হলো এই ১২টি কর খাত। এই করের বোঝা স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে বহনযোগ্য নয়। স্থানীয় দৈন্য দশার কথা বিবেচনা করেই বৃটিশ আমল থেকে এতদাঞ্চলীয় পাহাড়ী অধিবাসীদের উপর কোর্ট ফি ও আয়কর বেয়াত প্রচলিত। উনবিংশ শতাব্দীতে ধার্যকৃত পরিবার প্রতি ৬ টাকা জুম কর পরে আর বৃদ্ধি করা হয়নি, এবং জমির খাজনা প্রথম শ্রেণী একরে তিন টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী দু'টাকা ও তৃতীয় শ্রেণী এক টাকায় মাত্র স্থির আছে। অথচ টাকার মূল্যবান সে হিসাবে হাজার গুণ এবং বাস্তু ভিটা ও পণ্য মূল্য তদ্রুপ বেড়েছে। এ হিসাবে পরিষদগুলোর কর রেইট, টোল ও টেক্স কার্যক্রম হলো অবশ্যই নিপীড়ণ মূলক। জনস্বার্থে এসব পরিত্যজ্য।

২৩.

(তাং-শুক্রবার ১০ পৌষ ১৪০৬ বাংলা ২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

'খন্ড গ-পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ।'

জনসংহতি সমিতি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী ত্যাগ করে, তাদের দাবী নামার প্রথম দফায় আঞ্চলিক পরিষদ মঞ্জুরের দাবী প্রতিস্থাপন করে। যথা ঃ

'দাবী নং-১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করিয়া

'ক) পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করা।

খ) আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।

গ) এই আঞ্চলিক পরিষদ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইবে এবং ইহার একটি কার্যনির্বাহী কাউন্সিল থাকিবে।

ঘ) আঞ্চলিক পরিষদে অর্পিত বিষয়াদির উপর এই পরিষদ সংশ্লিষ্ট আইনের অধীন বিধি প্রবিধান উপবিধি আদেশ নোটিশ প্রণয়ন জারি ও কার্যকর করিবার ক্ষমতার

অধিকারী হইবে।'

এই দাবী নামায় অভিমত ব্যক্ত হয়েছে যে, এটি পূরণে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন আছে। জনসংহতি সমিতির এই উপলব্ধি হলো যথার্থ। অথচ সংবিধান সংশোধন এড়াবার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়নি। যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আছে, তা মাত্র মৌখিক একটি অঞ্চল, রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ইউনিট নয়, এবং রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ইউনিট না হওয়ার কারণে এতদাঞ্চল নিয়ে কোন জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কর্তৃপক্ষ গঠিত হতেও পারে না। এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কোন কার্যকর কর্তৃপক্ষ হয়নি। সংবিধান অনুযায়ী জনপ্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্র হলো জাতীয় পরিষদ এবং অধঃস্তন ক্ষেত্রে স্থানীয় শাসনাধীন পরিষদ সমূহ। জাতীয় পরিষদ আর স্থানীয় শাসন পরিষদের বাহিরে অপর কোন রূপ পরিষদ স্থাপনযোগ্য নয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-৫৯ অনুযায়ী প্রশাসনিক ইউনিটের ভিত্তিতে জন প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় শাসন পরিষদ স্থাপিত হতে পারবে যথা ঃ

'তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ স্থানীয় শাসন। অনুচ্ছেদ নং ৫৯ (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।'

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের বেলায় এই সাংবিধানিক শর্ত পূরণ হয় না। কারণ পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বর্তমানে কোন প্রশাসনিক একাংশ নয়। এটি না জেলা, না বিভাগ, না অন্য কিছু। অতএব পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কোন প্রতিনিধীত্ব মূলক কর্তৃপক্ষই নয়। এ নামের একটি অসাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। এর আদেশ নিষেধ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় ক্ষমতা পালন যোগ্য নয়। এই শূণ্যতা জানা সত্ত্বেও জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ এই ভুল ও ফাঁকিতে নিপতিত হয়েছেন। এই ভুল ও ফাঁকির সংশোধন হলো তিন পার্বত্য জেলাকে হয় পুনরায় এক জেলায় পরিণত করা অথবা তিন জেলাকে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামীয় একটি বিভাগ সংগঠন। কিন্তু এই শূণ্যতা পূরণে কেউ সোচ্চার নন। সুতরাং প্রশাসনিক সংস্থানের অভাবে একদা আঞ্চলিক পরিষদের উবে যাওয়াই সম্ভব। প্রশাসনিক ইউনিটের ভিত্তি ছাড়া তার অস্তিত্ব ব্যয়বীয় থাকতে বাধ্য।
এই দাহ্য পরিস্থিতিতে ৩৬টি ক্ষমতা তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে এবং আঞ্চলিক পরিষদ সে সব তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের ক্ষমতা নিয়ে এখন একটি মাতবর প্রতিষ্ঠান। এহলো ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। সাংবিধানিক স্থিতি হীনতার কারণে এ সর্দারীটা আইনতঃ প্রয়োগ যোগ্য নয়।
এখানে আরো উল্লেখ্য যে, জনসংহতি সমিতির দাবী ৩৬টি বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ হলেও, সরকার মূলখাত ও উপখাত সহ ১০২টি ক্ষমতা হস্তান্তরের তালিকা স্থির করেছেন, যার বর্ণনা জেলা পরিষদ আইনের প্রথম তফসিলে নিহিত আছে। এটা

হলো চাওয়ার চেয়ে অধিক দানের উদার উদাহরণ।

এখন জনসংহতি সমিতির আপত্তি হলো ঃ চুক্তি বাস্তবায়নে ধীরগতি ও ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি। এটা চুক্তি বানচালের ষড়যন্ত্র বলেই তাদের ধারণা।

কিন্তু এর জবাব হলো ঃ জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ পদ্ধতি সাংগঠনিকভাবে নতুন ও জটিল। তার বাস্তবায়ন ধীরগতিক হওয়াই স্বাভাবিক। এটা অনিচ্ছাকৃত। এর মধ্যে ষড়যন্ত্র আবিষ্কার অবাঞ্ছিত। ধৈর্য্য ও পারস্পরিক আস্থা অক্ষুণ্ন রাখা ছাড়া, এই পদ্ধতি গড়ে উঠবে না। এও ভাবতে হবে যে, পদ্ধতিটির মূলে জাতীয় বিরোধিতা ও প্রচুর আইনগত গলদ আছে, যা কাটানো আবশ্যক ও সময় স্বাপেক্ষ। এখানে দ্রষ্টব্য, জেলা পরিষদের জন্য দাবীকৃত ও মঞ্জুরকৃত ক্ষমতার তুলনামূলক তালিতা, যথা ঃ

দাবীকৃত ক্ষমতা তফসিল

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা।
২. জেলা পরিষদ, পৌরসভা ইউনিয়ন পরিষদ
৩. পুলিশ
৪. ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
৫. কৃষি উদ্যান ও উন্নয়ন
৬. কলেজ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা
৭. বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
৮. জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা
৯. আইন ও বিচার
১০. পশু সম্পদ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ
১১. ভূমি ক্রয় বিক্রয় ও বন্দোবস্ত
১২. ব্যবসা বাণিজ্য
১৩. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প
১৪. রাস্তাঘাট ও যাতায়াত ব্যবস্থা
১৫. পর্যটন
১৬. মৎস্য, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ
১৭. যোগাযোগ ও পরিবহন
১৮. ভূমি রাজস্ব আবগারী শুল্ক ও অন্যান্য কর
১৯. পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ
২০. হাটবাজার ও মেলা
২১. সমবায়
২২. সমাজ কল্যাণ
২৩. অর্থ
২৪. সংস্কৃতি তথ্য ও পরিসংখ্যান

২৫. যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া
২৬. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা
২৭. মহাজনী কারবার ও ব্যবসা
২৮. সরাইখানা, ডাক বাংলা, বিশ্রামাগার খেলার মাঠ ইত্যাদি
২৯. মদ চোলাই, উৎপাদন ও ক্রয় বিক্রয় ও সরবরাহ
৩০. গোরস্থান ও শ্মশান
৩১. দাতব্য প্রতিষ্ঠান, আশ্রম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়
৩২. জল সম্পদ ও সেচ ব্যবস্থা
৩৩. জুম চাষ ও জুম চাষীদের পুনর্বাসন
৩৪. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
৩৫. কারাগার
৩৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত অন্যান্য কম গুরুত্বপুর্ণ বিষয়

মঞ্জুরকৃত ক্ষমতা তপসিল

১. জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন
২. পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভম্যান্ট ট্রাস্ট
৩ পুলিশ (স্থানীয়)
৪. ভূমি ও ভুমি ব্যবস্থাপনা
৫. কৃষি উন্নয়ন
৬. বৃত্তিমূলক শিক্ষা , মাতৃভাষায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা
৭. বেসরকারী বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ
৮. স্বাস্থ্য
৯. উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার
১০. পশু পালন
১১. ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা
১২. স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান
১৩. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন
১৪. বেসরকারী জনপথ কালভার্ট ও ব্রীজ
১৫. স্থানীয় পর্যটন
১৬. মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন
১৭. যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি সাধন
১৮. ভূমি ও দালান কোটার উপর হোল্ডিং কর ও স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করা
১৯. পানি নিষ্কাশন ও সরবরাহ
২০. গ্রাম্য বিপনী স্থাপন ও সংরক্ষণ
২১. সমবায় উন্নয়ন
২২. সমাজ কল্যাণ
২৩ . অর্থ সংস্থান

২৪. সংস্কৃতি
২৫. যুব কল্যাণ
২৬. জন্ম মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান
২৭. মহাজানী কারবার
২৮. সরাইখানা ডাক বাংলা, বিশ্রামাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ
২৯. ভিক্ষাবৃত্তি পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন ও কিশোর অপরাধ দমন
৩০. জুম চাষ
৩১. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
৩৩. কারাগার
৩৪. বাজার ফান্ড স্থানীয় এলাকা ও উহার অধিবাসীদের ধর্মীয় নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনের পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ

এখানে উল্লেখ্য যে, জনসংহতি সমিতির দাবীভুক্ত বিষয় হলো ৩৬টি, এর বিপরীতে সরকার মঞ্জুর করেছেন ৩৪টি, যার খাত উপখাত হলো ১০২টি। এদতসত্বেও জনসংহতি সমিতির আপত্তি হলো সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি করছেন। এই বিষয় খাত ছাড়াও, রাজনৈতিক অঙ্গিকার ঃ স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা নবায়ন, ও মৌখিক অঙ্গিকার ঃ বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালীদের প্রত্যাহার, পালিত হচ্ছে না। সমিতি সাংবিধানিক ও ঐতিহাসিক জটিলতা আর জাতীয় আকাঙ্খাকে মোটেও বিবেচনা করতে রাজি নয়। এমতাবস্থায় উপজাতীয় আকাঙ্খার অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন।
২৪

(তাং-সোমবার ২০ পৌষ ১৪০৬ বাংলা ৩ জানুয়ারী ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

'দফা নং-গ-১। পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরাকর পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ ইং সনের ১৯,২০ ও ২১ আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।'

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন মাত্র মৌখিক অঞ্চল, কোন প্রশাসনিক ইউনিট নয়। ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দু হলো প্রশাসনিক ইউনিট, যেটি ছাড়া কোন এখতিয়ার বা কর্তৃত্বই কার্যকর ও স্থিতিশীল হয় না। প্রশাসন আর প্রতিনিধিত্ব উভয় ক্ষেত্রেই এই শর্ত মান্য। বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৫৯ জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক কর্তৃপক্ষ গঠন ও ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমূদয় স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের উপর এই শর্ত পালন অত্যাবশ্যক করে দিয়েছে। সুতরাং সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা

ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন বলে, আঞ্চলিক পরিষদ গঠন সম্ভব হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি প্রশাসনিক ইউনিটে পরিণত না করা পর্যন্ত, এর এখতিয়ার ক্ষেত্র হবে শূণ্য। এমতাবস্থায় তিন পার্বত্য জেলা কর্তৃপক্ষ আর পরিষদগুলো প্রশাসনিক ইউনিট থেকে মুক্ত আঞ্চলিক পরিষদের কর্তৃত্বকে অমান্য করতে পারবে। প্রশাসনিক আইন ও বিন্যাস অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ স্বীকার্য্য কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নয়।

আঞ্চলিক পরিষদ গঠন নিয়ে আরো ফেকড়া হলো ঃ চুক্তিতে আছে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে। অথচ স্থানীয় সরকার পরিষদ এখন বিলুপ্ত। তদস্থলে গঠিত হয়েছে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ। এই স্থানীয় সরকার পরিষদ বা জেলা পরিষদের সমন্বয়ে, বর্তমান আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়নি। এর চেয়ারম্যান ও সদস্যরা জেলা পরিষদ সমুহের কেউ নন। সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে আঞ্চলিক পরিষদ। এটি সরকার মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত সংগঠন। তিন জেলা পরিষদের সমন্বয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন মানে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের ক্ষমতা লাভ নয়। এখানে চুক্তির সংশ্লিষ্ট দফাটি লঙ্ঘন করে, তিন জেলা পরিষদের বাহির থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছে। অথচ এ ব্যবস্থা চুক্তি বা আঞ্চলিক পরিষদ আইনের কোথাও নেই। তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের কথা চুক্তিতে থাকলেও, আঞ্চলিক পরিষদ আইনে ভিন্ন কথা ব্যক্ত আছে, যথা ঃ

'ধারা নং ৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপন। (১) এই আইন বলবত হইবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব এই আইনের বিধান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ নামে একটি পরিষদ স্থাপিত হইবে।'

দেখা যায় চুক্তি ও আইনে বিস্তর গরমিল বিদ্যমান। আইনে বিলুপ্ত, স্থানীয় সরকার পরিষদ বা রূপান্তরিত জেলা পরিষদের সমন্বয়ের কোন উল্লেখ নেই। তদুপরি চুক্তিতে উল্লেখিত স্থানীয় সরকার পরিষদ হলো বিলুপ্ত প্রতিষ্ঠান। তাতে জেলা পরিষদ উল্লেখিত নেই, এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো একটি মৌখিক বায়বীয় অঞ্চল যা বাস্তবে কোন প্রশাসনিক ইউনিটও নয়। সুতরাং আঞ্চলিক পরিষদের স্থিতি শূণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি বাস্তবে একটি সান্ত্বনা মূলক অবাস্তব সংগঠন যার কোন ভিত্তি ভূমি নেই।

'দফা নং-গ-২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন। যাহার পদ মর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।'
এখানে স্থানীয় সরকার পরিষদের স্থলে জেলা পরিষদ ব্যবহৃত হয়েছে, যা পুর্বোক্ত

দফার সাথে স্ববিরোধী। ধারা গ/১ মতে সমন্বয়ের পরিবতে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় উত্তরণ আরেক স্ববিরোধিতা। তাই সমন্বয় না নির্বাচন কোনটা গ্রহণীয়? এই আইনে সমন্বয়ের কথাটি অনুপস্থিত। অথচ এই যোগ বিয়োগের কোন ব্যাখ্যা নেই। পরোক্ষ নির্বাচন, আর অন্তর্বর্তী নিযুক্তি ব্যবস্থা ও সাংবিধানিক নয়।
আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা একজন প্রতিমন্ত্রীর সমান, তবে তিনি মন্ত্রী নন। এটা ও সাত্বনামূলক ব্যবস্থা। গাড়ী বাড়ি বেতনভাতা, ভিআইপি মর্যাদা ভিন্ন, বাস্তবে তিনি এক নিধিরাম সর্দার। এ পদ উপজাতীয় বিদ্রোহী নেতার জন্য সংরক্ষিত। এটা বিদ্রোহের উপহার বা পুরস্কার। স্থানীয় বাঙ্গালীদের কারো পক্ষে এ পদ ও মর্যাদা নিষিদ্ধ। এটি আরেক বর্নাশ্রম। এই বৈষম্য সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ। তবে কর্তাদের ইচ্ছাই কীর্তনীয়। এই অবহেলার অর্থ হলো বাঙ্গালীদের চ্যালেঞ্জের ফাঁক ফোকর বজায় রাখা। যাতে একদা এই বাড়াবাড়ির দায় থেকে বাঁচা যায়।

নড়বড়ে পার্বত্য চুক্তি আর পরিষদীয় বিধি বিধানের পক্ষে সাংবিধানিক সমন্বয় ও গোরান্টির দাবী খোদ জনসংহতি সমিতি ও পরিত্যাগ করেছে, আর এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, এ জন্য তারা ও নির্দোষ নন। মনে হয়, তারাও চাইছিলেন নির্বাসন ও বিদ্রোহ থেকে একটি সম্মাজনক প্রত্যাবর্তন। যে জন্য তাদেরকে নমনীয় হতে হয়েছে। এরূপ মুখ রক্ষার জন্য চুক্তিতে কিছু সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যাতে জুমিয়া জনসাধারণ সাফল্যের সাত্বনা ও প্রবোধ লাভ করতে পারে। চুক্তির শেষ মেশ ভবিষ্যৎ যা হবার হোক, আপাততঃ এটাই সাত্বনার বিষয় যে, জনসংহতি সমিতি খালি হাতে আত্মসমর্পণ করেনি, এটাই বুঝা যায়।
২৫.

(তাং-মঙ্গলবার ২১ পৌষ ১৪০৬ বাংলা/৪ জানুয়ারী ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

'দফা নং -গ৩। চেয়ারম্যানসহ আঞ্চলিক পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন। পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ
চেয়ারম্যান ১ জন
সদস্য উপজাতীয় পুরুষ ১২ জন
সদস্য উপজাতীয় মহিলা ২ জন
সদস্য অউপজাতীয় পুরুষ ৬ জন
সদস্য অউপজাতীয় মহিলা ১ জন

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে ৩ জন মারমা উপজাতি হইতে ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে ১ জন মুরং ও তঞ্চঙ্গ্যা

উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই বোম পাংখো খুমি চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে। অউপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্য হইতে, প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।'

সিদ্ধান্ত হলো ঃ মোট ২২ জন সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ হবেন উপজাতীয়। সে হিসাবে তাদের সংখ্যা হয় ১৫ জন এবং অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অ-উপজাতীয় যাদের সংখ্যা হয় ৭ জন।

এই সংখ্যা ভাগ বিস্ময়কর। এটা উপজাতীয় আর অউপজাতীয় জনসংখ্যার সাথে সঙ্গতিশীল নয়। এখানে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শাসক শ্রেণীতে পরিণত করা হয়েছে, আর অউপজাতীয়দের করা হয়েছে নিম্ন শ্রেণীভুক্ত অধীন, অধিকার বঞ্চিত, বৈষম্যের শিকার, শাসিত লোক। এটি গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক সমানাধিকারের পরিপন্থী। উপজাতিদের জন্য চেয়ারম্যানের পদ সংরক্ষণ আরেক পক্ষপাতমূলক জঘন্য অন্যায়। তদুপরি অউপজাতীয় অর্থ পরিষ্কার বাঙ্গালী নয়। বাঙ্গালী স্বার্থ এখানেও লঙ্গিত। বাঙ্গালী ও উপজাতি বহির্ভূত অনেক স্থানীয় অধিবাসী, অউপজাতি সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত, যাদের অস্বীকার করা যাবে না। এর অর্থ হলো বাঙ্গালীদের জন্য চেয়ারম্যান পদ নিষিদ্ধ। তারা সংখ্যানুপাতিক সদস্য পদ ও পাবে না। সার্বোপতি উপজাতি বহির্ভূত অবাঙ্গালী স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য অউপজাতীয় কোটাভুক্ত আসনও ছাড়তে হবে। কারণ অউপজাতি মানে ১০০% বাঙ্গালী নয়।

চুক্তি ও আইনে এখানেও ফারাক বিদ্যমান। উপজাতীয়ভুক্ত ১টি আসনে মুরুং জনগোষ্ঠীকে তঞ্চঙ্গ্যাদের সাথে শরিক দেখান হয়েছে। অথচ আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ধারা নং ৫ (৩-ঘ) তে মুরং নয় ম্রো নাম অন্তর্ভুক্ত আছে। আগে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ও জেলা পরিষদ আইনে মুরুংরা ব্রেকেট ভুক্ত ছিলো, এখন তা বিলুপ্ত। অথচ ১৯৯১ সালের আদম শুমারীর হিসাবে ম্রোদের সংখ্যা হলো ১২৬ আর মুরুদের সংখ্যা ২২১৭৮ জন। এটা অবিচার ও চুক্তি বদলের আরেক নমুনা।

উপজাতীয় আসনে চাকমাদের প্রাধান্য আরেক বিসদৃশ ব্যাপার। ৭টি তাদের দলখিভুত। ম্রোদের সাথে ১টি আসনে তঞ্চঙ্গ্যাদের টাই। সুতরাং এটিও যোগ হলে ৮টি আসনই তাদের দখলাধীন হয়। অবশিষ্ট উপজাতীয়রা তাতে সংখ্যানুপাতিক প্রাপ্য আসন পায় নি। লোক সংখ্যানুপাতে চাকমাদের প্রাপ্য আসন সংখ্যা হলো ৫ এবং তঞ্চঙ্গ্যাদের সাথে ১টিতে টাই। চেয়ারম্যান পদটিও বাস্তবে চাকমাতে অন্তর্ভুক্ত । উপজাতি আর অউপজাতীয় জনসংখ্যার অনুপাত (আদম শুমারী ১৯৯১ খ্রীঃ)। নিম্ন রূপঃ

ক) উপজাতীয় মোট	৪৮১৯১৭ জন =৪৯.৩২%
১। চাকমা	২৩৯৪১৭ জন
২। মারমা '	১৪২৩৩৪ জন
৩। ত্রিপুরা	৬১১২৯ জন
৪। তঞ্চঙ্গ্যা	২২০৪১ চন
৫। বোম	৬৯৭৮ জন
৬। চাক	২০০০ জন
৭। খুমি	১২৪১ জন
৮। খিয়াং	১৯৫০ জন
৯। লুসাই	৬৬২ জন
১০। ম্রো	১২৬ জন
১১। পাংখো	৩২২৭ জন
১২। উসাই	৭৬২ জন
খ) অউপজাতীয় মোট (বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীসহ)	৪৯৪৯৬৭
	৫০.৬৮%
১। মুরুং	২২১৭৮ জন
২। অন্যান্য অবাঙ্গালী	৬৮৮ জন
৩। বাঙ্গালী	৪৭২১০১ জন
মোট জনসংখ্যা	৯৭৬৮৮৪ জন ১০০%

এই জনসংখ্যার অনুপাতে মোট আসন সংখ্যার প্রায় ৫০/৫০ উপজাতি আর অউপজাতিদের ভাগে পড়ে। গণতান্ত্রিত নিয়মেও বটে, সংখ্যানুপাতিক আসন ভাগ সঙ্গত। এবং চেয়ারম্যান পদটিও অবাধ প্রতিযোগিতামূলক রাখাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এখানে গণতন্ত্রকে অমান্য করা হয়েছে। এটি স্বৈরাচার। এর বিরোধিতা অবশ্যই ন্যায় সঙ্গত।

উপজাতি নামে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য প্রাপ্য। এর পক্ষে কোন যুক্তি নেই।

পশ্চাদপদতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে অন্য পশ্চাদপদদের ভাগ্য ও অধিকারকে জিম্মি করা অনুচিত? জাতীয়ভাবে সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দিলেই পশ্চাদপদতা কেটে যাবে। প্রদেয় সুযোগ-সুবিধার পক্ষে সময় ও মাত্রা গত নির্দেশ থাকা ও দরকার। এটা অনির্দিষ্ট দীর্ঘস্থায়ী আর মাত্রাতিরিক্ত হলে তাতে বৈষম্য সৃষ্টি হবে। বাঙ্গালীরা উপজাতীয় প্রাপ্য অংশ গ্রাস করছে না বলেই তাদের অধিকার হ্রাস করা সঠিক নয়। যদি বিজাতীয় শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিকার লক্ষ্য হয়ে থাকে, তা হলে সে আনুমানিক দোষে দোষী কি একা পার্বত্য বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী? যদি অভিযোগটি রাজনৈতিক হয়ে থাকে, তাহলে তাতেও পার্বত্য বাঙ্গালীদের দায়ভার বহন ন্যায্য নয়? তাদের প্রতি এটি অবিচার। এর পক্ষে ও বিক্ষোভ বিদ্রোহ ঘটা যুক্তিসঙ্গত।

২৬.

(তাং-বৃহস্পতিবার ৩০ পৌষ ১৪০৬ বাংলা ১৩ জানুয়ারী ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

'দফা নং-গ-৪। পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন)টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এর এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অউপজাতীয় হইবে।'

আগেই সমালোচিত হয়েছে যে, সংখ্যানুপাতে অ-উপজাতীয় আসন, মহিলা ও পুরুষ নির্বিশেষে ৫০ঃ৫০ প্রাপ্য। এর বিপরীতে পক্ষপাতিত্ব ও বৈষম্য, একাধারে গণতন্ত্র ও জাতীয় সংবিধান বিরোধী। এখানে উপজাতীয় প্রাধান্যকে প্রশ্রয় দান একটি অযৌক্তিক ব্যবস্থা।

'দফা নং-গ-৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদে সদস্য পদ প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।'

এখানে এই বিভ্রান্তির অবকাশ আছে যে, আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা কি-২২, না ২৫। চুক্তির দফা নং খন্ড গ-৩ এ বলা হয়েছে পরিষদ ২২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। পুনরায় এই দফা নং-গ ৫-এ বলা হচ্ছেঃ তিন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানেরা পদাধিকার বলে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হবেন এবং তাদের ভোটাধিকারও থাকবে। এই ধারা নং গ ৫ অনুসারে তিন জেলা চেয়ারম্যানসহ সদস্য সংখ্যা হয় ২৫। কিন্তু এখানে ফেকড়া হচ্ছে ঃ অ-উপজাতি বা বাঙ্গালীরা মোট ২৫ সদস্যের ১/৩ অংশ সদস্য পদ পাচ্ছে না। তাদের সদস্য পদ ৭-এ সীমাবদ্ধ থাকছে, যা ২৫-এর ১/৩ অংশের কম। তদুপরি উপজাতীয় সাম্প্রদায়িক সদস্য কোটাও ঠিক থাকছে না। কারণ চেয়ারম্যানদের দ্বারা সাম্প্রদাযিক কোটায় হ্রাস বৃদ্ধি যোগ বিয়োগ হচ্ছে। পরোক্ষ নির্বাচন ও পদাধিকার ব্যবস্থাও সংবিধান সম্মত নয়।

'দফা নং-গ-৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিল করণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

পরিষদ আইনের ৪১ ধারার বিধান অনুসারে (পরিষদ) বাতিল না হইলে, পরিষদের মেয়াদ হইবে, উহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও, নির্বাচিত নতুন পরিষদ প্রথম অধিবেশনে না বসা পর্যন্ত, পরিষদ কার্য চালাইয়া যাইবে।' (ধারা নং-১২)

এখন আশংকার কথা হলো ঃ ৫ বছরের মেয়াদকাল পালিত হওয়া সন্দেহজনক। স্থানীয় সরকার পরিষদ ভোট কারচুপি করে ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে এক যুগ পার করেও জেলা পরিষদ রূপে নতুন করে মনোনীত হয়ে চলমান। এখনো তার নির্বাচনের কোন লক্ষণ নেই। এখন আঞ্চলিক পরিষদ মনোনয়নের ভিত্তিতে অন্তরবর্তীকালের জন্য গঠিত হয়েছে। তারও নির্বাচন জেলা পরিষদের উপর নির্ভরশীল। তাই তার ও নবায়ন অনিশ্চিত। তাহলে আইন ও মেয়াদ তো প্রহসন।

এই নির্বাচনের পথে প্রথম বাধা হলো ঃ নির্দেশিত স্থানীয় স্থায়ী ভোটার তালিকার অনুপস্থিতি, যা ভূমি বিরোধ ও স্থানীয় অস্থানীয় নিরূপণের উপর নির্ভরশীল। তবে তার এই শুভংঙ্ক করের ফাঁক দীর্ঘস্থায়ী হলে, কখন নির্বাচন হবে তা বলা মুশকিল। আইনী বিধান হলোঃ প্রতি অর্থ বছর শুরু হবার পূর্বে পরিষদ উক্ত বছরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী বা বাজেট বিধি মতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করবে এবং তার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করবে। (ধারা নং-৩৫ (১)। কিন্তু এই পরিষদের বৈধ ভিত্তি নেই। এর আয়ুষ্কাল দীর্ঘয়ায়িত হচ্ছে এবং তার কার্যক্রম অবৈধ হলেও অবারিত চলছে। নিয়ম পদ্ধতির অনুসরণের দায়বদ্ধতা কি করে পালিত হবে?
দেখা যাচ্ছে ঃ পরিষদ বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদনের ব্যাপারে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত। এ ব্যাপারে সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো পরিষদের অর্থ তহবিলে সরকারী দান অনুদান, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহিত অর্থ এবং কর রেইট, শুল্ক ইত্যাদির দ্বারা কি পরিষদের দায়হীন সম্পদ? আইনী ভাবে পরিষদ স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কি না। এ প্রশ্নগুলোর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আবশ্যক। না হলে তো পরিষদগুলো যথেচ্ছাচারী প্রতিষ্ঠান।

আইন করা হয়েছে ঃ যদি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর সরকার এরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ (ক) নিজ দায়িত্ব পালনে অসমর্থ, অথবা ক্রমাগতভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ (খ) প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে সমর্থ নয় (গ) সাধারণতঃ এমন কাজ করে যা জনস্বার্থ বিরোধী, (ঘ) অন্য কোনভাবে ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে বা করছে, তা হলে সরকার গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা পরিষদকে বাতিল করতে পারবে। (বিধান নং-৪২)

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে পরিষদকে তার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হবে (ধারা ৪১ (১)। এই একশন পদ্ধতি ধীরগতিক ও দুর্বল। বিদ্রোহের সময় এ দীঢ়গতিক ব্যবস্থা কার্যকরা হবে কঠিন। পরিষদে কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত আইন হলো ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সব শূণ্য পদে নিয়োগে পার্বত্য জেলা সমুহের উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। (ধারা নং-২৯ (১)।

এই অগ্রাধিকার মানে কি ১০০% না তার কিছু কম? অ-উপজাতীয় বা বাঙ্গালীরা তার পরিমান জেনে আশ্বস্ত হতে চায়। এই অগ্রাধিকারের ঠেলায় এখন পরিস্থিতি এমন যে, কার্যক্ষেত্রে কেবল উচ্ছিষ্ট ও নিম্নতম পদ ছাড়া সর্বত্রই উপজাতীয় নিযুক্তি প্রায় একচেটিয়া। যেখানে কোন উপজাতীয় প্রার্থী নেই, বা যে পদ তাদের দ্বারা অবহেলিত, কেবল ঐ সব কতিপয় পদেই অ-উপজাতীয়রা প্রার্থী ও নিযুক্ত হতে পারে এবং তাও কদাচিং। অথচ সংখ্যানুপাতে তাদের প্রাপ্য ৫০%।

বাংলাদেশ সংবিধানে এই বৈষম্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ আছে, যথা ঃঅনুচ্ছেদ নং ১৯, ২৭ ও ২৯।
২৭.

(তাং-শুক্রবার ১ মাঘ ১৪০৬ বাংলা ১৪ জানুয়ারী ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

'দফা নং-গ-৭। পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।'
উপজাতীয় অগ্রাধিকার মানে যে ১০০% উপজাতীয় তার অন্যতম প্রমাণ হলো ঃ বর্তমানে আঞ্চলিক পরিষদে নিযুক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, দ্বিতীয় নির্বাহী কর্মকর্তা এবং চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, এই তিন পদাধিকারীদের সবাই হলেন উপজাতীয়। একজন অ-উপজাতীয় কর্মকর্তার সংস্থান ও তাতে নেই। এতে দৃষ্টিকটু পক্ষপাতিত্ব আর অবিচার তো রয়েছেই, অধিকন্তু উচু মান সম্পন্ন দাপ্তরিক কাজ থেকেও পরিষদ বঞ্চিত হয়েছেও হচ্ছে। উপজাতীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শিক্ষাগত মান নিঃসন্দেহে নিম্নমানের। তারা জাতীয়ভাবে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ মেধাবী লোক নন। তাদের শিক্ষা, যোগ্যতা, ও নিযুক্তি, কোটার সুযোগে প্রাপ্ত নিম্নমান সম্পন্ন। জাতীয়ভাবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাদের মেধা গঠিত নয়। তাইতো তাদের কারো কারো লিখিত পরিষদীয় কার্য বিবরণীতে চেয়ারম্যানকে সম্মান দেখাতে পরিষদ শব্দের আগে মাননীয় পদের ব্যবহার করতে দেখা যায়। এই তো উপজাতীয় যোগ্যতার মাপকাঠি।

যুগ্ম সজিব সমতূল্য মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ আর চেযারম্যানের প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা নির্ধারণই বলে দেয়ঃ আঞ্চলিক পরিষদের মান জেলার উপরে অবস্থিত। কিন্তু এই আঞ্চলিক মানটি পরিষ্কার নয়। জেলা নয় বিভাগ নয় প্রদেশ বা রাজ্য নয়। এটি তিন পার্বত্য জেলায় বিভক্ত, বাস্তবে মৌখিক পার্বত্য চট্টগ্রাম যার কোন প্রশাসনিক ও বিন্যাসগত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। একজন যুগ্ম সচিব ও প্রতিমন্ত্রীর পরিচালনাধীর্ন রাজ্য মানের আবহ তাতে বিদ্যমান, যা বাস্তবে মরীচিকা বিশেষ।

'দফা নং-গ-৮ (ক)। যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূণ্য হয়, তাহা হইলে

অন্তরবর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।'

এখানেও অ-উজাতীয় বা বাঙ্গালীরা অস্পৃশ্য। এটা সাম্প্রদায়িকতা ও বর্নবাদ। সভ্য আইন ও আদর্শে এটা পরিত্যজ্য। তদুপরি এই শূণ্যতা পূরণ ব্যবস্থায় ও উপনির্বাচন পরিহার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি শূণ্য সদস্য পদ পূরণকে সঠিকভাবেই উপ নির্বাচনের সম্মুখীন করা হয়েছে। যথা ঃ '(খ) পরিষদের কোন সদস্য পদ যদি কোন কারণে শূণ্য হয় তবে উপনির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।' এভাবে চেয়ারম্যান পদের শূণ্যতা পূরণে উপ-নির্বাচনই যথার্থ হতো। একজন সদস্যের চেয়ারম্যান পদে উত্তরণ ঘটলে, তার পরিত্যক্ত সদস্য পদে উপ-নির্বাচন যেভাবে জরুরী হয়ে পড়ে, সেভাবেই শূণ্য চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচন দেয়া ছিলো সঙ্গত। এরূপ বাছাই ও পরোক্ষ নির্বাচন অসাংবিধানিকও বটে।

তবে জেলা পরিষদ আইনের ধারা নং ১৬ তে ভিন্ন ব্যবস্থার কথা ব্যক্ত হয়েছে যথা ঃ 'অস্থায়ী চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূণ্য হইলে বা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা হেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নতুন নির্বাচিত চেয়ারম্যান তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থক না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সদস্যগণ উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে একজনকে অস্থায়ী চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত করিবেন এবং এইরূপ নির্বাচিত সদস্য চেয়ারম্যান রূপে কার্য করিবেন।'

অন্যতায় চেয়ারম্যান পদ স্থায়ীভাবে শূণ্য ঘোষিত হলে, উপনির্বাচনই বিদেয়, যথা ঃ 'ধারা ১৭। উপ নির্বাচন। পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার একশত আশি দিন পূর্বে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূণ্য হইলে পদটির শূণ্য হইবার অথবা ক্ষেত্র মত ধারা ১৫ (২) এর অধীনে পদটি শূণ্য হইয়াছে মর্মে জেলা জজ কর্তৃক অভিমত প্রদানের ষাট দিনের মধ্যে বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত উপ নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত শূণ্য পদ পূরণ করিতে হইবে এবং যিনি উক্ত পদে নির্বাচিত হইবেন, তিনি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।'

বস্তুতঃ এটাই অন্তর্বর্তীকালিন ব্যবস্থা হতে পারে। সুতরাং চুক্তিভুক্ত ব্যবস্থাটি ক্রটিপুর্ণ এবং অনুরূপ আরো অনেক ক্রটিই তাতে আছে। এই সব ক্ষেত্রে চুক্তি ও আইন পরস্পর বিরোধী। এবং সংবিধান ও এর অনুকুল নয়।

'দফা নং-গ-৯ (ক)। পরিষদ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে

কিংবা কোনরূপ অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।'
আগেই বলা হয়েছে ঃ তিন পার্বত্য জেলার সম্মিলিত কোন প্রশাসনিক ইউনিটের নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়। সুতরাং এ নামের আঞ্চলিক পরিষদ কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রূপে আইনতঃ মান্যও নয়। এহেতু তার তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় তিন জেলা পরিষদের পক্ষে উপক্ষেনীয়। যেহেতু আঞ্চলিক পরিষদের অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব কেবল কাগজে পত্রে সীমাবদ্ধ বিষয়। সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত না কোন প্রশাসনিক ইউনিট নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে, ততদিন পর্যন্ত তা হবে বাস্তবে উপেক্ষনীয় প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ। স্থিতি শূণ্য হলেও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাই এখন তার অস্তিত্বের ভিত্তি। সুতরাং বাস্তবে আঞ্চলিক পরিষদ হলো একটি শূণ্য। তার চেয়ারম্যান ও সদস্যরা হলেন গল্পের নায়ক জন কুইক জট বিশেষ, যারা কেবল শূণ্যে হুংকার ছাড়েন, আর শূণ্যে অস্ত্র চালান।

আঞ্চলিক পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যরা মনে হয়, বুঝেই না বোঝার মহড়া দিচ্ছেন। তারা অবশ্যই জানেন, পরিষদের আইনী ভিত্তি হলো, সংবিধানের স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত আইন, অনুচ্ছেদ নং ৫৯। তাতে পরিষ্কার শর্ত হলো ঃ প্রতিনিধিমূলক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানকে প্রশাসনিক ইউনিট আশ্রয়ী হতে হবে। তাছাড়া ক্ষমতা প্রয়োগযোগ্য হবে না। এই ফাঁক ও ফাঁকি পার্বত্য চুক্তিতে নিহিত এবং তা অতি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। এটা নিঃসন্দেহ যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন প্রশাসনিক ইউনিট নয়। সুতরাং আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতার প্রয়োগ ক্ষেত্র শূণ্য। চুক্তি সম্পাদন কালে বিপুল আপ্যায়ন ও ক্ষমতা পাওয়ার খুশিতে জন সংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দ, ফাঁক ও ফাঁকি অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন, আর এখনো সে ভুল আঁকড়ে আছেন।
২৮

(তাং-রোববার ৩ মাঘ ১৪০৬ বাংলা ১৬ জানুয়ারী ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

ভুলের খেসারত টানা ক্ষতিকর। বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে ভুল স্বীকারের হীনমন্যতা পরিত্যাগ করাই সঙ্গত। কিন্তু জনসংহতি সমিতি ভাংবে তবু মচকাবেনা, এরূপ একরোখা মনোভাবে পরিচালিত বলেই মনে হয়। আমরা এটা বুঝতে অপারগ যে, কেন দীর্ঘদিনেও নিজেদের ক্ষমতার শূণ্য ভিত্তি সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দ ওয়াকেবহাল হতে পারছেন না। এজন্য সংবিধান বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রযোজন নেই। দরকার নেই রাষ্ট্রনীতিক হওয়ার। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১ ও ৫৯ এর মর্মবাণী অত্যন্ত সোজা।

মনে হয় জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ২৮ (৪) কে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তাতে অনগ্রসর বলে কেবল পার্বত্য উপজাতীয়রাই যে

চিরকালের জন্য গণ্য হবেন তা অবশ্যই নয়। এবং বিশেষ বিধান লাভের সুযোগের অর্থ সংবিধান লঙ্ঘণ ও নয়। মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিধানাবলী, অনুচ্ছেদ নং ২৬ (১) (২) বলে অলঙ্ঘনীয়। এই বিধানাবলীর সাথে অসমঞ্জস আইন প্রণয়ন ও নিষিদ্ধ। ১৪২ অনুচ্ছেদে ব্যক্ত, সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনেও তা সম্ভব নয়। সুতরাং জনসংহতি সমিতির ভরসার ক্ষেত্র অত্যন্ত দুর্বল।

উপরোক্ত মূল্যায়নের আলোকে সংশ্লিষ্ট দফার নিম্নোক্ত উপদফাগুলোতে ব্যক্ত ক্ষমতাবলী অর্জনটাও দুরাশা মাত্র, যথা ঃ

(খ) এই পরিষদ পৌরসভা সহ স্থানীয় পরিষদ সমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

(গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

(ঘ) পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

(ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।

(চ) পরিষদ ভারি শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

এই ক্ষমতার বহর অবশ্যই উল্লাসের বিষয়। কিন্তু আসলে যে পরিষদ তলাহীন ঝুড়ি, যার কোন ধারণ ক্ষমতা নেই। সর্বাগ্রে তার তলা লাগান দরকার। পাবর্ত্য চট্টগ্রাম কোন প্রশাসনিক অঞ্চলে পরিণত হলেই তবে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র অর্জিত হবে, নইলে সবই ঢাক ঢোল পিটান সার। লোক দেখানো বৈঠক, যতায়াত, হম্বি তম্বি, আর আদর আপ্যায়নেই শেষ হবে সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান। এই মাতবরীতে আঞ্চলিক পষিদ খুশি হলে বলার কিছুই নেই। গাড়ি বাড়ি, বেতন ভাতা মাতবরী, আদর আপ্যায়ন আর ভি আইপির মর্যাদা, এ পাওনা কম কিসে! এ সন্তুষ্টি যথেস্ট নয়। এখানে একটি প্রশ্ন উথাপন যোগ্য যে, পরিষদ হলো একটি স্থানীয় স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, এবং মূলতঃ সাধারণ শাসন ও আইন-শৃঙ্খলা কেন্দ্রাধীন বিষয়। এ হিসাবে কোন স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রাধীন বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপের ক্ষমতা প্রাপ্য নয়। এই দুই খাতে আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতার প্রাচুর্য্য দাবী নিতান্তই বাগাড়ম্বর । স্থানীয় পরিষদ আসলে কেন্দ্রাধীন প্রতিষ্ঠান। তার হাতে সাধারণ প্রশাসন আর আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা দান মানে প্রশাসন ও পুলিশকে তার অধীন ন্যস্ত করা। তাতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় হস্তান্তর ঘটে এবং প্রশাসনের আঞ্চলিক বিন্যাস অকার্যকর হয়ে যায়। সংবিধানের ধারা নং ১ এই রূপ জিম্মি করণের বিরোধী। এককেন্দ্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র হলো মূলতঃ একক কেন্দ্রীয় শাসনাধীন দেশ। তার এই প্রশাসনিক ক্ষমতায় দ্বিতীয় কোন ভাগিদার হয় না। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা, ক্ষমতার বিভাজন নয়, কেন্দ্রীয় ক্ষমতা পরিচালনায় যোগানদারী বা এজেন্সী। একে কর্তায় পরিণত করার কোন সুযোগ

নেই। তাকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মোসাহেবিতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। মৌলিক ক্ষমতাক্রম হিসাবে প্রশাসনের অধস্তন হলো স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা। প্রশাসনের উপর এর প্রাধান্য ও মাতবরী প্রাপ্য নয়। আইন ও শৃঙ্খলা হলো প্রশাসনেরই আওতাধীন বিষয়। এটা এটা পরিষদীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে পারে না। নইলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বিভাজিত হয়ে, আপনাতেই আঞ্চলিক ক্ষুদ্র সরকারের উদ্ভব ঘটবে, এবং রাষ্ট্রের এককেন্দ্রিকতা ক্ষুণ্ন হবে । আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও ব্যবস্থা ছাড়াই দেশ হয়ে পড়বে একাধিক আঞ্চলিক রাজ্যের সমষ্টি। এমন বিশৃংখল অবস্থা কাম্য হতে পারে না।

যদি আঞ্চলিকভাবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের পক্ষে জাতীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তখন বাংলাদেশকে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বৈধভাবেই ফেডারেল ষ্টেট বা যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করা যেতে পারে। এর বাহিরে অসাংবিধানিকভাবে, ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারা অনুষ্টিত হলে, দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে, এবং একের অনুসরণে অন্যরাও ক্ষমতার ভাগাভাগিতে উৎসাহিত হবে।

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিশৃঙ্খলাই কাম্য। তবে অখন্ডতাবাদীদের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে হবে। যদি জনসংহি সমিতির বিচ্ছিন্নতা কাম্য না হয় এবং এক শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল বাংলাদেশই তাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে তাদের বিশুদ্ধ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বা যুক্তরাষ্ট্র এ দুয়ের যে কোন একটি পদ্ধতির প্রতি সমর্থন দিতে হবে। দেশবাসীর জন্য তা হবে উৎসাহজনক। সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে উপজাতীয় ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নয়, সার্বজনীন জাতীয় রাজনীতিটাই বাঞ্ছিত। উপজাতি আর বাঙ্গালী বিভাজন, পার্বত্য রাজনীতিকে কলুষিত করছে।

২৯.

(তাং-রোববার ১০ বৈশাখ ১৪০৭বাংলা ২৩ এপ্রিল ২০০০ খ্রীঃ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

'দফা নং-গ/১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।'
যদি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব কোন এমপি বা মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হয় তখন উন্নয়ন বোর্ডের উপর আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের প্রাধান্য প্রাপ্য হবে না। বর্তমানে এমপি পদাধিকারী চেয়ারম্যানের বর্ধিত মর্যাদার গুণেই উন্নয়ন বোর্ড আঞ্চলিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। অনুরূপভাবে বিশেষ পরিস্থিতির কারণে আঞ্চলিক পরিষদ ও উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বা মন্ত্রী বাহাদুরের উপর অর্পিত হলে আপত্তি করার কিছুই থাকবে না। অন্যান্য প্রধান পদের মত উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদটিও সবার জন্য অবাধ হওয়া উচিত। তবে এই পদটি উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত হয়নি।

এখানেও বাঙ্গালীরা বর্নাশ্রমে আক্রান্ত। বিষয়টা হলো উপজাতীয় অগ্রাধিকার নামে বাঙ্গালী নিয়োগে অনিহা। এটা একটি বিনম্র ফাঁকি। এই অগ্রাধিকার নিষেধাজ্ঞায় পর্যবসিত। এই পদে বাঙ্গালী নিয়োগ করা হবে না, তথা সরকার তা থেকে বিরত থাকবেন এই সম্ভাবনাই বেশি।

দফা নং-গ/১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে, ১৯৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়, তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসঙ্গতি, আইনের মাধ্যমে দুর করা হইবে।'

যে গুরুতর অসঙ্গতি দেশ ও জাতির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক সেটি হলো পৃথক আইন, সর্দারী প্রথা ও স্বতন্ত্র প্রশাসনিক মর্যাদা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতীয়দের এমন এক শক্তি দান করেছে, যার সাথে উপজাতীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতা যুক্ত হয়ে, আঞ্চলিক স্বাধীকারের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পোষণ করার শেষ পরিণতি হবে, একদা এতদাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা জোরদার হওয়া । আলোচ্য অগ্রাধিকার ব্যবস্থায় সে সম্ভাবনাকে প্রকট করা হলো।

এখানে বাংলাদেশ সংবিধানের বিপরীতে, ঔপনিবেসিক পার্বত্য শাসন আইন বহাল রাখার অর্থ, আইনতঃ এতদাঞ্চলকে বিশেষ মর্যদা সম্পন্ন উপনিবেশ করেই রাখা ও ভাবতে দেয়া যে, বাংলাদেশের ভিতর এটি বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন অঞ্চল। তদুপরি তৃতীয় আইনরূপে স্থানীয় সরকার পরিষদ বা পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও চতুর্থতঃ আঞ্চলিক পরিষদ আইন, এতদাঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষ মর্যাদার পক্ষে সীলমোহর বিশেষ। এভাবে বাংলাদেশ এতদাঞ্চলের জন্য বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে উপজাতীয়দের একা অপরাধী করা যায় না। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতিগত সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবীতে বাংলা ভারত ও পাকিস্তান বিভক্ত হয়েছে। এই একই পথ ধরে সাবেক যুগোশ্লাভিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আয়ারল্যান্ড খন্ডিত বিভক্ত রাষ্ট্র। পূর্ব তিমুর হলো তার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। চেচনিয়াও এই একই পথে ধাবমান। এসবের কোথাও সেনা শক্তি বলে ঐক্য আর অখন্ডতা বজায় রাখা যায়নি। দেখা যায় ঃ স্থানীয় রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খার প্রতি মানবাধিকারের যুক্তিতে দুনিয়াবাসী সোচ্চার। বৃহৎ শক্তিগুলো জাতিগত নির্মূলকরণ ও নির্যাতন ও স্বাধিকার লঙ্ঘণ সমর্থন করে না। তারা রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার চেয়ে মানবাধিকার ও জাতিগত আশা-আঙ্খাকে অধিক মূল্যদান করে। ঐ তাদেরই চাপের মুখে শ্লাভ জাতি গোষ্ঠীকে বসনিয়া প্রশ্নে দমে যেতে হয়েছে। ইন্দোনেশিয়াকে পূর্বতিমুর ছেড়ে আসতে হয়েছে। শেষ মেশ রাশিয়াকে ও চেচনিয়া ছাড়তে হতে পারে। পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশ সে পথে নিজেই এগুচ্ছে বলে মনে হয়। নতুবা সে স্বতন্ত্র অগ্রাধিকার আইনে এতদাঞ্চলের শাসন চালিয়ে যেতো না। এবং

স্থানীয়ভাবে অতি দ্রুত বাঙ্গালী সংখ্যাগরিষ্ঠতা গড়ে তুলতো। এখন এ সব কাজ করা ও পিছু হটা অত্যন্ত কঠিন।

দেশের অখন্ডতা রক্ষার একমাত্র উপায়ঃ সর্বত্র একক সাংবিধানিক আইন জারি, স্বীয় জন শক্তি বৃদ্ধি, বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক ক্ষমতার চর্চা, সংবিধানিক শাসন প্রবর্তন স্থানীয় রাজনৈতিক আকাঙ্খা পূরণ এবং দেশকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে পুনগর্ঠন। আঞ্চলিক পরিষদ আইন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল বাস্তবে দেশের এককেন্দ্রিকতাকে, এমন কি অখন্ডতাকে ও হুমকির সম্মুখীন করে দিয়েছে। সংবিধান ও স্বতন্ত্র আইনের অসঙ্গতি ও বহু আইনের অসামঞ্জস্যতা তুচ্ছ নয়। আঞ্চলিক পরিষদকে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষে পরিণত করাটাও অত্যন্ত অপরিনামদর্শী কাজ।

মুখে দেশপ্রেম ও দেশের অখন্ডতা রক্ষায় জান কুরবান করা অর্থহীন। শিক্ষিত রাজনীতিজ্ঞ না হলে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সঠিক হতে পারে না। দেশ ও জাতির কথা চিন্তা না করে, পার্বত্য অঞ্চলের জন্য যে সমাধান দেয়া হয়েছে, তা উপজাতীয় রাজনীতির লক্ষ্য ছিলো না। তাদের প্রথম দাবীনামায় প্রদেশ ভিত্তিক গণতান্ত্রিক স্বাত্তশাসনের দাবী ছিলো। দ্বিতীয় সংশোধিত দাবী নামায় সংবিধান সংশোধনসহ গণতান্ত্রিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাওয়া হয়েছে, এবং এ আন্দোলনটি যে কোনক্রমেই বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়, দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তৎপরিবর্তে উপহার দিয়েছেন অঘোষিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, এবং উপজাতীয় অগ্রাধিকার। দাবী নামায় সরকার ছিলো প্রতিপক্ষ পরবর্তীতে বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালীরা ক্ষতি ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে এখন উপজাতিদের আঞ্চলিক আত্ম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন সহজ, এবং তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ কঠিন। বৃহৎ শক্তিগুলো তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে, এ আশংকা আছে।

৩০

(তাং-বৃহস্পতিবার ১৪ বৈশাখ ১৪০৭ বাংলা ২৭ এপ্রিল ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

'দফা নং-গ/১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের দায়িত্ব দিতে পারিবেন।'

ছাড় ও তোষামোদের এটি চরম উদাহরণ। এর লক্ষ্য জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দের মন জয় হলেও, ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বরের চুক্তি স্বাক্ষর অভিজ্ঞতা হলো ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা লাভ সত্ত্বেও, এ নেতৃবৃন্দ মোটেও কৃতজ্ঞ বা সন্তুষ্ট নন। তাদের বিদ্রোহ আর অসন্তোষ এখন গলাবাজিতে রূপান্তিরিত হয়েছে। পুনরায় অস্ত্রের ভাষা ব্যবহার সম্ভবত আসন্ন। এখনো তারা স্বজাতীয় বিরোধী নির্মূলে অস্ত্রবাজি চাঁদাবাজি

ছিনতাই ও সন্ত্রাস চালু রেখেছে।

নির্বাচন ছাড়া ক্ষমতা দান হলো একটি বড় নমনীয়তা ও ছাড়। তদুপরি অন্তর্বর্তীকালের কোন সীমা সরহদ বা মিয়াদ কাল নেই। এরূপ মিয়াদ কালহীনতাকে অন্তর্বতীকাল বলা যায় না। এটি হলো লাহামহীন ঐচ্ছিক কাল। এর মধ্যে নির্বাচন হওয়া অনিশ্চিত। নির্বাচন হলেই কি আর না হলেই বা কী? ভোটারহীন নির্বাচন হয়েই আছে। চেয়ারম্যান ও দুই তৃতীয়াংশ সদস্য পদ উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত। পরোক্ষ নির্বাচনের অর্থ হলো সংরক্ষিত পদে প্রার্থীদের মনোনীত করা। এটা অবাধ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন নয়। নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা। দুনিয়ার কোথাও এরূপ গণতন্ত্রের নজির নেই। সুতরাং এটা হলো ইচ্ছা খুশির ক্ষমতা চর্চা বা স্বৈরতন্ত্র। বাংলাদেশ সংবিধানে এরূপ কোন বিধান নেই।

বাংলাদেশ সরকারের ক্ষমতা পাঁচ বছর পর পর যায় আসে। এই দেশের ৮৮% লোক বাঙ্গালী মুসলমান। কিন্তু জনপ্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে তাদের জন্য আইনতঃ কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থা নেই। এ ক্ষেত্রে অবাধ সাংবিধানিক গণতন্ত্রই পালনীয়। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চল তার ব্যতিক্রম। এখানে অন্তরবর্তী ক্ষমতার নামে নির্বাচনমুক্ত মনোনয়নভিত্তিক মেয়াদহীন ক্ষমতা ভোগ প্রচলিত। সেই ১৯৯৮ সালে অন্তরবর্তী সময়ের জন্য বিনা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হয়ে আঞ্চলিক পরিষদে সন্তু বাবুরা কায়েমী গদি দখল করে রেখেছেন। মূল মুরব্বি সরকার নির্বাচন মোকাবেলা করছে। অথচ তার সৃষ্ট পিচ্চি সরকার নির্বাচনী দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত। আঞ্চলিক নির্বাচন হবে এ ঘোষণা দিলেও আঞ্চলিক পরিষদ স্থানীয় বাঙ্গালী বাসিন্দাদের ভোটারকরণ অবাদে প্রত্যাখ্যান করছে। খোদ সরকারই তাদের মাথায় চড়িয়েছেন। এখন নামাতে চাইলে চুল ছিড়বে। বাড়াবাড়ি করলেও সন্তু বাবুদের ব্যাপারে সরকার এ যাবৎ নিশ্চুপ। ব্যাপারটি গোলমেলে। জনসংহতি সমিতিকে ক্ষেপালে যেন নতুন অঘটন ঘটার ভয় আছে, তাই সরকার ধীরে সুস্থে তাদের বশ করার আশা রাখেন। বিরোধী অভিমত হলোঃ সরকার সন্তু বাবুদের প্রতি নতজানু।

কিছু উদার অভিমত হলো ঃ সরকার তোষামোদ ও নমনীয়তায় সামলে উঠতে চান। তাদের ধারণা এতে ইতোমধ্যে সুফল ফলেছে। বর্তমানে সংগঠিত বিদ্রোহ নেই। বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনা চাঁদাবাজি ও ছিনতাই অতীত অরাজকতারই অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট। মূল সংগঠন জনসংহতি সমিতিকে ধৈর্য্যের সাথে বশে আনার আশা পূরণ সময় সাপেক্ষ।

দফা নং-গ/১৩। সরকার পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যানের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের

প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে, পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।'

এটা অবশ্যই নতজানু হওয়ার পরাকষ্ঠা। স্থানীয় সংসদ সদস্যরাই আইন-কানুন প্রণয়ন বা রহিতকরণ উদ্যোগের পক্ষে যথোপযুক্ত ব্যক্তি। স্থানীয় কল্যাণ অকল্যাণ, আর্থিক রাজনৈতিক চাহিদা, উন্নয়নের ব্যয় বরাদ্দ, আর আইনী চাহিদার পক্ষে জাতীয় সংসদে তারাই প্রতিনিধিত্ব করেন। এখানে তাদের মর্যাদাকে খাটো করা হয়েছে। স্থানীয় দাবী দাওয়া পেশ করা রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়। আঞ্চলিক পরিষদের সে অধিকার অক্ষুণ্ন থাকা অবস্থায়, পার্লামেন্টারী কাজে জনসংহতি সমিতির নাক গলানোর অধিকার দান, সংসদীয় অধিকারের প্রতি হস্তক্ষেপের শামিল। আঞ্চলিক পরিষদ যতই শক্তিশালী ও গুরুত্বপুর্ণ হোক না কেন, এটি মর্যাদায় অবশ্যই জাতীয় সংসদের অধঃস্তন সংস্থা, এবং সংসদ সদস্যরাও মর্যাদায় আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের অনেক বড়। এমতাবস্থায় আইন প্রণয়ন ও রহিত করণ প্রশ্নে আঞ্চলিক পরিষদকে বারগেইনিং ক্ষমতা দান, অবশ্যই বাড়াবাড়ি।

আইন প্রণয়ন ও রহিত করনের ব্যাপারে সংসদ সার্বভৌম। এই ক্ষমতা অলঙ্গনীয়। সরকার নিজ ক্ষমতাবলে আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষে অনুরূপ র্কাক্রম গ্রহণের ক্ষমতা রাখেন। তাও আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশের ভিত্তিতে হতে পারবে। তা আঞ্চলিক পরিষদের দ্বারা সরাসরি হওয়া আপত্তি কর।

'দফা নং-গ/১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠিত হইবে ঃ

ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা।

গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান।

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা।

চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ।

ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।'

আঞ্চলিক পরিষদ হলো আয় উৎপাদনহীন এক মাথাভারি প্রতিষ্ঠান। অনেক খাই খাই প্রতিষ্ঠানের সাথে এটিও যুক্ত হয়ে গরীব দেশের ব্যয় বাহুল্যকে আরেকটু বাড়াচ্ছে। এই সাথে বেড়ে গেলো কর্তৃত্বের ঠেলা। মুলতঃ বর্ণিত উৎসগুলো থেকে প্রাপ্ত কোটি কোটি টাকা কেবল বেতন-ভাতা, গাড়ি-বাড়ি, তেল, বিনোদন, যাতায়াত, অফিস পরিচালনা ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল খাতেই ব্যয় হচ্ছে এবং হবে। তার কানাকড়ি ও উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ হচ্ছে না বা হবে না। প্রশাসনিক কাজেও এটি প্রয়োজনীয় নয়, বাড়তি সংযোজন। কেবল মাত্র কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পুনর্বাসন তদ্বারা সাধিত হচ্ছে। এই রাজনৈতিক পরিপোষণ একটি

অপ্রয়োজনীয় জাতীয় দায়। এ ধারা জাতীয়ভাবে সংক্রমিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তখন এটি হয়ে দাঁড়াবে অবহনযোগ্য দায় বাহুল্য। কেবল ছটা বরদারী করে জাতীয় তহবিলের একাংশকে হজম করা হলো এর কাজ। হুমকি ধমকি পরামর্শ আর বাধা দানই এই মাথাভারি প্রতিষ্ঠানের কাজ। এরই উদাহরণ হলো পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ, প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগে জেলা পরিষদকে বার বার বাধা দিচ্ছে। মফস্বলের ক্লিনিকগুলোতে ডাক্তার নিয়োগে ফেকড়া ধরছে। আভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু শরণার্থী পুর্নবাসনে বাঙ্গালী প্রশ্নে আপত্তি জানাচ্ছে। জেলা প্রশাসকদের দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলছে ইত্যাদি।

৩১

(তাং-শুক্রবার ১৫ বৈশাখ ১৪০৭ বাংলা ২৮ এপ্রিল ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

'দফা নং-ঘ। পূনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী।
পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন ঃ

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে, সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ৯ মার্চ ১৯৯৭ ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐ চুক্তি অনুযায়ী ২৮ মার্চ ৯৭ ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগীতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীন উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।'

এই দফায় বর্ণিত শরণার্থী প্রত্যাবর্তন ও তাদের পুনর্বাসন বিষয়টি সম্পন্ন হয়েছে। এদের কারো কারো জায়গা জমি সংক্রান্ত কিছু বিরোধ অবশিষ্ট আছে, যা হয় তাদের নিজেদেরই সৃষ্ট, অথবা তা খাস জমির ভোগ দখলজাত। সার্ভে বা ভূমি কমিশনের সিদ্ধান্তই তার মীমাংসার উপায় রূপে ভাবা হচ্ছে। তবে প্রশাসনিক ভাবেও তা করা সম্ভব।

অনেক উপজাতীয় লোক অভাব অসুবিধায় বাধ্য হয়ে প্রতিবেশী বাঙ্গালীদের কাছে সাদা কাগজে বায়নামা করে নগদ টাকার বিনিময়ে জমি বিক্রি করেছে। এতদাঞ্চলীয় বিধি হলো ঃ জমি খরিদ বিক্রি ও হস্তান্তর জেলা প্রশাসকদের অনুমতি সাপেক্ষ। এই প্রক্রিয়ায় কবালা রেজিষ্ট্রেশন ও নাম জারি করা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। অথচ প্রয়োজন হলো তাৎক্ষণিক লেনদেনের। সুতরাং খরিদ্দারও বিক্রেতার আপোষ সমঝোতার

ভিত্তিতে, সাদা বায়নামার মাধ্যমে বেসরকারীভাবে লেনদেন খরিদ বিক্রি ও জমি হস্তান্তর তাৎক্ষণিক হয়ে থাকে। এই অননুমোদিত প্রক্রিয়ার কারণে অনেক বিক্রেতা বা তার উত্তরাধিকারী অনেক সময় খরিদ বিক্রি ও লেনদেনের কথা অস্বীকার করেন এবং আইন তার পক্ষেই থাকে। এমতাবস্থায় খরিদ্দারকে হয়রানীর সম্মুখীন হতে হয়। তখন খরিদ্দারের পক্ষেই শক্ত সাক্ষী সাবুদ ও প্রমাণাদি দীর্ঘ সূত্রী প্রক্রিয়াদি প্রয়োজন হয়, এবং তাকে তা নিয়ে দেওয়ানী মামলা লড়তে হয়। এই জটিলতা স্থানীয় আইনে আরোপিত দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি।

'দফা নং-ঘ/২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীন উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পূনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি জরিপ কাজ, এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করত ঃ, উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া, তাহাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমি অধিকার নিশ্চিত করিবেন।'

দফা-ঘ/১-এ জুমলা শব্দে আভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু সংজ্ঞাটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে উপজাতীয় ও বাঙ্গালী উভয় সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত। তবে দফা নং ঘ-২-এ উপজাতীয় উদ্বাস্তুরাই শুধু নির্দিস্ট হয়েছে। এ নিয়ে বিরোধ এখন তুঙ্গে। সাবেক টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার এমপি-র বক্তব্য হলো ঃ আভ্যন্তরীন উদ্বাস্তুতে বাঙ্গালীরা অন্তর্ভুক্ত। এই সিদ্ধান্ত বাস্তব ও মানবিক ও বটে। কিন্তু জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ ফেকড়া ধরছেন ঃ দফা নং-ঘ ২-তে আভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু হিসাবে কেবল উপজাতীয় লোকদের নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দফা নং-ঘ ১ এ বাঙ্গালীদের কথা নির্দিষ্ট নেই।

বাস্তবে এ হলো উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কাজটিকে অকার্যকর করে রাখার প্রতিপক্ষীয় কুট কৌশল। পুনর্বাসন ব্যয় সরকারই যোগাবে। তাতে বাঙ্গালী উপজাতি নির্বিশেষে প্রত্যেক ভুক্তভোগী উপকৃত হলে কারো কোন ক্ষতি নেই। শান্তিবাহিনীর আক্রমণ ও সাম্প্রদায়িক হানাহানি থেকে লোকজনকে দূরে ও নিয়ন্ত্রণে রাখতেই গুচ্ছ গ্রাম ও শান্তি গ্রাম ইত্যাদিতে তাদের একত্রিত ও পাহারাধীন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। অনেক লোক স্বেচ্ছায় স্বনির্বাচিত নিরাপদ জায়গায় বসত গড়েছিলো। কার্যতঃ এদের সবাই ছিলো বাড়ী-ঘর ত্যাগী উদ্বাস্তু। এই উদ্বাস্তু উপজাতিদের সংখ্যা নির্দিষ্ট না হলেও, টাস্কফোর্স সুত্রের মতে বাঙ্গালীদের সংখ্যা ছিলো রেশন কার্ডধারী ২৬ হাজার পরিবার ও কার্ডহীন আরো সাড়ে বার হাজার পরিবার। এদের জনসংখ্যা প্রায় দুই লাখ। এটা একটি বিবেচনাযোগ্য মানবিক প্রশ্ন। বাঙ্গালী হওয়া কোন অপরাধ নয়। চুক্তিতে বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালীরা অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়নি। খোদ পার্বত্য চুক্তি স্বীয় ভূমিকাংশে সার্বজনীন কল্যাণের নিশ্চয়তা দিয়েছে। এমতাবস্থায় বাঙ্গালী উদ্বাস্তু পূনর্বাসনের বিরোধিতা করা মানে স্রেফ হিংসা। অথচ বাঙ্গালী রাষ্ট্রই বর্ণিত

হিংসাবাদীদের পরম উদারতায় পালন পোষণ করছে। এই সাম্প্রদায়িক হিংসা, রাজনীতির পুঁজি হওয়া দূর্ভাগ্যজনক।

সুখের কথা ২০ দফা সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন শরণার্থী পূনর্বাসন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আভ্যন্তরীন বাঙ্গালী ও উপাজতি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কাজে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলে, জনসংহতি সমিতির অমানবিক আর হিংসুটে বাধা উবে যেতে বাধ্য।
ভূমি জরিপ কাজ কেন শুরু হচ্ছে না, তার কার্যকারণ বুঝা মুশকিল। জরিপ রেকর্ড ছাড়া ভূমি কমিশন কী ফয়সালা দিবেন? সরকার কি ভাবছেন, জরিপ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপত্তা দিতে পারবেন না? তাহলে পর্বতাঞ্চল কি এখনো বিদ্রোহী কবলিত? এটা শান্তি চুক্তির প্রহসনরূপে মান্য হতে পারে না। চুক্তিতে জনসংহতি সমিতি জরিপ অনুষ্ঠানে অঙ্গিকারাবদ্ধ।

ভূমি কমিশন দুই সার্কেল প্রধানের অবর্তমানে পরিপূর্ণ হতে পারছে না। তবে কমিশন প্রধানের অধীন আনুসঙ্গিক জরিপ কাজ অবশ্যই চালান সম্ভব। কমিশনের জন্য মীমাংসার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে যদি ভূমি জরিপ আগে সম্পন্ন হয়। জরিপ রেকর্ডের ভিত্তিতে বিচার বিভাগীয় ভাবে বিরোধের মীমাংসা পাওয়াটাও সম্ভব হবে। সন্তু বাবুদের মর্জি খুশিকে চাবিকাঠির মত গুরুত্ব দান সরকারের পক্ষে অপমানকর ও দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক।

৩২

(তাং-রোববার ১৭ বৈশাখ ১৪০৭ বাংলা/৩০ এপ্রিল ২০০০ইং/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

'দফা নং-খন্ড-ঘ/৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমি মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবে। যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।'

তিন পার্বত্য জেলা মিলে উপজাতীয় পরিবার সংখ্যা হলো কিঞ্চিদধিক এক লক্ষ। প্রতি পরিবারে দু'একর করে কৃষি জমি বরাদ্দ করা হলে তাদের চাহিদা হয় মোট দু'লক্ষ একর। অথচ কৃষিযোগ্য মোট পতিত জমি আছে মাত্র ৪৫ হাজার একর বা তার কাছাকাছি। সাময়িক পতিত জমির পরিমান ১,০৮,০০০ একর হলেও তা সার্বক্ষণিক চাষ যোগ্য নয়, সুতরাং উপজাতীয় চাহিদা দু'লক্ষ একর তাতে পুরণ হয় না। জমির মালিক উপজাতীয়দের বাদ দিলেও, প্রাপ্তব্য জমি ভূমিহীন উপজাতীয়দের জন্যই অপর্যাপ্ত। বাঙ্গালী বন্দোবস্তি প্রার্থীরা তাতে আরো অধিক বঞ্চিত থেকে যায়। হ্যাঁ, টিলা জমিতে চাহিদা মিটান যাবে এবং তা যথেষ্টই আছে। কিন্তু এখানে বাঙ্গালীদের কথা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখিত হচ্ছে না। এটা পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা। যে

পুরানবস্তিবাসী বাঙ্গালীদের দরদে জনসংহতি সমিতি গদ্গদ, তাদের কথাও এখানে অনুপস্থিত।

'দফা নং-ঘ/৪। জায়গা জমি বিষয়ক বিরোধে নিস্পত্তিকল্পে একজন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি করা ছাড়াও, এ যাবৎ যেই সব জায়গা জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে, সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিল করণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বালিয়া বিবেচিত হইবে।'

একজন বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত ল্যান্ড কমিশনে ঐ বিচারপতির মর্যাদা ও ক্ষমতা কী হবে? তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও অভিমত, কমিশনের অধিকাংশ সদস্য থেকে ভিন্ন হলে, তার পরিণাম কী হবে? কমিশনভুক্ত উপজাতীয় সদস্যরা নিজেদের স্বপক্ষীয় ভিন্ন সিদ্ধান্ত ও অভিমত চাপিয়ে দিতে চাইলে, বিচারপতির অভিমত ও সিদ্ধান্তের কি প্রাধান্য থাকবে? উপজাতীয় কমিশন সদস্যদের অভিমত ভিন্ন হলে কী হবে? যেহেতু বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালীদের বন্দোবস্তির পক্ষে মৌজা হেডম্যান ও সার্কেল প্রধানদের সুপারিশ নেই, সুতরাং সে সবই বেআইনী, এ দাবীর কী হবে? বাঙ্গালীদের পক্ষে কমিশনে কোন সদস্য নেই। এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে কে যুক্তি দেখাবে যে, বন্দোবস্তিতে হেডম্যান বা সার্কেল প্রধানদের সুপারিশ বাধ্যতামূলক নয়। সুতরাং জেলা প্রশাসনের বন্দোবস্তি কার্যক্রম অবৈধ নয়।

দ্বিতীয় জটিল ব্যাপার হলো ঃ খাস রেকর্ডের ভিত্তিতে বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালীদের সরকারীভাবে সরেজমিনে জমির দখল বুঝিয়ে বসান হয়েছে। বহুক্ষেত্রে অনেক জায়গা জমির বন্দোবস্তি প্রক্রিয়া এখনো নিষ্পন্ন হয়নি। অনেক খরিদকৃত জমিরও নাম পরিবর্তন বাকি। এ সবের কী পরিণতি হবে? সরকারী ভূমি দান কার্যক্রম কি করে বেআইনী হয়?
বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন অভিজ্ঞতা হলো ঃ জমি বন্দেবাস্তিতে কোন দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের প্রতিবন্ধকতা নেই। খরিদ বিক্রিও হস্তান্তর কারো অনুমতি সাপেক্ষ নয়। বন্দোবস্তিতে প্রক্রিয়াজাত কিছু সময় লাগলেও, খরিদ বিক্রি ও হস্তান্তর সম্পুর্ণ অবাধ। তৎপর নাম জারির কিছু আনুষ্ঠানিকতা মাত্র প্রয়োজন হয়। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে এ কাজগুলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষীয় প্রতিবন্ধকতা ও অনুমতি সাপেক্ষ বলে, মূল ব্যক্তিদের জীবনকালে প্রায়ই এগুলো সম্পন্ন হয় না। ফলে উত্তরাধিকারীদের হাতে পড়ে এগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে জটিলতায় আবদ্ধ হয়ে যায়। উপজাতীয়দের জমি প্রাপ্তি অনেকটা সহজ হলেও, বাঙ্গালীদের বেলায় অনেক ফেকড়া। উপজাতিরা বিনা বন্দোবস্তিতে জমি ভোগ দখল করতেও পারে। খাস পাহাড়ের মূল্যবান বন ধ্বংস করে জুম চাষেও তাদের বাধা নেই। এসব আইনতঃ নিষিদ্ধ হলেও তাতে

অপরাধ ধরা হয় না। কিন্তু বাঙ্গালীদের পক্ষে এসবই অপরাধ। এই উদারতা বনাম অপরাধ ধরার বৈষম্য উপজাতীয়দের পক্ষে সিদ্ধ ঐতিহ্য তবে ন্যায়-বিচারের দৃষ্টিতে অবশ্যই অনুদার ব্যবস্থা। উপজাতীয়দের জন্য এই প্রথা ঐতিহ্য পালনীয়, তবে আইন সঙ্গত নয়। কিন্তু কমিশনের উপজাতীয় সদস্যরা প্রথা ঐতিহ্য ছাড়া অন্য কিছু মানতে অভ্যস্ত নন। এরা বাঙ্গালী স্বার্থের প্রতিপক্ষ। একজন মাত্র বিচারক তিনি তাদের দ্বারা পদে পদে বাধার সম্মুখীন হবেন। তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে ন্যায় বিচারের স্বার্থে উপজাতীয় সদস্যদের অমান্য করলে, আক্রান্ত বা পরিত্যক্ত হবেন অথবা তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ দানা বেঁধে উঠবে। সুতরাং তার পক্ষে নির্বিঘ্নে দায়িত্ব সম্পাদন দুরুহ হয়ে উঠবে। এমতাবস্থায় নিরপেক্ষ আর অস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়েই কমিশন গঠন হবে যথার্থ। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ তাতে উপদেষ্টার দায়িত্ব পেতে পারেন। অনুরূপভাবে বাঙ্গালীদের পক্ষেও উপদেষ্টা থাকা হবে বিধেয়। তাতে উভয় পক্ষ অন্ততঃ যুক্তি তর্ক খাটাতে পারবেন। নতুবা আপিল সুযোগহীন চূড়ান্ত রোয়েদাদে অবিচার থেকে যাওয়া সম্ভব। সুবিচারের স্বার্থেই দুই প্রতিপক্ষের আইনবিদ নিয়োগ এবং উচ্চতর আদালতে আপিল দায়েরের সুযোগ লাভ, বিচার ব্যবস্থায় স্বীকৃত। এখানে এই সুযোগ না থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলই পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত নির্বাহী আইন। তার কিছু কিছু ধারা প্রত্যাহার ও শিথিল করে স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ বা তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনের সংস্থান করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের সাংবিধানিক আইন, সর্বোচ্চ পালনীয় মূল আইন হলেও, উপরোক্ত তিন স্থানীয় আইনের দ্বারা তা প্রায় অবহেলিত। পর্বতাঞ্চলে কোন জজ কোর্ট নেই। এখানে হাইকোর্টের এখতিয়ারও রহিত ছিলো, যদি না ১৯৬৫ সালে মিঃ আনছারী বনাম পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের মধ্যকার একটি মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট, হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের সংশ্লিষ্ট আইনটিকে অকার্যকর বলে রায় না দিতেন। যেহেতু এখনো এতদাঞ্চলে ঐ আইনের বলে, জেলা প্রশাসকরাই সিভিল কোর্টের বিচারক রূপে মান্য, এবং তাই জেলা জজের নিয়োগ দান বাধাগ্রস্ত, সেহেতু পার্বত্য অঞ্চলের কোন সিভিল প্রশ্নেই বিচারক নিয়োগ, বা এ জাতীয় কমিশন গঠন, হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের দ্বারা বাধাগ্রস্ত। এটাও আইনী প্রশ্ন যে, মূল আইন বাংলাদেশ সংবিধানকে এতদাঞ্চলে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। এ জন্য কোন প্রজ্ঞাপন জরি করাও হয়নি। হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলসহ পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন জারি ও কার্যকর করা মানে তো সংবিধান স্থগিত রাখা নয়। এর মীমাংসা হওয়া জরুরী।

৩৩

(তাং-সোমবার ১৮ বৈশাখ ১৪০৭ বাংলা ১ মে ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

'দফা নং-ঘ/৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লাইয়া গঠন করা হইবে ঃ

ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট), গ) আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার, ঙ) জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)'

দেখা যাচ্ছে ঃ একজন বিচারপতির অধীনে কমিশন গঠিত হলেও, তার ক্ষমতা ও কর্মপদ্ধতিগত নীতিমালা এখনো নির্ধারিত ও ঘোষিত হয় নি। তিন সার্কেল প্রধানদের দুজনের নিযুক্তি নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা অমীমাংসিত আছে, তাই কমিশন গঠন পরিপূর্ণ হচ্ছে না। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান বা প্রতিনিধি, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা প্রতিনিধি এবং সার্কেল প্রধানরা হলেন উপজাতি পক্ষীয় লোক। তাদের ঘোষিত দাবী হলো ঃ বাঙ্গালীরা জমি ও পাহাড় বেআইনীভাবে দখল বন্দোবস্ত গ্রহণ ও তা জবরদস্তি ভোগ দখলাধীন রেখেছে। তা থেকে তাদের উচ্ছেদ করতে হবে। এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তারা কমিশনের গরিষ্ঠ সংখ্যক প্রতিবাদী সদস্য। এরা নিরপেক্ষ নন। তাই কমিশনের সদস্য হওয়ার পক্ষে তারা অযোগ্য। নিরপেক্ষতা গুণ থাকা ছাড়া কারো কমিশনের সদস্য হওয়া আপত্তিকর। তাদের দ্বারা নিরপেক্ষ বিচার অসম্ভব। তাই সাংগঠনিকভাবেই কমিশনের বৃহদাংশ পক্ষপাত দোষে দোষী। এদের অভিমত ও সিদ্ধান্ত ন্যায় ভিত্তিক হবে না। অধিকন্তু চীফেরা মনে করেন, তাদের অনুমোদন ও রিপোর্ট ছাড়া বাঙ্গালীদের জমি জমা দেওয়া হয়েছে যা বেআইনী।

বাদ বাকি দুই সদস্যের একজন হলেন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি এবং অপরজন চট্টগ্রামের কমিশনার বা অতিরিক্ত কমিশনার, তাদের প্রধান বিবেচ্য হবে চাকুরী স্বার্থ ও নিয়োগ কর্তার সন্তুষ্টি। তারা সংগঠিত উপজাতীয় সদস্যদের বিরোধীতাকে অবহেলা করার দুঃসাহন ও ঝুঁকি নিতে দ্বিধান্বিত হবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতীয় মতের বিরোধিতায় তাদের অভিমতের মর্যাদা কী হবে, তাও নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে কমিশনের ভিন্ন মত সম্বলিত রোয়েদাদ বিতর্কিত আর অকার্যকর হবে, তা নিশ্চিত। অবিচারের শিকার হলেও বাঙ্গালীরা আগে ভাগে মারমুখী ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজনৈতিকভাবে প্রশিক্ষিত নয়। বলা যায় কমিশনের সরকারী সদস্যরা তাদের হাতেও নিরাপদ নন। ফলে কমিশনের বিতর্কিত রোয়েদাদ সম্পুর্ণ প্রহসনে পরিণত হবে বলে আশংকা করা যায়।

যদি সরকারের লক্ষ্য হয় একটি পরিচ্ছন্ন ও ন্যায়সঙ্গত রোয়েদাদ, তাহলে কমিশনকে উপজাতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন কমিশনে পরিণত করতে হবে। নতুবা কমিশনে বাঙ্গালী প্রতিনিধি থাকারও প্রয়োজন আছে। না হলে এ সন্দেহ করার অবকাশ থাকবে যে সরকার বাঙ্গালীদের জায়গা জমি কৌশলে বেআইনী ঘোষণা করে, তাদেরকে পর্বতাঞ্চল থেকে তাড়াতে চান, এবং এ জন্যই কমিশনে তাদের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই, তাদের বৈরী পক্ষ উপজাতীয়দের প্রাধান্য বিদ্যমান এবং উচ্চ আদালতে আপিলের অধিকারও রহিত।

'দফা নং-ঘ/৬ (ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বছর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাতে পরামর্শক্রমে উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।
(খ) কমিশন পাবর্ত চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিস্পত্তি করিবেন।'

দেখা যাচ্ছে আঞ্চলিক পরিষদের ইচ্ছা খুশি হলো মূল চাবিকাঠি। ইতোমধ্যে কমিশনের মেয়াদকাল শেষ। এর মধ্যে কোন কার্যক্রমই শুরু করা যায়নি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিচারপতি গত হয়েছেন। তদস্থলে তৃতীয় বিচারপতি কমিশন প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যদি জনসংহতি সমিতি সন্দেহ করেঃ সরকার এই কমিশনের দ্বারা বাঙ্গালীদের জায়গা জমিতে বৈধতার সীলমোহর দিতে আগ্রহী, তা হলে সে তাকে বর্জন করবে। কারণ তারা ইতোমধ্যে অভিযোগ করতে শুরু করেছে যে, সরকার যথাযথভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না। সেটিকে একটি কাগুজে চুক্তিতে পরিণত করেছে। এমতাবস্থায় ভূমি কমিশন অচিরেই ভেস্তে যেতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে ঃ উপজাতীয় পক্ষ, স্থানীয় আইন প্রথা ও রীতি নীতির ভিত্তিতে বাঙ্গালীদের বন্দোবস্তিকে বেআইনী প্রমাণে সচেষ্টা। বর্ণিত দফায় তা-ই কমিশনের বিবেচ্য। উপজাতীয় দাবীর পক্ষে রোয়েদাদ ঘোষিত হবে এই প্রথা ও রীতিনীতির ভিত্তিতেই। এখানে কমিশনেন হাত পা বাঁধা।

পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইন হলো ঃ প্রত্যেক পাহাড়ী লোক, শহর বহির্ভূত অঞ্চলে বিনা বন্দোবস্তিতে তিরিশ শতক জমি তার ভিটা বাড়ির জন্য বন্দোবস্তি ছাড়া ভোগ দখল করতে পারবে। অতিরিক্ত জমির জন্য তাকে বন্দোবস্তি নিতে হবে, তবে বন্দোবস্তি লাভের পূর্বে সে উক্ত জমিতে ভোগ দখল কায়েম করতে পারবে। তদুপরি জুম চাষের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে খাস পছন্দ সই পাহাড়ী জমি অধিকার করার প্রথাগত অধিকারও তার আছে। জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ ও বন্ধকরণ আইন সিদ্ধ হলেও, তা কদাচিৎ ও প্রয়োগ করা হয়নি। ১৮৬৫ সালের বন আইন অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলের গোটাটাই বন। সংরক্ষিত বনে বসতি মান্য নয়। কেবল কর্ণফুলী হ্রদের বাস্তুচ্যুতদের পূনর্বাসনের জন্য কিছু বনাঞ্চল মাত্র উন্মুক্ত করা হয়েছিলো, এবং জেলা প্রশাসকেরা নির্বাহী ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রীয় বনের কিছু কিছু খাস জমি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিতে বন্দোবস্তি দান করেছেন এবং তাতে বসতিও গড়ে উঠেছে, তবু তার পরিমাণ সর্বমোট ৪৪০.০৪ বর্গমাইল মাত্র। এই রেকর্ডের ভিত্তিতে উপজাতীয়দের অবাধ জুম চাষ ও বসতি বিস্তার মূলতঃ বেআইনী কাজ। কিন্তু এ রাষ্ট্রাধিকার উপজাতীয় রীতি নীতি প্রথা ও পদ্ধতিতে ভেসে গেছে। বর্ণিত কাজ গুলো বেআইনী হলেও প্রথা পদ্ধতিতে আবদ্ধ অবাধ করণীয় ।

বিপরীতে বাঙ্গালীরা প্রথা পদ্ধতির সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের প্রতি কঠোরভাবে আইন প্রযোজ্য। জমি বন্দোবস্তি পেতে তার পক্ষে ১৫ বছরের পার্বত্য বসবাসের

প্রমাণ ও সমতলে জায়গা জমি না থাকার সনদ থাকা জরুরী। তার পক্ষে মৌজা হেডম্যান বা সার্কেল প্রধানদের সুপারিশও থাকা আবশ্যক। এই প্রার্থীকে হতে হবে স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা। এই রীতি ঐতিহ্য জেলা প্রশাসকদেরই গড়া। এই রীতি নীতি বাধ্যতামূলক নয় তবে এর ব্যতিক্রম হওয়া বিরল।

৩৫

(তাং-শুক্রবার ২২ বৈশাখ ১৪০৭ বাংলা ৫ মে ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

'দফা নং-ঘ/৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই, সেই ঋন সুদসহ মওকুফ করা হইবে।'

বিদ্যমান পরিস্থিতির শিকার ছিলেন শরণার্থী অশরণার্থী সবাই। তবে শারণার্থীরা তাদের বিদেশ অবস্থান নিয়ে সরকারের সাথে বার্গেনিং করতে পেরেছেন, আর দেশাভ্যন্তরীন ভুক্তভোগীরা তা পারেননি। আসলে পার্বত্য বিদ্রোহের প্রধান শিকার ছিলেন স্থানীয়ভাবে টিকে থাকা ভুক্তভোগীরা। তাদের কায়িক ও আর্থিক দূর্ভোগ ছিলো সীমাহীন। এই বাস্তবতার বিবেচনায় তারাও ঋণ মওকুফ ও আর্থিক পুনর্বাসনের হকদার। তবে এটা সরকারের উপর বিরাট আর্থিক চাপের সৃষ্টি করে বিধায় কেবল শরণার্থীদের ঋণ মওকুপের ব্যাপারটি পৃথকভাবে গুরুত্ব দানই ছিলো বিবেচনার বিষয়। শরনার্থীদের মনোভাব ছিলো সরকারকে ঠেকিয়ে সুবিধা আদায়, এবং তা-ই তারা করেছে। জনসংহতি সমিতিও তাতে তাদের মদদগারের ভূমিকা নিয়েছে। তাইতো জনসংহতি সমিতি তাদের হয়ে দাবীটি চুক্তিভুক্ত করেছে । তবে সরকারের দায়িত্ব ছিলোঃ অন্যান্য ভুক্তভোগীদের কথাও বিবেচনা করা।

'দফা নং-ঘ/৮ । রাবার চাষ ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ

যে সকল অউপজাতীয় ও অস্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লেনটেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিলো তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই, বা জমির সঠিক ব্যবহার করেন নাই, সে সকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।'

যত দোষ নন্দ ঘোষ অস্থানীয় বাঙ্গালীদের। যুগ যুগ ধরে স্থানীয় অবাঙ্গালীরা তাদের জায়গা জমি অনাবাদী রেখে ও বন্দোবস্ত বাতিল হওয়া থেকে মুক্ত থেকে যাচ্ছে। সে স্থলে বাঙ্গালীরা ঐ দোষে দোষী।

সুতরাং এ বিধানটি বৈষম্যমূলক ও বাতিলযোগ্য। বিশেষতঃ এ কারণে যে, বিগত আড়াই দশক কাল যাবৎ পার্বত্য পরিস্থিতি ছিলো বিদ্রোহ কবলিত অশান্ত। তাতে জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা ছিলো না।

'দফা নং-ঘ/৯, ১০ ও ১১। পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ, অধিক সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ, চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার কোটা সংরক্ষণ, বৃত্তি প্রদান, বিদেশ প্রেরণ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ইত্যাদি বিতর্কিত নয়। তবে এসব ব্যাপারেও জাতিগত পক্ষপাতিত্ব ও বৈষম্য আরোপ আপত্তিকর।

দফা নং খন্ড/ঘ-১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলা বারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।'

এটা সন্দেহজনক যে, শান্তিবাহিনীর সদস্য সংখ্যা কি ২ হাজার ও নয়? তাদের প্রদত্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ কি বাস্তবে ছিলো অপ্রতুল? প্রদত্ত অস্ত্রগুলোর অধিকাংশ হলো অকেজো আর পুরাতন। দেখা যায় অধিকাংশ পিচ্চি ছেলে আর কিছু নিষ্কর্মা বৃদ্ধই শান্তিবাহিনীর জনবলের উৎস। এ কারণেই গুজব রটেছে ঃ দক্ষ লড়াকু শান্তিবাহিনী সদস্যদের প্রয়োজনীয় আধুনিক অস্ত্র ও গোলা বারুদ সহ আত্মগোপনে রেখে দেয়া হয়েছে। এই আন্ডার গ্রাউন্ড বাহিনীকে প্রয়োজনে কাজে লাগান হবে। সন্দেহ হয়, এরাই বর্তমানে বিরোধী নির্মূলে সক্রিয়। এছাড়া অস্ত্র ঝনঝনানির উৎস আর কি হতে পারে?

'দফা নং-ঘ/১৩। জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবার বর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব ধরণের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।'

এখানে একথা বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, এই বিদ্রোহ পর্যুদস্ত অঞ্চলে, সাধারণ পুলিশ আনছার ও আইন-শৃংখলা রক্ষায় নিযুক্ত বাহিনী নিরাপত্তা বিধানে কী যথেষ্ট? এখানে চুক্তির পক্ষ বিপক্ষ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী উপজাতীয় সংগঠন পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট ও মারমুখী। তারা সশস্ত্রভাবে পরস্পরের মোকাবেলায় লিপ্ত। বিদেশী বিদ্রোহী ও সন্ত্রাসবাদী কিছু সংগঠন ও এতদাঞ্চলে সক্রিয় আছে। তাই সঠিকভাবে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে হলে, এখানে সর্বত্র সশস্ত্র সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি বজায় রাখা জরুরী, এবং তার কোন মেয়াদ ও বেঁধে দেয়া যায় না। স্বাভাবিক অবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলা সুষ্ঠুভাবে ফিরে আসার পরেই মাত্র, সেনা ক্যাম্প সমূহ প্রত্যাহারের কথা বিবেচ্য। চুক্তির এই দফাটি সেনা ক্যাম্প বজায় রাখাকেই সমর্থন করে। তাছাড়া জনসংহতি সমিতি ও তাদের পারিবারিক সদস্যদের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

'দফা নং-ঘ/১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলা বারুদ জমা দিবেন, সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে, সরকার ঐ সব মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।'

এটি একটি বিরাট উদারতা। খুন, জখম, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, চাঁদাবাজি, মুক্তিপণ

আদায় রাহাজানি, সন্ত্রাস, গণহত্যা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতাযুক্ত চূড়ান্ত অপরাধমূলক অসংখ্য মামলা, এর ফলে সাধারণ ক্ষমার আওতায় মাফ হয়ে যাবে। এর ভিতর রাষ্ট্রীয় মামলা ও ব্যক্তিগত মামলা আছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমার আওতায় ব্যক্তিগত মামলাদি প্রত্যাহৃত হয় কি না, তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। যদি চুক্তি উভয় ধরণের মামলাকে একই শ্রেণীভুক্ত না করে, তা হলে ভাবতে হবে, ব্যক্তিগত মামলাগুলো অবলুপ্ত হয়নি, তার কার্যধারা চালু আছে। তদুপরি প্রশ্ন হলো ঃ যুদ্ধাপরাধের মত কাজ ও গণহত্যা কি ক্ষমাযোগ্য ? চুক্তি কি সরকারী দায় দায়িত্ব ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন? চীফ হুইফ আসলে কি সরকারের পক্ষে চুক্তি সম্পাদনে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি ? বিষয়গুলো সন্দেহজনক।

'দফা নং-ঘ/১৫। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

বিদ্রোহীদের প্রত্যাবর্তন ও অস্ত্র সমর্পন ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে শুরু হয়ে ৫ই মার্চ ১৯৯৮ খ্রীঃ তারিখে শেষ হয়েছে। তৎপর অস্ত্রবাজির অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে ও ঘটে যাচ্ছে। অস্ত্র গোলা বারুদ আর অস্ত্রবাজ ও কম ধরা পড়েনি, যা বিপুল অস্ত্র শস্ত্র আর বহুসংখ্যক অস্ত্রবাজদের গোপন অস্তিত্বের প্রমাণ। উপরোক্ত দফা অনুসারে এই গোপন অস্ত্র ও গোলাবারুদের অনুসন্ধান উদ্ধার ও সন্ত্রাসী পাকড়া ও কাজে সরকারের সক্রিয় হওয়ার এবং তাতে জনসংহতি সমিতির সহযোগী থাকারও কথা। কিন্তু সে তৎপরতা অত্যন্ত শিথিল। এ ব্যাপারে সন্তু বাবুদের আপত্তি হলো ঃ সরকারী মদদে একদল চুক্তি বিরোধী উপজাতীয় সন্ত্রাসী অপরাধ মূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত আছে। একতরফা এই কৈফিয়ৎ কি যথেষ্ট?
৩৫
(তাং-শুক্রবার ২৯ বৈশাখ ১৪০৭ বাংলা ১২ মে ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

'দফা নং-ঘ/১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদের এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থানীয় বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/০০ টাকা প্রদান করা হইবে।

খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে। আত্মসর্পন ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী প্রেরোয়ানা প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি

সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পন ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই, তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পূনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। এই ক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থান মূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।'

বর্ণিত সুবিধাজনক দফাগুলোকে বলা যায় বিদ্রোহের পুরস্কার। প্রতিজন বিদ্রোহীর অস্ত্র জমাদান মূল্য ৫০ হাজার হিসাবে প্রায় নয় কোটি টাকা, শরণার্থী প্রত্যাবর্তন মূলক অনুদান প্রায় আঠারো কোটি টাকা। পুনর্বাসন রেশন দান প্রায় বিশ কোটি টাকা, ব্যাংক ঋণ মওকুফ প্রায় শত কোটি টাকা, চাকুরী ফেরৎ বাবদ বকেয়া পাওনা প্রায় দশ কোটি টাকা। অস্ত্র জমাদান ও প্রত্যাবাসনে নেতাদের রাজি করানোর ভেট প্রায় দশ কোটি টাকা, পরিষদীয় পদ ও সুবিধা দান বাবদ এ যাবৎ প্রদত্ত প্রায় দশ কোটি টাকা ইত্যাদি মিলে এই বিদ্রোহ পুরস্কারের পরিমাণ হয় প্রায় দুশতাধিক কোটি টাকা। বিদ্রোহের এই দায় ও মূল্যমান অত্যন্ত বিরাট।

তবু বিদ্রোহ দমিত হলে, সাত্বনা পাওয়া যেতো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ঃ নেতারা দাবী দাওয়া আর অভিযোগের বহর বাড়িয়ে চলেছেন। বলছেন ঃ সরকার প্রতারণা করছে। শান্তি চুক্তি একটি কাগুজে চুক্তি, তা যথাযথ বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তদুপরি সরকার পক্ষ চুক্তি বিরোধী উপজাতীয়দের সংগঠিত করছেন ও মদদ দিচ্ছেন। বিপরীতে আমাদের কাছে খবর হলো ঃ একদল লড়াকু শান্তিবাহিনী, সশস্ত্রভাবে আত্মগোপন করে আছে। তারাই এখন বিরোধী নির্মূলে সক্রিয়। তারা চাঁদাবাজি,

রাহাজানি, সন্ত্রাস, মুক্তিপণ আদায়, জিম্মিকরণ, গুম খুন, বাজরহাট বাড়ি-ঘর লুটও পোড়ানো ইত্যাদি দুষ্কর্মে লিপ্ত। তাদের প্রতিরোধে নিয়োজিত আছে নিগৃহীত উপজাতীয়রা। আমাদের এ কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র সচিব। তিনি সম্প্রতি দিল্লীতে দু'দেশের স্বরাষ্ট্র সংক্রান্ত বৈঠকে অভিযোগ করেছেন ঃ ত্রিপুরা ও জিরোরামে এখনো একদল শান্তিবাহিনী আত্মগোপন করে আছে। সম্প্রতি তিনি বি বি সিতে এই অভিযোগটির পুনরোল্লেখ করেছেন। এবং তা বাংলাদেশের জাতীয় পত্রিকায় গত ৬ মে ২০০০ তারিখে প্রচারিত হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশ অতি উঁচ্চ মূল্যে বৈরী পোষণ করছে, যারা দমেনি বরং ছোবল দিতে উদ্যত। শান্তি স্থাপনের ইচ্ছা তাদের থাকলে, বৈরী আচরণ ও দুষ্কর্মের সাথে গোপনেও সংশ্রব রাখতো না, এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সাম্প্রদাযিক সম্প্রীতি রচনায় সরকারকে মদদ যোগাতো। এখন আরামে খায় দায় পায় ও নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে, তবে বৈরীতা ঠিকই চালিয়ে যায়।

সম্প্রতি জাতীয় পত্রিকায় প্রচারিত খবর হলো ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে পার্বত্য নেতৃমহলের বৈঠক হবে। আমাদের অনুরোধ ঃ সরকার তাদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ও তার বিপরীতে পরিচালিত বৈরীতার ফিরিস্তি দিয়ে দৃঢ়তার সাথে বলুন ঃ এ সব দুষ্কর্ম ও বিরোধিতা অবিলম্বে বদ্ধ করতে হবে। এ সবের সাথে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার কোন সঙ্গতি নেই। জনসংহতি সমিতি খোদ শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করছে। এটি এক তরফা সরকারের পক্ষে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, উপরন্তু এটি আগাগোড়া সংবিধান ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পরামর্শ হলো ঃ জেলা পরিষদের নির্বাচন দিন। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক নেতৃত্বকে ক্ষমতাসীন করুন, এবং নির্বাচনকে করুন বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক। কোন পদ ও আসন কারো জন্য সংরক্ষিত আর কোটা পদ্ধতি বহাল রাখা, আসলে বৈষম্যমূলক আর অগণতান্ত্রিক। জনগণের ইচ্ছাই হওয়া চাই পদ ও আসন লাভের চাবিকাঠি। এই সাথে আঞ্চলিক পরিষদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভাবা দরকার।

সংরক্ষণ বাদ ও অগ্রাধিকার ব্যবস্থা বঞ্চিতদের মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ, এবং এটা সাম্প্রদাযিকতার জন্মসুত্র ওবটে। বিপরীতে অবাধ গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্ব এবং সম অধিকার দান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবলম্বন, আর সাম্প্রদায়িক পরিবেশ উন্নয়নের সহায়ক। অবাধ গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রার্থীরা আপন পর সকলের মন জয়ে চেষ্টিত হবেন। তাতে ধর্ম জাত পাত সমাজ সম্প্রদায় গত ভেদাভেদ, এবং অসাম্প্রদায়ীকতার চর্চা জোরদার হয়। ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক পরিবেশ রচনার এই ক্ষমতা চর্চা হবে শান্তির সহায়ক। পাবর্ত্য অঞ্চলে এই গণতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তন জরুরী।

(তাং-শুক্রবার ৫ জ্যৈষ্ঠ্য ১৪০৭ বাংলা ১৯ মে ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

'দফা নং-ঘ/১৭। (ক) সরকার পক্ষ ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিডিআর)ও স্থায়ী সেনাবনিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পাবর্ত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশে সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামারিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীন সেনা বাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।'।

বলা যায়, বিদ্রোহী অস্ত্রবাজ শান্তিবাহিনী সদস্যরা এখনো পরিপুর্ণভাবে প্রত্যাবর্তিত ও বিলুপ্ত হয়নি এবং তাদের একাংশ সশস্ত্রভাবে আত্মগোপন করে আছে। ইউপিডিএফ হলো তাদেরই দলছুট লোক। সুতরাং জনসংহতি সমিতি ও তার অস্ত্রবাজদের পুরিপূর্ণভাবে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন এখনো অসম্পুর্ণ আছে। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র সচিবের সম্প্রতি উত্থাপিত অভিযোগই তার প্রমাণ। আমাদের সন্দেহ জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার কিছু নেভৃস্থানীয় শিষ্য গোপন সন্ত্রাসী আস্তানা থেকে, ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা বিদ্রোহী শান্তিবাহিনী সদস্যদের পরিচালনা করছেন। যাদের মূল কলকাঠি সন্তু বাবুর হাতে। তদুপরি এখানকার দৈনন্দিন খবর হলোঃ চুক্তি পক্ষের ও বিপক্ষের দুই উপজাতীয় বাহিনী, সশস্ত্রভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে হানাহানিতে লিপ্ত। এছাড়া চাঁদাবাজি মুক্তিপণ আদায়, জিম্মিকরণ, বাজারহাট বাড়িঘর পোড়ান রাহাজানি ও লুটপাট তো লেগেই আছে। সীমান্তে ও ভিতরে বিদেশী বিদ্রোহীদের আনাগোনা ও বিদ্যমান। এমতাবস্থায় সেনাবাহিনী, আনছার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রত্যাহার বা স্থায়ী নিবাসে তুলে আনার বর্ণিত পরিবেশই নেই। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের থাকা চুক্তির দ্বারা সমর্থিত। বরং আগে জনসংহতি সমিতিকে আন্তরিকতা ও সততার পরিচয় দিয়ে চুক্তি মত, নিজ সশস্ত্র সদস্যদের পরিপূর্ণভাবে সমর্পিত করতে হবে, এবং তারাই এটা নিশ্চিত করবেন যে, আর কোন শান্তিবাহিনী সদস্য কোথাও লোক্কায়িত নেই, এবং যারা অস্ত্রবাজিতে লিপ্ত তারা সংগঠন বহির্ভুত ভিন্ন লোক। এই ঘোষণার পর চুক্তি অনুযায়ী সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে জনসংহতি সমিতি নিজে সহযোগী হয়ে, সরকার ও বাহিনীগুলোকে সদদ দিয়ে যাবে। এই নির্মূল অভিযান সমাপ্ত হওয়ার পরই, সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। ঐ সময় সীমা এখনো উপস্থিত হয়নি। সুতরাং সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের সময়সীমা

নির্ধারণ এখনো সুদুর পরাহত। চুক্তিটাই তাদের থাকার পক্ষে যুক্তি। এতদসত্ত্বেও কিছু ক্যাম্প প্রত্যাহার, সরকারের অতি উৎসাহী সদিচ্ছামূলক কাজ। চুক্তি অনুযায়ী যার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

চুক্তি অনুযায়ী সন্তু বাবুরা এ কথা প্রমাণে বাধ্য যে, শান্তিবাহিনীর সব সদস্য আত্মসমর্পণ করেছে, আর কেউ অবশিষ্ট নেই, এবং বর্তমানে চলমান সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও অন্যান্য দুষ্কর্ম অন্যদের সৃষ্টি। তারপরও সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তি পুনঃস্থাপন না হওয়া পর্যন্ত সেনাসহ সরকারী বাহিনীগুলো প্রত্যাহারে খোদ এই চুক্তিটাই বাধা। সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তি পুনঃস্থাপনের পরই সেনাসহ সরকারী বাহিনী গুলো প্রত্যাহারের সময়কাল উপস্থিত হবে, এ কথাই উপরোক্ত দফার বক্তব্য। সুতরাং এই অভিযোগ নিরর্থক যে, সরকার চুক্তি অনুযায়ী স্বীয় বাহিনী প্রত্যাহার করছে না। বরং পাল্টা অভিযোগ করা যায় যে, জনসংহতি সমিতি স্বীয় লুকিয়ে থাকা শান্তিবাহিনীর মাধ্যমে দখল প্রতিষ্ঠা ও কর্তৃত্ব কায়েমের কুমতলবেই সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবীতে সোচ্চার '
দফা নং ঘ-১৭ (খ) সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনা নিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা জমি, প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।'

এটাও স্ববিরোধী বক্তব্য। পার্বত্য অঞ্চরের জায়গা জমিতে সরকার ও জেলা পরিষদের কার কতটুকু এখতিয়ার এবং নিজ নিজ সীমানাভুক্ত অঞ্চলের পরিমাণ কার কতো তা নির্ধারণ ছাড়াই অবাধ কর্তৃত্বের বাগাড়ম্বর করা অনুচিত। জনসংহতি সমিতি স্বীয় ৫ দফা দাবী নামার ২/৫-ক ও ২/৫-খতে ব্যাখ্যা সুত্রে বর্ণনা করেছে ঃ আসলে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মিলত এখতিয়ারে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, কেবল ৪৪৬ বর্গ মাইল জায়গাই অন্তর্ভুক্ত আছে। বাকি সবই সরকারী ভূমি। আমার হিসাবে, জেলা পরিষদাধীন অঞ্চল ৪৪০.০৪ বর্গমাইল মাত্র, এবং অবশিষ্ট ৪৬৫২.৯৬ বর্গমাইল এলাকা হলো সরকারী। জনসংহতি সমিতি বর্ণিত দাবীনামায় ঐ জায়গা জমি ভাগের ও সীমানা নির্ধারণেরও দাবী করেছে। চুক্তিতেও তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাহলে সীমানা ও এলাকা নির্ধারণ ছাড়া কী করে সিদ্ধান্ত হয় যে ক্যাম্পভুক্ত জায়গা জমি কোন ব্যক্তি মালিকের অথবা জেলা পরিষদের প্রাপ্য ? যদি জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণযোগ্য অঞ্চল পরিমানে ৪৪৬ অথবা ৪৪০.০৪ বর্গমাইলই হবে, তাহলে এই সীমালজ্ঘন করে গোটা পাবর্ত্য চট্টগ্রামে কি করে তা বিস্তৃত হয়? এই বিভ্রান্তির সুরাহা আগে হওয়া দরকার, এবং তার একমাত্র উপায় হলো ঃ জনসংহতি সমিতির দাবী ও চুক্তি অনুযায়ী জরিপের মাধ্যমে ৪৪৬ বা ৪৪০.০৪ বর্গমাইলের পরিষদীয় অঞ্চল চিহ্নিত করে, তিন পার্বত্য জেলার প্রাপ্য অংশ মত ভাগ করে দেয়া। যখন পরিষদই স্থাপিত, এবং আইন বিধি বিধান ও নীতি প্রবর্তিত হয়েছে, তখন প্রাপ্য এলাকা নিয়ন্ত্রণের সাধটিও মিটিয়ে দেয়া উচিত। পরিষ্কার হওয়া ভাল, গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিষদীয় এলাকা নয়। উপরোক্ত (ক) দফায় এটাও পরিষ্কার

যে, সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বাহিনী নিয়োগে সম্পুর্ণ স্বাধীন এবং দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে সে ক্ষমতা অবাধ। এখানে জনসংহতি সমিতিকে উমেদারের মর্যাদায় নামিয়ে আনা হয়েছে। সরকারী বাহিনী নিয়োগ বা প্রত্যাহারে পার্বত্য জেলা পরিষদ আঞ্চলিক পরিষদ ও জনসংহতি সমিতির কোন কর্তৃত্ব থাকা স্বীকার্য্য নয়।

৩৭

(তাং-শনিবার ৬ জ্যৈষ্ঠ্য ১৪০৭ বাংলা ২০ মে ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

'দফা নং-ঘ/১৮। পার্বত্য চট্টগ্রাম সরকারী আধা সরকারী পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।'

দেখা যাচ্ছে, উপজাতীয় অগ্রাধিকার মানে বাস্তবে ১০০% সর্বাধিকার। ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ও উচ্ছিষ্ট ২/১টি পদে বাঙ্গালী নিয়োগ বিরলই বলা যায়। পুরাতন মোসাহেব ২/১ জন বাঙ্গালীর ক্ষেত্রে মাত্র এই ব্যতিক্রমী নিয়োগ নীতি প্রযোজ্য হয়। এরা বা এদের মুরব্বীরা পার্বত্য জনসংহতি সমিতির মোসাহের সংগঠনঃ আদি বাঙ্গালী কল্যাণ পরিষদের সদস্য। সন্তু বাবুর অনুমোদনে আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য হিসেবেও এদের স্থান লাভ ঘটেছে। এ জন্যই আঞ্চলিক পরিষদে সরকার মনোনীত বাঙ্গালী সদস্যদের উপর জনসংহতি সমিতি দীর্ঘদিন আপত্তি দিয়ে নিযুক্তি ঠেকিয়ে রেখেছিলো। এটি একটি বর্নবাদ। উপজাতীয়রা এখানে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত উচ্চবর্নীয় মানুষ এবং বাঙ্গালীরা সমানবাধিকার বঞ্চিত নিম্নবর্ন। এই বৈষম্য আইনের মর্যাদা পেতে পারে না।

প্রেষণে নিয়োগ দানটা বাংলাদেশ ব্যাপ্ত। পার্বত্য বাঙ্গালীরা এখানেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পতিত। শিক্ষাগত যোগ্যতায় ও তারা পিছিয়ে পড়া মানুষ। সুতরাং পার্বত্য বাঙ্গালীরা চতুর্দিকে ব্যাপ্ত বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের শিকার। এই জনগোষ্ঠীর প্রতি এটা এক বিরাট অবিচার। এটা মানবাধিকার লঙ্ঘন।

'দফা নং-ঘ/১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেস্টা কমিটি গঠন করা হইবে।'

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী
২. চেয়ারম্যান /প্রতিনিধি আঞ্চলিক পরিষদ
৩. চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৪. চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ

৫. চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৬. সংসদ সদস্য রাঙ্গামাটি

৭. সংসদ সদস্য খাগড়াছড়ি

৮. সংসদ সদস্য বান্দরবন

৯. চাকমা রাজা

১০. বোমাং রাজা

১১. মাং রাজা

১২. তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন-অ-উপজাতীয় সদস্য।

এখানে উপজাতীয় মন্ত্রী এবং পর্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলায় পক্ষপাতিত্বের অবতারণা হয়েছে। এই পার্বত্য অঞ্চলের বাহিরে সমপরিমান উপজাতীয় লোক দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাদেরও অভাব অভিযোগ সমস্যা সংকট আর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা থাকা স্বাভাবিক। জনসংখ্যাগত ক্ষুদ্রতা ও আঞ্চলিক আধিপত্যের অভাবে তারা সর্বত্র কোণঠাসা। তাদের প্রতি রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য থাকার প্রয়োজন আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে উপজাতীয়দের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ, মানে তো কেবল পার্বত্য উপজাতীয় লোক নয়। এ হিসাবে মন্ত্রণালয়টির নাম ঃ পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় হওয়াটাও সংকীর্ণতা ও পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক। এই ক্ষেত্রে মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়, উপজাতীয় হওয়াটাই ছিলো সঙ্গত।

উপদেষ্টা কমিটির ক্ষেত্রেও পক্ষপাতিত্ব আর তেলে মাথায় তেল দানের ঘটনা ঘটেছে। মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয় উপজাতীয় হলে এই মন্ত্রণালয়ে সব উপজাতীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতো, এবং উপদেষ্টা কমিটিও হতো দেশ ভিত্তিক ব্যাপক। তাতে পার্বত্য উপজাতীয় বিষয়সহ দেশব্যাপ্ত উপজাতীয় বিষয়াদি ও বিবেচিত হতো। এটা হতো গোটা উপজাতীয় সমাজের জন্য সুবিচার ও সাত্বনার বিষয়। এই সাথে আদিবাসী শব্দটিও যোগ করা গেলে, আাদিবাসী দাবীদারদের স্বস্তির কারণ হতো। কিন্তু এখানে সংকীর্ণভবে কেবল পার্বত্য উপজাতীয়দের সন্তোষ ও স্বার্থ বিবেচিত হয়েছে। তাই বর্ণনায় না থাকা সত্ত্বেও একজন পার্বত্য উপজাতীয়কে করা হয়েছে মন্ত্রী, যিনি মন্ত্রণালয়ের দাবীদার, চুক্তিকারী পক্ষেরও কেউ নন। এই পক্ষপাতিত্বকে অনুসরণ করে উপদেষ্টা পরিষদের গঠন কাঠামোটিও গঠিত, যেখানে দেশভিত্তিক আদিবাসী উপজাতীয়দের কোন প্রতিনিধিত্ব নেই। সর্বোপরি এক তৃতীয়াংশ পার্বত্য বাঙ্গালী প্রতিনিধিত্বের তথাকথিত নীতিটিও এখানে লঙ্ঘিত হয়েছে।

ন্যায়তঃ মন্ত্রী পদ উপদেষ্টা পদ, চেয়ারম্যান পদ ও সদস্য পদে পার্বত্য বাঙালীদের সংখ্যানুপাতিক সমানাধিকার প্রাপ্য। বিভিন্ন পদে এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার মন্ত্রিত্বের ক্ষেত্রেও তারা স্থায়ীভাবে বঞ্চিত হতে পারে না। এটা বৈষম্যপূর্ণ অবিচার।

সংবিধানে অনুচ্ছেদ নং ২৯ বলে এটি সংবিধান বিরোধী।

গণতান্ত্রিক সমানাধিকারের সাংবিধানিক নীতিতে, বাঙ্গালী অবাঙ্গালী নির্বিশেষে সবাই জনপ্রতিনিধিত্বমূলক পদের জন্য উপযুক্ত। সরকারী নিয়োগ ও বাছাই ক্ষেত্রে চাকুরী ও প্রতিনিধিত্বমূলক পদে জনসংখ্যাগত অনুপাতকে অনুসরণ করে নিয়োগ ও মনোনয়ন দানই হলো সাধারণ নীতি। এই প্রতিষ্ঠিত নীতি আদর্শকে অমান্য করে কেবল পার্বত্য উপজাতীয় সন্তোষের লক্ষ্যে বর্ণিত ব্যবস্থাটি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই উপজাতীয় সন্তোষ লাভের আশাটিও নিশ্চিত নয়। এখানে নিষ্ফল একপক্ষীয় তোষামোদের নমুনা হলো ঃ

১. গোটা পার্বত্য অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত বলা।
২. প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সংখ্যানুপাত পরিত্যাগ এবং উপজাতিদের দুই-তৃতীয়াংশ ও তার অধিক সদস্য পদ দান।
৩. টাস্কর্ফোস আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ ও অগ্রাধিকার দান।
৪. চীফ বা রাজাদের পদাধিকার বলে বহু পদ ও ক্ষমতা দান
৫. বাঙ্গালীদের স্থায়ী বাসিন্দা সনদ দানের ক্ষমতা চীফ বা রাজাদের অধীনস্থ করা।
৬. নিয়োগ ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে উপজাতীয় অগ্রাধিকার মানে ১০০% সর্বাধিকার দান।

এই আধিপত্যের পরিণতি হবে আরো ক্ষমতা ও আধিপত্যের বিস্তৃতি, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য ও পরিনাম হবে বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন ও চূড়ান্তে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দাবী। উপজাতীয় সন্তোষের সেই শেষ সীমা কোথায় নিহিত তা কি বলা যায়?

৩৮

(তাং-রোববার ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭ বাংলা ২১ মে ২০০০ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)।

শেষ বিবরণ ঃ এই চুক্তি উপরোক্ত ভাবে বাংলা ভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রাহায়ন

১৪০৪ সাল মোতাবেক ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষেঃ

(স্বাক্ষর ঃ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ) (স্বাক্ষর ঃ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)

আহ্বায়ক ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি, সভাপতি ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

বাংলাদেশ সরকার।

চুক্তির কোথাও এই বিবরণ বা সুত্রের উল্লেখ নেই যে, সরকারের পক্ষে চুক্তি সম্পাদনের জন্য জনাব আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত। তিনি হলেন সংসদের চীফ হুইপ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি প্রধান (সরকার পক্ষে) এবং জাতীয় সংসদের একজন নির্বাচিত সদস্য মাত্র। তিনি কার্যতঃ সরকারী নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী কেউ নন। আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের পক্ষে চুক্তি সম্পাদনে দায়িত্ব লাভ ছাড়া কেবল এমপি, চীপ হুইপ ও পার্বত্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহ্বায়কের পদ বলে তিনি সরকারের পক্ষে চুক্তি সম্পাদনের অধিকার রাখেন না। তার এই ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক নয় বলেই সরকারের পক্ষে চুক্তি সম্পাদনে তার কোন অধিকার বর্তায় না। বস্তুতঃ প্রত্যেক চুক্তি ও দলিল পত্রে চুক্তিকারী ও দলিল দাতাদের ক্ষমতা ও অধিকারের সুত্র সম্বন্ধের উল্লেখ থাকে, ও তা জরুরী বলে মান্য হয়। কিন্তু এই আলোচ্য দলিলে উভয় পক্ষের যে ক্ষমতা পরিচয় ও অধিকারের উল্লেখ আছে, তাতে এ কথাটির উল্লেখ নেই যে, চুক্তিকারী প্রথম পক্ষ তজ্জন্য বৈধভাবে সরকার পক্ষ থেকে ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রাপ্ত। বিপরীতে একইভাবে চুক্তিকারী দ্বিতীয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের দ্বারা আনুষ্ঠনিকভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি না হওয়ায় জনসাধারণের পক্ষে চুক্তি সম্পাদনের কোন অধিকার তার উপর বর্তে না। সুতরাং এই চুক্তির দায়-দায়িত্ব কেবল আহ্বায়ক পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি, ও সভাপতি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উপরই বর্তে। এটি বস্তুতঃ এ দুজনের বেসরকারী চুক্তি। সরকার ও পার্বত্য অধিবাসীদের এ চুক্তি মানা না মানা ঐচ্ছিক। এর দায় দায়িত্ব পালন বাধ্যতামূলক নয়।

জনাব আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুফাতো বড় ভাই, এবং চুক্তি স্বাক্ষর ঐ সরকার প্রধানের মৌখিক পরামর্শ নির্দেশনা ও উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত। তজ্জন্য শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিকভাবে অভিনন্দিত আর পুরস্কৃত হয়েছেন, এটাও চুক্তিটি সরকারী হওয়ার পক্ষে কোন দলিল নয়। এখানে ত্রুটি হলো ঃ আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিসম্পাদনের ক্ষমতা না থাকার বা না পাওয়ার বিষয়। এখন আর এই ত্রুটি সংশোধনযোগ্য নয়।

প্রসঙ্গত ঃ এই প্রশ্ন ওঠা ও সম্ভব ঃ পাবর্ত চট্টগ্রাম কি কোন রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ইউনিট? চুক্তি সম্পাদনটি ও আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা সম্পন্ন নয়। এই ত্রুটি জানা সত্ত্বেও উভয়পক্ষ কি করে সরকারের পক্ষে ও পার্বত্য জনগণের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের নামে চুক্তি সম্পাদনের অবতারণা করে গেলেন, এবং তাও গোপনে ও দ্রুততার সাথে? বিরোধী দলীয় বাদ প্রতিবাদ হরতাল আর আন্দোলনেও তারা দমিত হোন নি, এটা এক আশ্চর্যজনক ঘটনা।
বলা যায় ঃ আওয়ামী সরকার পক্ষ যে কোন মূল্যে পার্বত্য জনসংহতি সমিতিকে চুক্তির প্রতি প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাদের কৌশল ছিলো ঃ দাবী দাওয়া সর্বাধিক পরিমানে মেনে নিয়ে দ্বিতীয় পক্ষের সামনে একটি ধাঁধার সৃষ্টি করা, এবং

এরই ফাঁকে এমন সব আইনী জটিলতার ফাঁক ফোকর রেখে দেয়া, যাতে ভবিষ্যতে চুক্তিটি আপনাতেই বাতিল বা অকেজো হয়ে যায়। সে পরিস্থিতিতে কেউ কাউকে দোষারোপ ও করতে পারবে না। এরই ফাঁকতালে অস্ত্রসহ বিদ্রোহীরা আত্মপর্ণন করবে। শরণার্থীরাও ভারত থেকে ফিরে আসবে। তাতে আওয়ামী সরকারের জয় জয়কর পড়ে যাবে। সন্দেহ ছিলো চুক্তিটি গোপনে না হলে, দেশে-বিদেশে আগেভাগেই হুলস্থুল পড়ে যাবে। বিদ্রোহীদের দাবী দাওয়ার অনুকূলে চুক্তি সম্পাদন জাতীয় অসন্তোষ সৃষ্টি করবে। বিরোধী দলগুলোর পক্ষে তা হবে সোনায় সোহাগা। তাড়াহুড়া ও গোপনে চুক্তিটি সই করা না হলে এর রহস্য ও দোষ ত্রুটি উন্মোচিত হয়ে যাওয়াও সম্ভব। তখন বিরোধী শক্তি জোর পাবে, আর বিদ্রোহী উপজাতীয় শক্তির বেঁকে বসাটাও অসম্ভব নয়। জনসংহতি সমিতির পক্ষে এ ধারণাও থাকতে পারে যে, যা পাওয়া যায়, তা-ই হাতিয়ে নেয়া উচিত। খুটিনাটিতে বাড়াবাড়ি করা সাফল্যের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। চুক্তি ত্রুটিপূর্ণ হলেও তা হবে অগ্রগতির ভিত্তি। পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন প্রশাসনিক অঞ্চল নয় এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বাংলাদেশের সংবিধান সম্মতও নয়। এ ধারণার ভিত্তিতে যদিও তাদের দাবী ছিলো ঃ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন ও আঞ্চলিক পরিষদ ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়ে নেয়া। তারা এ-ও জ্ঞাত ছিলো যে, সংবিধান সংশোধনে দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন, যা বর্তমান আওয়ামী সরকারের নেই। বিরোধী দল নয়, আওয়ামী সরকারই উপজাতীয় দাবী দাওয়ার প্রতি নমনীয়। সুতরাং ফাঁক ফোকরের খুটিনাটি বাদ রেখে যা পাওয়া যায়, তাতেই চুক্তি সই করা আবশ্যক। ত্রুটিগুলো হবে ভবিষ্যতে আন্দোলনের সুত্র। এই চুক্তি পরাজয় নয়, অগ্রগতি। পরিপূর্ণ অর্জন এক সাথে এখনই সম্ভব নয়। বিজয়ের শেষ সীমা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জন পর্যন্ত আন্দোলন প্রলম্বিত হবে। সে যাত্রাপথের এখনই শেষ নয়। এতদাঞ্চল ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্ম পরিণতির দিকে এগুচ্ছে, এবং সে এখনো সময় সাপেক্ষ।

সুতরাং শূণ্য অবস্থান, শূণ্য ক্ষমতায় চুক্তি হয়েছে, এ কথা অজানা বা গোপন কিছু নয়। এটা চূড়ান্ত অর্জন ও নয়, উভয়পক্ষের খানেক রাজনৈতিক সাফল্য।

এ জন্যই আওয়ামী সরকার দেশে বিদেশে, রাজনৈতিকভাবে উল্লসিত ও কৃতিত্বের দাবীদার। তাদের প্রদর্শনীয় সাফল্য হলো ঃ বিদ্রোহীরা অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছে। শরণার্থীরা ভারত থেকে ফিরৎ এসেছে। এখন সংগঠিত বিদ্রোহী আক্রমণে পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি সার্বিকভাবে বিঘ্নিত নয়। সর্বত্র বিদ্রোহী উপস্থিতির ভয় অপসারিত। সন্ত্রাস থাকলেও জনজীবন আগের মত স্তব্ধ হয়ে নেই। কাগজে-কলমে অনেক অঘটন ঘটার খবর থাকলেও, এখনো বিচ্ছিন্নতা উকি ঝুঁকির পর্যায়ে নিহিত। জাতীয় সার্বভৌম ক্ষমতার জোরে সব প্রতিকুলতাকে ঝেড়ে ফেলা সম্ভব।

জনসংহতি সমিতির সান্ত্বনার বিষয় হলো ঃ তারা দাবী দাওয়ার পক্ষে অনেক

আশাতীত অগ্রগতি সাধন করেছে।এ সবের পক্ষে টিকে থাকার নিশ্চয়তা না থাকলেও, মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন বোর্ড, টাস্কফোর্স, চার পরিষদ চেয়ারম্যান পদ ও মন্ত্রীপদ উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত নিয়োগ ইত্যাদি এবং বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রাধিকাকারের মঞ্জুরী তাদের আন্দোলনেরই ফসল বলা যায়। ভবিষ্যতে এই সাফল্যগুলোর কাটছাট অসম্ভব না হলেও, চুক্তিভুক্ত অনেক কিছুই টিকে থাকবে, এ নিশ্চয়তা অবশ্যই দেয়া যায়। এই সাফল্যের কিছুটা অবশ্যই কালজয়ী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এও সত্য যে এতদাঞ্চলে বাঙ্গালী আধিপত্যের গোড়া পত্তন হয়ে গেছে, এবং তাদের সাথে আপোষ করে উপজাতিদের সুখ খোঁজে নিতে হবে।

চুক্তি অনুসারেই পার্বত্য সমস্যার সমাধান সম্ভব

শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ দিনেও শান্তির দেখা নেই। সংশ্লিষ্ট দুইপক্ষ কেবল দোষারোপ ও বাগাড়ম্বর নিয়ে ব্যস্ত। মাঝখানে আমরা ভুক্তভোগীরা হতাশাগ্রস্ত। এমতাবস্থায় প্রশ্ন জাগেঃ চুক্তি কি ভুলের সমষ্টি, যা বাস্তবায়ন করা ক্ষতিকর বা অসুবিধাজনক, অথবা এটি একটি ফাঁকি, যা বিদ্রোহীদের গৃহবন্দি আর বিদ্রোহকে বানচাল করার এক রাজনৈতিক কুট কৌশল মাত্র? যা-ই হোক, তাতে ও তো স্বস্তি নেই।

বাস্তবতা হলো ঃ অশান্তি, উগ্রতা, হানাহানি, বিদ্বেষ ইত্যাদি অনাচার সমূহ অব্যাহত আছে। আগে যা পরিচালিত হতো সীমান্তের ওপার আর এপারের গোপন আস্তানাগুলো থেকে। এখন তা আস্তানা পেতেছে সংশ্লিষ্টদের গৃহকোণে। সন্ত্রাস আর বিদ্রোহকে গৃহকোণ থেকে ও নির্বাসিত করা না গেলে, শান্তি স্থাপিত হবেনা। তাই নতুন করে কৌশল নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে। পরকে প্রবঞ্চনা দান নিজেদের আত্মপ্রবঞ্চনায় পরিণত হয়েছে। এ পথ পরিত্যজ্য। পাবর্ত্য চুক্তি সত্যিকার শান্তিচুক্তিতে পরিণত হতে পারে, তার উপাদান তাতে আছে। সেই কাঙ্খিত উপাদান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কেবল নেতিবাচক চিন্তা, আর প্রতিপক্ষকে জব্দ করার কুট কৌশল অবলম্বনে দীর্ঘদিন কেটেছে। তবু সংশ্লিষ্ট পক্ষদের জন্য কিছু পরামর্শ রাখবো, যা চেয়ে অনেকেই আমাকে অনুরোধ করছেন। বয়সের কারণে শারীরিক অক্ষমতা আম্যকে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। তাই ইদানিং লেখালেখি কমিয়ে দিয়েছি। আর্থিক অভাব অনটনও আমাকে কাবু করে রেখেছে। জীবিকা নির্বাহ আর স্বাস্থ্য রক্ষা এখন আমার বড় দায়। তবু কম্বলকে ছাড়লেও ঐ কম্বল আমাকে ছাড়েনা। বিভিন্ন পক্ষ নাছোড় বান্দার মত পার্বত্য বিষয়ে আমার পরামর্শ ও তথ্য জানতে চান। তাতে নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চুপ থাকতে পারিনা। কিছুদিন ধরে কর্তৃপক্ষীয় মহল থেকে এ বলে আমাকে চাপ দেয়া হচ্ছেঃ পার্বত্য অঞ্চলে আদৌ কি শান্তি স্থাপন সম্ভব এবং তার সূত্র কি? এ ব্যাপারে আমার চিন্তা চেতনা যেন সুসমন্বিত ও বিষদ আকারে প্রকাশ করি। সরকারী নীতি নির্ধারণে এ আলোচনাটি প্রয়োজনীয়। এ চাপ দানের সূত্র আমারই এই মন্তব্য যে, চুক্তি অনুসারেই পাবর্ত্য সমস্যার সমাধান সম্ভব, এবং তজ্জন্য দরকার আরেকটি উভয় পাক্ষিক বৈঠক, যেখানে অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে চুড়ান্ত সমঝোতায় পৌছার চেষ্টা করা যাবে।

বৈঠকের আগে অমীমাংসিত সমস্যাবলী ও তার সমাধানের ব্যাপারে উভয়পাক্ষিক সদস্যদের স্বচছ ধারণা থাকা জরুরী হবে। নতুবা তাদের দ্বারা নতুন করে ভুল সিদ্ধান্ত

গৃহীত হতে পারে, যা বাঞ্ছিত নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে খুঁজে দেখা দরকার অমীমাংসিত সমস্যাবলী ও সে সমূহের মীমাংসার রূপরেখা কী? এখানে চুক্তি বহির্ভূত বিষয়াবলী টানার প্রয়োজন নেই। চুক্তি অনুযায়ী সে সব পরিত্যজ্য।

আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ্য হলো চুক্তির মূলনীতি ঃ বাংলাদেশ সংবিধান অনুকরণ। সংবিধান লঙ্ঘনের কোন প্রশ্নই ওঠেনা। দেশ ও জাতি বিভাজ্য নয়। এ প্রশ্নটি মীমাংসিত। বাঙ্গালী-জুম্মজাতি বিভক্তি এবং ভেদাভেদ বিবেচনাযোগ্য নয়। সংবিধানই একজাতি এক দেশ এবং সমানাধিকারের মীমাংসা করে দিয়েছে। এখন বঞ্চনা, ভেদাভেদ অবিচার ও বৈষম্যের কোন আইনী অবকাশ নেই। এই নীতি আদর্শ সবার জন্য ন্যায় বিচার, সমানাধিকার, উন্নয়ন ও অগ্রগতির গ্যারান্টি। পৃথক আইন, অগ্রাধিকার ও কোটা ব্যবস্থা, সংবিধানিক গ্যারান্টির সমকক্ষ নয়। সংবিধান অলঙ্ঘনীয়, বিপরীতে অন্য সব আইন ও অধিকার ভঙ্গুর। সুতরাং এ ধারণা যথার্থ নয় যে, পৃথক আইন ও অধিকার সব পাওয়ার সূত্র। চুক্তিভূক্ত মুখবন্ধটি সঠিকভাবেই রচিত এবং তা উভয় পক্ষ কর্তৃক সঠিকভাবেই অনুমোদিত হয়েছে। চুক্তির এ মূলনীতি সংবিধান সম্মত এবং অবশ্যই অনুকরণীয়। এ বক্তব্যের ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। চুক্তিভুক্ত যে কিছু ইতিবাচক বক্তব্য আছে, আলোচ্য মুখ বন্ধটি তার অন্যতম যথা ঃ

"বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার আধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারিখন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন"।

এই চুক্তির সুবিধাভোগী লোকজন হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল নাগরিকসহ বাংলাদেশের সকল মানুষ, কেবল পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় লোকেরা নয়। এই মূলনীতি অনুযায়ী সংবিধান সার্বভৌমত্ব আর অখন্ডতার আওতায় চুক্তিভূক্ত পরবর্তী সিদ্ধান্ত সমূহ বিচার্য্য। এই মূলনীতির ব্যাপারে ঐকমত্য আছে। এই ঐকমত্যের ভিত্তিতে চুক্তিভূক্ত খন্ডগুলোতে কোনরূপ ভিন্নতা থাকতে পারে না। তবে বাস্তবতা হলো, চুক্তিভুক্ত প্রতিটি খন্ডেই সংবিধান সার্বভৌমত্ব সার্বজনীনতা আর অখন্ডতা বিরোধী কিছু কিছু সিদ্ধান্ত অন্ত র্ভুক্ত হয়েছে, যা মূলনীতি ও ঐকমত্যের পক্ষে নেতিবাচক। এগুলো সংশোধন বা বাতিলযোগ্য। এই নেতিবাচক সিদ্ধান্ত আর তার পক্ষে রচিত আইন সমূহ কার্যকর করার প্রশ্নই ওঠেনা। সংবিধান খোদ ঘোষণা করেছেঃ সংবিধান বিরোধী কোন আইন রচিত হলে, তার যতটুকু সংবিধানের সাথে অসমঞ্জস, ততখানি বাতিল হবে, (সূত্রঃ অনুচ্ছেদ নং- ৭ (২) ও ২৬ (১) এবং অনুরূপ সংবিধান বিরোধী আইন রচনাকে ও নিষেধ করা হয়েছে,

যথা অনুচ্ছেদ নং- ২৬ (২)।

এই পর্যায়ে চুক্তিভূক্ত খন্ড সমুহে কোন কোন ধারা উপধারা, সংবিধান, সার্বভৌমত্ব অখন্ডতা ও সার্বজনীনতা বিরোধী তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। এই আপত্তিজনক চুক্তিধারা এবং তার পক্ষে রচিত আইন সমূহ অবশ্যই বাতিল হবে। তার পক্ষে চুক্তি মুখবন্ধই উভয়পাক্ষিক ঐকমত্য।

দ্বিতীয় ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হলো চুক্তিভুক্ত খন্ড খ/২৬ নং দফা এবং তার পক্ষে রচিত পাবর্ত্য জেলা পরিষদ আইন নং- ৬৪ যথা ঃ "ক) আপাততঃ বলবত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুকনা কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্ত যোগ্য খাস জমিসহ কোন জায়গা জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত ক্রয় বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত বনাঞ্চল (Reserved) কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।"

বর্ণিত চুক্তি ধারা ও আইনের দ্বিতীয় প্যারার এই ছাড় অনুসারে পার্বত্য অঞ্চলের ৪৭৫২.৯৬ বর্গমাইল এলাকাই ভূক্তির বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত। জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের তাতে কোন অধিকার নেই, যথা ঃ

১। রক্ষিত বন বা Reserved Forest :

ক) উত্তর বন বিভাগ-	৬১৭ বর্গমাইল
খ) দক্ষিণ বন বিভাগ-	৩১৫ "
গ) শঙ্খ বন-	১২৮.২৫ "
ঘ) মাতামুহুরী বন-	১৬০.৭১ "
২। ক) কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা +	
খ) বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা +	
গ) রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা = (আনুমানিক)	১০ "
৩। সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমি ঃ	
ক) ইউ এস এফ বা অশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বন	= ৩১৬৬.৪০ বর্গমাইল।
খ) অধিগ্রহণকৃত কর্ণফুলী হ্রদ	= ২৫৬.০০ "
গ) প্রশাসনিক দপ্তর ও স্থাপনা সমূহ (আনুমানিক)	= ১০০.০০ "
সর্বমোট ঃ-	**৪৭৫২.৯৬ বর্গমাইল।**

এই হিসাবে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন জেলা পরিষদ মিলে মোট নিয়ন্ত্রনযোগ্য ভূমি হলো (৫০৯৩ - ৪৭৫২.৯৬) = ৩৪০.০৪ বর্গমাইল মাত্র। এটা হলো চুক্তির এখতিয়ারভূক্ত ভূমি পরিধি। এর বাহিরে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কোন এখতিয়ার নেই। অথচ তারা বর্তমানে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫০৯৩ বর্গমাইল ব্যাপ্ত এখতিয়ার

ভোগ করছেন, যা চুক্তি বিরোধী এবং আইন বিরোধী ও বটে। এই চুক্তি বিরোধীতা ও বেআইনী ক্ষমতা ভোগকে জায়েজ করার কোন উপায় নেই। সরকার ও জনসংহতি সমিতি উভয়ই এই সীমা লঙ্ঘনের জন্য সমান দোষে দোষী। জাতির কাছে এ জন্য তাদের জবাব দেহী করতে হবে।

জনসংহতি সমিতির দ্বারা উত্থাপিত পাঁচ দফা দাবীতে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিরোধীয় অঞ্চল রূপে চিহ্নিত নয়। দাবী নামার ২/৫ (ক) ও ২/৫ (খ)ই তার প্রমাণ। সরকারকে জন সংহতি সমিতি পাঁচ দফা দাবী নামার যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তাতেও তারা সরকারকে অভিযুক্ত করে ৪৪৬ বর্গমাইল এলাকাই মাত্র পরিষদভুক্ত আছে বলে স্বপক্ষে একটি হিসাবও দিয়েছে। সরকার ও জনসংহতি সমিতি ঐ হিসাব মেনে নিয়েই চুক্তি সম্পাদন করেছেন। এখন আর তা থেকে পিছাবার কোন পথ নেই। চুক্তি মানতে হলে জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ কে ৪৪৬ বা ৩৪০.০৪ বর্গমাইলে সঙ্কুচিত হয়ে যেতে হবে। তাদের সাম্রাজ্যের পরিধি এটাই।

যতই হাক ডাক দেয়া হোক বাস্তবে চুক্তি ও আইন অনুসারে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ৪৭৫২.৯৬ বর্গমাইল অঞ্চল পরিষদ সমুহের এখতিয়ারাধীন নেই। এই মোট অঞ্চলের এখতিয়ার জেলা প্রশাসকদের হাতে ন্যস্ত। এই সব অঞ্চলের সম্পদ সম্পত্তি বাঙ্গালী অবস্থান এবং সেনা ক্যাম্প পরিষদীয় এখতিয়ার থেকে মুক্ত।

চুক্তিভূক্ত এই হিসাবের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম একক ও সামগ্রিকভাবে উপজাতীয় বা উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। বাস্তবে বাঙ্গালীরা স্বদেশ ভূমির এই অঞ্চলে বহিরাগত বা অস্থায়ী অস্থানীয় নয়। তারা স্থানীয় অবাঙ্গালীদের সমান অধিকার ভোগের অধিকারী। সংবিধানের ১৯, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৬ ও ৪২ ধারাই হলো তাদের মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের রক্ষা কবচ। এর ব্যতিক্রম আইনতঃ মান্য নয়। সাথে সাথে উপজাতীয়রাও সমান অধিকার ভোগী নাগরিক রূপে মান্য। তাদের প্রতি বৈষম্য আরোপ অন্যায়। তাদেরকে সমান অধিকার ভোগের গ্যারান্টি দেয়া জরুরী। উভয় পাক্ষিক সার্বজনীনতা লঙ্ঘন যোগ্য নয়। পার্বত্য চুক্তিতেও এই নীতি সমর্থিত। উভয় পাক্ষিক বৈঠকের লক্ষ্য হওয়া চাই এই সংক্রান্ত ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটান, এবং চুক্তির মূল স্পিরিটের প্রতি গুরুত্ব দান। তা হলেই আপোষের ভিত্তিতে সব সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। নির্বাচন, স্থানীয় শাসন, শিক্ষা, দারিদ্র মোচন ও উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড সমঝোতার ভিত্তিতে অনায়াসেই পরিচালিত হতে পারে। সাম্প্রদায়িকতা আইন সঙ্গত হতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতা অবশ্যই নিয়ন্ত্রনযোগ্য।

পার্বত্য চুক্তির অন্যতম রচয়িতা ও স্বাক্ষর দাতাপক্ষ জনসংহতি সমিতি জেনে শুনেই এটি সম্পাদন করেছে। এটিতে ভুল হলে তারা তার সংশোধনে বাধ্য। কিন্তু এ পর্যন্ত চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়িত হচ্ছেনা, এই অভিযোগ উত্থাপন ছাড়া কোন গঠনমূলক প্রস্তাবই তাদের কাছ থেকে আসছে না। তারা এ কথা বুঝতে নারাজ যে, সংবিধান বিরোধীতা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি চুক্তির দায়িত্ব এড়াতেও সরকার অক্ষম। মধ্যপন্থা হলো এ ব্যাপারগুলোতে নিষ্ক্রিয়

ও নীরব থাকা। সরকার তা-ই করছেন। সরকার ও জাতিকে পার্বত্য ব্যাপারগুলোতে সক্রিয় করার দায়িত্ব হলো মূলতঃ উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের। তাদেরকে বিদ্বেষহীন অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ রচনারও দায়িত্ব নিতে হবে। জাতীয় সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি রচনাই জাতি ও দেশের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের উপায়। তারা কি একথা ভেবে দেখেছেনঃ উপজাতীয় পাড়া পরিবেশ বাঙ্গালীদের পক্ষে নিরাপদ নয়। এর বিপরীতে বাঙ্গালী এলাকাগুলো উপজাতীয়দের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। নিরাপত্তার অভাব বোধ থেকেই আমিসহ অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক প্রতিবেশী উপজাতীয় বন্ধুদের খোঁজে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। বন্ধু চারু বিকাশ চাকমাকে দেখতে গিয়ে সেদিন নজরে পড়লো, এক বাঙ্গালী ছেলেকে উপজাতীয় ছেলেরা পিটাচ্ছে। দোষ ত্রুটির কথা জানিনা। তবে আমি আর এগুতে পারলাম না। এটি শান্তির সহায়ক পরিবেশ নয়।

এই সাথে বিবেচ্য অনুকূল সাংবিধানিক আইন ঃ

অনুচ্ছেদ নং- ৭। (২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয় তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপুর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।

১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৬। (১) এই (মৌলিক অধিকার) ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(৩) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে

কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

২৯। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

৩১। আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

৩৬। জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃ প্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

৪২। (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় বা প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে, তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৩) ১৯৭৭ সালের ফরমানসমূহ (১৯৭৭ সালের ১নং ফরমানসমূহ) প্রবর্তনের পূর্বে প্রণীত কোন আইনের প্রয়োগকে, যতদূর তাহা ক্ষতিপূরণ ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের সহিত সম্পর্কিত, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

ঘ বিরোধ মীমাংসায় উপজাতীয়দের সাথে আরেকটি সংলাপ প্রয়োজন

পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে উপজাতীয়দের দাবী দাওয়া অনেকটাই সংকুচিত হয়ে এসেছে। এখন তা আগের মত বিশাল ও কঠিন নেই। অবশিষ্ট দাবী দাওয়া নিয়ে এখন যে আন্দোলন চলছে তা অযৌক্তিক ও একগুয়ে নয়। এ গুলোর ভিত্তি পার্বত্য চুক্তি।

অনেক আন্দোলন, সংগ্রাম, ত্যাগ ও ক্ষয় ক্ষতির ফসল পার্বত্য চুক্তি। এর ভিতর কিছু দোষ ত্রুটি থাকা সম্ভব। এই স্বল্প দোষ ত্রুটির জন্য এটি প্রত্যাখ্যাত বা বাতিল হওয়ার যোগ্য নয়। দোষ ত্রুটি উদ্ঘাটিত হলে, তা যৌক্তিক ভাবেই সংশোধিত হতে পারে, সে পথ বন্ধ ভাবা যায় না। চুক্তিকারী পক্ষদ্বয় এরূপ একগুয়ে কঠোর ও কঠিন বলে ভাবার কোন অবকাশ নেই। ভাবা যায় ঃ সরকার পক্ষেরই অযোগ্যতা, অজ্ঞতা ও অদুরদর্শীতার ফল সমালোচিত দোষ ত্রুটি। কারণ উপজাতীয় পক্ষ এই ক্ষেত্রে দাতা নয়, গ্রহীতা। তাদের দাবী দাওয়া থেকে সরকার যা মঞ্জুর করেছেন, তাই তাদের প্রাপ্য হয়েছে, এবং এটারই অপ্রাপ্ত অংশের এখন তারা দাবীদার, তার বেশী নয়।

চুক্তি পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের দ্বারা দোষ ত্রুটি উদ্ঘাটিত হলে, তার সংশোধন অসম্ভব নয়, চুক্তিতেই সে মুল নীতি নিহিত আছে। মুল সমঝোতা মূলক বক্তব্যের সমষ্টি হলো চুক্তি মুখবন্ধ। এটাকে উভয় পাক্ষিক অঙ্গীকারও বলা যায়। এটাই চুক্তির দোষ ত্রুটি উদ্ঘাটন ও শুদ্ধ অশুদ্ধ হওয়ার মাপকাঠি। সরকার কোন দোষ ত্রুটির ভিত্তিতে, বা জাতীয় ক্ষোভ অসন্তোষ ফুঁসে ওঠার ভয়ে, চুক্তিভূক্ত কিছু বিষয়ের বাস্তবায়ন স্থগিত করে থাকলে, সে বিষয়ে নিশ্চুপ না থেকে, তা প্রতিপক্ষ জন সংহতি সমিতিকে অবহিত করে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রসর হতে পারতেন। এটা উভয় পাক্ষিক দায়িত্ব হলেও, জন সংহতি সমিতিকে তজ্জন্য অবহিত ও সক্রিয় করা হয়নি। এটা সরকারী ভুল, জন সংহতি সমিতির নয়। নিজের দোষকে চেপে রেখে এটা বলা সঠিক নয় যে, জন সংহতি সমিতি বাড়াবাড়ি করছে। জন সংহতি সমিতি যা করছে, তা তাদের সাংগঠনিক রাজনীতি। এটা দোষনীয় নয়। তাদের দোষনীয় বিষয় হলো পুনরায় সন্ত্রাসকে সক্রিয় ও সংগঠিত করা, যার ভিত্তিঃ চুক্তি পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন না করা জাত হতাশা। এজন্য দায়ী সরকারের অকৌশলী কার্য্যক্রম।

বিরোধীয় বিষয় সমুহের ব্যাপারে আগে পরে কোন সরকারই জন সংহতি সমিতিকে অবহিত করেনি। তারা স্বাভাবিক ভাবেই সরকারী আচরণে সন্দিহান ও হতাশ। এই হতাশা ও সন্দেহেরই ভিত্তিতে তাদের বর্তমান চার দফা দাবী উত্থিত, যথাঃ

১. চুক্তিভুক্ত বিষয়াবলীর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন।
২. সেনা ও অন্যান্য বাহিনী স্থাপিত অস্থায়ী ক্যাম্প সমুহ প্রত্যাহার।
৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে একজন উপজাতীয় পুর্নমন্ত্রী নিয়োগ।
৪. ওয়াদুদ ভূঁইয়া এম পি'র পরিবর্তে একজন উপজাতীয়কে পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দান।

এই দাবীগুলো অযৌক্তিক বা বাড়াবাড়ি কিছু নয়। পূর্ববর্তী তিন সরকারই বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতা করেছেন, যা পাবর্ত্য চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে আাছে। এগুলোর বাস্ত বায়নের দাবীতে আন্দোলন হলে, তা দোষনীয় হতে পারে না। দোষ হলো সরকার পক্ষীয়দের যারা উপজাতীয়দের কাছে শঠতার দোষে অভিযুক্ত।

"ভাবিতে উচিত ছিলো প্রতিজ্ঞা যখন"- এই আপ্তবাক্যটি সরকার পক্ষীয়দের উপর প্রযোজ্য। চুক্তিকালে তাদের হুশ ছিলোনা। এখন বাস্তবায়নকালে চুক্তির দোষ ক্রটি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এবং তারই ভিত্তিতে কোন কোন বিষয়ের বাস্তবায়ন স্থগিত রেখেছেন। উদ্ঘাটিত দোষ ক্রটি গুলো প্রতিপক্ষ জন সংহতি সমিতিকে অবহিত করাও হচ্ছে না। সংশোধনীরও কোন প্রস্তাব নেই। কিসের ভিত্তিতে জন সংহতি সমিতি নিশ্চুপ থাকবে বা সরকারের সাথে সহযোগিতা করবে? কেবল অন্ধ ভাবে যত দোষ নন্দ ঘোষ পার্বত্য জন সংহতি সমিতির। এ দোষারোপ ভূল। জন সংহতি সমিতি প্রায় প্রতিটি যুক্তিযুক্ত আপত্তিরই ইতিবাচক সমাধান দিয়েছে। তাদের প্রথম দাবী ছিলো প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন। এরশাদ আমলে সংলাপের শুরুতে যখন তাদের বলা হলোঃ সাংবিধানিক ভাবে দেশ এককেন্দ্রিক, ফেডারেল নয়। এই ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন ছাড়া ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয়। সংবিধান সংশোধন কাজটিও অত্যন্ত জটিল। সংশোধনী প্রস্তাবটি আগে জাতীয় পরিষদে দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতায় মঞ্জুর হতে হবে। তৎপর জাতীয় গণভোটে তা গৃহীত হতে হবে। বিদ্রোহের কারণে জাতি পার্বত্য উপজাতীয়দের আনুগত্যের ব্যাপারে সন্দিহান। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে, আঞ্চলিক রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে, তখন দেশের অখন্ডতা রক্ষা করা হবে কঠিন। এই যৌক্তিক আলোচনার ভিত্তিতে জন সংহতি সমিতি নিজ দাবীনামার প্রস্তাব নং- ১ সংশোধনে রাজি হয়, এবং পরবর্তীতে তদস্থলে সংবিধান সংশোধন ও আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী প্রতিস্থাপিত হয়। দেশের অখন্ডতার পক্ষে অসুবিধাজনক ভেবে চুক্তি সম্পাদন কালেও জনসংহতি সমিতি আরো নমনীয় হয়, এবং দাবী নং- ১ থেকে সংবিধান সংশোধন ও স্বায়ত্ত শাসন অংশটিও নীরবে পরিত্যাগ করে। এই নমনীয়তার ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে, জন সংহতি সমিতির বাংলাদেশের অখন্ডতা স্বীকার মূলক ঘোষণা। সুতরাং এটা ভাবা অনুচিত যে, জনসংহতি সমিতি প্রকাশ্য বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন, এবং তার চরিত্র অনড় আর একগুয়ে। যুক্তিকে সে কখনো প্রত্যাখ্যান করেনি। নতুবা চুক্তি সম্পাদিতই হতোনা। তাই জনসংহতি সমিতির প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষন করা সঠিক নয়। তার প্রতি আপোষহীনতার দোষারোপ সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

এখন অবশিষ্ট দাবী দাওয়ার ব্যাপারটির সুরাহা করাই সমস্যা। যদি সরকারের ধারণা

হয়ে থাকে, এ গুলোর বাস্তবায়নের দ্বারা সংবিধান লঙ্ঘিত হবে, অথবা এগুলো জাতীয় স্বার্থ বিরোধী, যদ্বারা জাতীয় ক্ষোভ অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা সম্ভব। এরূপ যে কোন পরিস্থিতির ব্যাপারে উচিত জন সংহতি সমিতির সাথে সরকারের বুঝাপড়ায় বসা। সংবিধান ও জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে চুক্তি মুখবন্ধে শক্তিশালী নীতি নির্ধারনী বক্তব্য আছে। তাই হতে পারে সংকট উত্তরনের চাবিকাঠি। এই মূলনীতি মূলক সমঝোতাও জনসংহতি সমিতি থেকে পিছ পা হলে, গোটা চুক্তিটাই বানচাল হয়ে যেতে পারে, এমনটি হতে জনসংহতি সমিতি দিবে না। তাদের কোন বক্তব্যে এমন কোন মনোভাব কখনো ব্যক্ত হয়নি। এ থেকে বুঝা যায়, সাংবিধানিক ও জাতীয় স্বার্থ ভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতি, তাদের সায় আছে। তাতে চুক্তির আভ্যন্তরিন কোন দফা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তা তারা মেনে নিবে। এই ঐকমত্যই চুক্তিতে বিধৃত। চুক্তির সুবিধা জনক অংশ মানবে, আর অসুবিধাজনক অংশ প্রত্যাখ্যান করবে, এমন ঔদ্ধত্য জন সংহতি সমিতি কখনো প্রদর্শন করেনি। বাংলাদেশ সংবিধানর আওতায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ও বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষন ও উন্নয়নই পার্বত্য চুক্তির লক্ষ্য। এটা একটি উদার ও বিজ্ঞ ঐক্যমত। জন সংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ সহ এর অন্যান্য রচয়িতারা তজ্জন্য উচ্ছসিত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। এই সমঝোতা ও ঐকমত্যই চুক্তির মূল কথা। এর অনুসরণে সাংবিধানিক ও জাতীয় স্বার্থ ভিত্তিক ব্যবস্থা গৃহিত হতে কোন বাধা নেই। চুক্তি অনুযায়ী জন সংহতি সমিতি তাই চায়। সরকার বরং এর বিরূপ চিন্তায় আক্রান্ত। খামোখা জন সংহতি সমিতিকে বৈরী ভাবা হচ্ছে। আরেকটি মীমাংসা বৈঠকে, উভয় পক্ষ সংলাপে বসলে, দেখা যাবে, জন সংহতি সমিতি কোন কিছুর জন্যই দায়ী নয়, সব দোষ সরকারের। অনুমান ভিত্তিক এই দোষারোপ করা ঠিক নয় যে, জন সংহতি সমিতির লক্ষ্য কেবল উপজাতীয় কল্যাণ। এজন্যই মন্ত্রীপদ, চেয়ারম্যান পদ, দুই তৃতীয়াংশ সদস্য পদ, উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত। উচ্চ শিক্ষা, কর্ম সংস্থান ও ভূমি সংস্থানে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার প্রাপ্য। বাঙ্গালীদের প্রাপ্য কেবল উচ্ছিষ্ট। আসলে এই পদ সংরক্ষণ ও অগ্রাধিককার ব্যবস্থা, সরকারের পক্ষ থেকে, উপজাতীয়দের জন্য সন্তুষ্টি বিধান মূলক উৎকোচ বা উপহার। উপজাতীয় পাঁচ দফা দাবী নামায় এ সবের কিছুই অন্তর্ভূক্ত নেই। সরকার স্বেচ্ছায় এসব দিয়েছেন। মুখবন্ধের সমঝোতা অনুযায়ী এসব কিছুই প্রাপ্য হয়না। প্রত্যাখ্যান করারও প্রশ্ন উঠে না। এখন মুল সমঝোতা পর্যালোচিত হলে, জন সংহতি সমিতি এই দোষারোপকে প্রত্যাখ্যান করবে, এমনটি ভাবা যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এখন দরকার সরকার ও জন সংহতি সমিতির আরেকটি সংলাপ বৈঠকে বসা। এই লক্ষ্যে সন্তু বাবু মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়ে একাধিক বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। মনে হয় সরকার পক্ষ অপ্রস্তুত। পার্বত্য সংকট বিষয়ে সমাধান মুলক কোন ধারণা তাদের নেই। এজন্যই পশ্চাদ ধাবন।

সরকার ও প্রশাসন আদালত নয়। চুক্তি ও আইনগত প্রশ্নে ভিন্নতা করার এখতিয়ার তাদের নেই। তাদের দায়িত্ব হলো তা পালন করা। চুক্তি ও আইন সংশোধন করার ক্ষেত্র

উভয় পক্ষ ও জাতীয় সংসদ। কোন অপ্রিয় দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকতে হলেও, সুপ্রীম কোর্ট থেকে তার অনুমতি লাভ আবশ্যক। সরকার প্রতিপক্ষের সম্মতি গ্রহণ ছাড়াই, পার্বত্য চুক্তির প্রশ্নে এক তরফা আচরণ করছেন। জানতে ও চাচ্ছেন না, সাংবিধানিক ও জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে তাদের পরামর্শ কী। এটাও জন সংহতি সমিতির কাছে জিজ্ঞাস্য যে, চুক্তি মুখবন্ধ ও তার আভ্যন্তরিন ভিন্নতার মাঝে সামঞ্জস্য সাধন কি করে সম্ভব?

সরকার পার্বত্য বিরোধ প্রশ্নে ধামাচাপা দান, ও সময় ক্ষেপণে ব্যস্ত। এটা সঠিক কর্তব্য পালন নয়। তারা এটা বুঝতে অপারগ যে, বিষয়টি এখন মীমাংসার দ্বার প্রান্তে উপনীত। চুক্তি থেকে পিছানো নয়, মূলতঃ এর দ্বারাই সাফল্য অর্জন সম্ভব। চুক্তির দ্বারা জনসংহতি সমিতির হাত পা বাঁধা। সে ভিন্ন কিছু করতে নীতিগত অক্ষম। এখন তার দ্বারা অনুষ্ঠিত সন্ত্রাস হলো, চুক্তি বাস্তবায়ন না করার হতাশা জাত উপদ্রব। তাদের সন্দেহ: চুক্তি আদৌ টিকে থাকে কিনা। হয়তো আবার তাদের সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার প্রয়োজন হতে পারে। তাই তাদের সাংগঠনিক প্রস্তুতি।

সরকার তাদের আশ্বস্ত করছেন না। চুক্তির দোহাই দিয়ে তাদের এ কথা বুঝান সম্ভব যে, কতিপয় চুক্তি দফার দ্বারা সংবিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে, যা চুক্তিতেই নিষিদ্ধ। আপত্তি ভূক্ত এই চুক্তি দফা সমূহ বাস্তবায়ন না করা চুক্তি লঙ্ঘন নয়। জন সংহতি সমিতি, চুক্তির এই দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন। যুক্তির প্রতি তারা অনুগত। আলোচনা ছাড়া তারা স্বতোস্ফূর্ত ভাবে বলতে পারে না যে, সরকারের এই স্থগিত করণ সিদ্ধান্ত যথার্থ।

উভয় পাক্ষিক কোন বৈঠকে, এখনো পার্বত্য চুক্তির দোষ ত্রুটি উদ্ঘাটন, ও তা নিরসন নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। এমনটি হলে, জন সংহতি সমিতির এ সংক্রান্ত মুল্যায়ন কি তা জানা যেতো। এবং তারই ভিত্তিতে সংকট উত্তরনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হতো। বুদ্ধি বৃত্তিক পর্যায়ে পার্বত্য চুক্তির পক্ষে বিপক্ষে এ যাবৎ অনেক আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। জন সংহতি সমিতি সে সম্বন্ধে অবশ্যই ওয়াকিবহাল। কিন্তু এ যাবৎ এই সংগঠনটি চুক্তির দোষ ত্রুটির প্রশ্নে কখনো মুখ খুলেনি। চুক্তি তাদের এক বিরাট রাজনৈতিক অর্জন। এটিকে ঘায়েল করা তাদের লক্ষ্য হতে পারে না। তাই তারা এ ব্যাপারে নীরব। কিন্তু সরকারের দায়িত্ব হলো দোষ ত্রুটি উদ্ঘাটন ও তা নিরসনের ব্যবস্থা করা। সে দায়িত্ব পালিত হচ্ছে না। বিপরীতে জন সংহতি সমিতি, নিজেদের অর্জনকে কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করতে আন্দোলনে নেমেছে। এটা করা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এটা তাদের পরিস্থিতি উত্তপ্ত করা নয়, দৈনন্দিন রাজনীতির অংশ মাত্র। এই প্রেক্ষাপটে সরকার দোষী সেজে চুপ মেরে না থেকে, চুক্তির দোষ ত্রুটি প্রশ্নে সোচ্চার হতে পারেন। তাতে জন সংহতি সমিতি হয় নমনীয় হবে, নয়তো উত্তপ্ত মনোভাব ব্যক্ত করবে। শেষ পর্যন্ত তাতে যুক্তিরই জয় হবে, এবং জন সংহতি সমিতি চুক্তি সংশোধনে রাজি না হয়ে পারবে না। এ ছাড়া তারা দোষ ত্রুটি স্বীকার ও চুক্তি সংশোধনীতে সম্মত হতে পারে না।

বাংলাদেশ সংবিধানকে পার্বত্য চুক্তিতে সর্বোচ্চ মান্যের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তাতে

নীতিগত ভাবে চুক্তির সংবিধান বিরোধী দফা গুলো অকার্যকরই বলা যায় । এই অকার্যকরতা সমাধানের মালিক সম্মিলিত ভাবে চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়, অথবা সুপ্রীম কোর্ট । চুক্তি দফা বাস্তবায়ন অথবা স্থগিত করণে চুক্তিকারী পক্ষদ্বয় ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতাবান । এই ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে, ঐক্যমত সৃষ্টির প্রয়োজনে, উভয় পাক্ষিক সংলাপ আবশ্যক । জন সংহতি সমিতি অনুরূপ সংলাপে উদগ্রীব বলে বিরোধ মীমাংসায় তার আন্তরিকতার প্রমাণ দিয়েছে । অথচ সরকার এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়, যা দুঃখ জনক । সংলাপ অনুষ্ঠিত হলে জন সংহতি সমিতি চুক্তির ব্যাপারে আরো ছাড় দিতে ও নমনীয় হতে সুযোগ পেতো, যা না হওয়া দুর্ভাগ্যজনক ।

চুক্তির দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে উভয় পাক্ষিক সমঝোতা হয়েই আছে । নতুন করে উত্থিত চার বিরোধীর ব্যাপার অমীমাংসিত কিছু নয় । এই প্রশ্নে উভয় পাক্ষিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হলে, অবশ্যই সুরাহা পাওয়া যাবে । জন সংহতি সমিতি কৃত সমঝোতার ভিন্নতা করবে, তা ভাবা অমুলক । বদ্ধ মুল ধারণা আর সন্দেহই সরকারকে চিন্তায় ফেলে রেখেছে । সমিতি ও তজ্জন্য সরকারের উপর আস্থা রাখতে পারছে না । নিয়মিত বৈঠক হলে, ভুল বোঝাবুঝি আর সন্দেহ তো দুর হতোই, যুক্তি মান্যতা ও তাতে বাড়তো । বিরোধ মীমাংসায় ও তা হতো সহায়ক । সংযোগ না রেখে, দুরে বসে থেকে, সন্তু লারমা ও উপজাতীয়দের সন্দেহ করা সরকার সহ অনেকের মাঝেই ক্রিয়াশীল ।

এটা স্বাভাবিক যে, স্বজাতীয় কল্যাণ ও নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি সন্তু বাবুরা অগ্রাধিকার সহকারে ভাববেন । বিপরীতে দেশ ও জাতির পক্ষে সরকারকেও সোচ্চার হতে হবে । নতুবা গোল হবে এক তরফা । এটাই হয়েছে চুক্তি কালে ও পরে । সরকার পক্ষের লক্ষ্য ছিলো উপজাতীয় পক্ষের সন্তুষ্টি বিধান এবং চুক্তি সম্পাদন । তাদের ভয় ছিলো সংলাপের ব্যর্থতায় যদি স্বাধীনতা ঘোষিত হয়ে যায়, তখন উপজাতীয়দের বাগে আনা হবে আরো কঠিন । যদিও এই ধারণা ছিলো অমুলক । ভারত সহ বিশ্ব পরিস্থিতি ছিলো জন সংহতি সমিতির প্রতিকূলে । সমঝোতায় দেরী হলে, ভারত নিজেই তাদের ঠেলে দিতো সীমান্তের এ পারে । এই বিরূপ চাপের মুখেও সন্তু বাবু জন সংহতি সমিতিকে চমৎকার নেতৃত্ব দিয়েছেন, বাংলাদেশ সরকারকেও প্রচন্ড চাপের মুখে রেখেছেন । ফলে চুক্তিটি তারই চিন্তা চেতনার অনুকূলে সম্পাদিত হয়েছে । তদ্বারা প্রমাণিত, তিনি একজন পরিপক্ষ রাজনীতিবিদ । তিনি পার্বত্য উপজাতীয় সমাজে এক অপ্রতিদ্বন্ধী নেতা ।

আসলে সন্তু লারমা লেখা পড়ায় তো বটেই, রাজনীতিতেও নেতৃত্ব সুলভ দক্ষতায় একজন উঁচু মাপের নেতা । তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন উপজাতীয় নেতা নেই । মুলতঃ একজন স্কুল শিক্ষকের পুত্র নিজেও পেশায় প্রথমে স্কুল শিক্ষক, তৎপর পার্বত্য উপজাতীয় সমাজে রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ার সুবাদে গুরু রাজনীতিকে পরিণত । স্থানীয় উদীয়মান রাজনীতিকদের প্রায় সবাই তাঁর ও প্রয়াত বড় ভাই মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার শিষ্য । উচ্ছাভিলাষী শিষ্যদের কেউ কেউ এখন তাকে ডিঙ্গাবার চেষ্টা করছেন, যেমন ইউ, পি, ডি, এফ নেতা প্রসিত খীসা, এবং মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার চ্যালেঞ্জকারী, ত্রিপুরায় অবস্থানরত

প্রিতি কুমার চাক্মা। কিন্তু লারমা ভ্রাতৃদ্বয়ের রাজনৈতিক গুরুর আসন টলানো তাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রয়াত মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ছিলেন একজন রাজনৈতিক জিনিয়াস। ছোট ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমারও তিনি গুরু। এখন সে প্রধান গুরুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ছোট ভাই সন্তু লারমা। তিনিও আরেক জিনিয়াস। উপজাতীয়দের উপর তার রাজনৈতিক প্রভাব অপরিসীম। বিরল রাজনৈতিক প্রতিভাই তাকে নেতৃত্বের শীর্ষ স্থানে উন্নীত করেছে। তার প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের কাছে উপজাতীয়দের প্রায় সবাই শ্রদ্ধাবনত। আকাশচুম্বী ইমেজের বলে মনে হয়, তিনি উপজাতীয় রাজাদের ও রাজা। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর এক প্রান্তিক নেতা হলেও, প্রতিভায় তিনি অন্যতম বাংলাদেশী জাতীয় নেতা হওয়ার যোগ্য। নেতৃত্বের বিরল প্রতিভায় তিনি অনেক জাতীয় নেতাকেও টেক্কা দিতে সক্ষম। তাকে ক্ষুদ্র পরিসরে, বিদ্রোহী উপজাতীয় নেতা রূপে ঠেসে রাখা অনুচিত। একমাত্র ব্যক্তি তিনি, যার দ্বারা সম্ভব, পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মাঝে সম্প্রীতির সেতু বন্ধন রচনা করা এবং পার্বত্য অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাকে উপড়ে ফেলা।

আতিকুর রহমান

প্রকাশিত বই :

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম (গবেষণা কর্ম)

২. প্রেক্ষিত পার্বত্য সংকট

৩. শান্তি সম্ভব

৪. প্রতিবেদন গুচ্ছ

৫. পার্বত্য তথ্য কোষ ১০ খণ্ড

৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও রাজনীতি

যোগাযোগ : ৪৮ সাধার পাড়া উপশহর সিলেট। মোবাইল : ০১১৯৬১২৭২৪৮